আশ্রমকথা

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনাপর্ব

আশ্রমকথা

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনাপর্ব

আশ্রমকথা

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনাপর্ব

গৌতম ভট্টাচার্য
সংকলিত
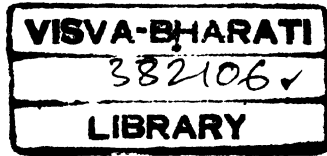
রবীন্দ্রভবন। বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন ৭৩১ ২৩৫

১৮১০ শক-এর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বৈশাখ সংখ্যায় "শান্তিনিকেতন" শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদে স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে, ঈশ্বরভক্তজনেরা যেমন তীর্থে আশ্রয় গ্রহণ করেন তেমনি মহর্ষি ব্রাহ্মসাধারণের জন্য একটি তীর্থস্থান নির্দিষ্ট করেছেন। সে-জায়গাটি বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুরের শান্তিনিকেতন। মহর্ষি "ব্রাহ্মদিগের উপকারার্থ ঐ স্থান উৎসর্গ করিলেন, ব্রহ্মসন্তান সকল ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ ঐ স্থানে যাইবেন। উহা ব্রহ্মচিৎ সাধুলোকের আশ্রয়ভূমি হইয়া রহিল।" এই সাধারণের উদ্দেশে উৎসর্গ করার উপলক্ষে মহর্ষি একটি 'ট্রাষ্টডীড' নথিভুক্ত বিধিবদ্ধ করেন। সেখানে বলা হল : এই ট্রাষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির জন্য ট্রাষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রমধর্ম্মের উন্নতির বিধায়ক সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

মহর্ষির ইচ্ছানুসারে বলেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণও তাঁরই পরিকল্পনায় আরম্ভ হয়, কিন্তু ৩ ভাদ্র প্রয়াণ ঘটে বলেন্দ্রনাথের। শান্তিনিকেতনে 'নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবের' দিন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের গৃহ প্রতিষ্ঠা হল। প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন :

প্রভাতে ঈশ্বরোপাসনা সমাপন করিয়া এক্ষণে আমরা এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি। এদেশে ব্যায়াম শিক্ষার স্থান আছে, জ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়াদি আছে, কিন্তু যেখানে অধ্যাত্মবিদ্যা অধীত হইতে পারে, এরূপ কোন স্থান নাই। ...সেই জন্যই এই অনুকূল স্থানে এই ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, এবং যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদত্ত হয়, তজ্জন্য সুনিয়ম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইতেছে। (শক ১৮২১ মাঘ, পৃ. ১৫৯-৬০)

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের জন্য বলেন্দ্রনাথ একটি নিয়মাবলীর খসড়া আগেই প্রস্তুত করেছিলেন। বিদ্যালয় বিষয়ে বলেন্দ্রনাথের নিয়মাবলী শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন :

১. শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করিয়া অধ্যাপন করা হইবে।
২. বিদ্যালয় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইবে।
৩. আপাততঃ দশজন ছাত্র বিনা ব্যয়ে বিদ্যালয়ে থাকিয়া আহার ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।
৪. আহার্যের ব্যয় স্বরূপ মাসিক ১০্ দিলে আরও ২০ জন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে লওয়া যাইতে পারিবে।

৫. শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাষ্টীগণ ব্যতীত আরও চারজন সভ্যকে লইয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমিতি গঠিত হইবে। প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচনে আশ্রমের ট্রাষ্টীগণের কর্তৃত্ব থাকিবে। তৎপরে কোনো অধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট অধ্যক্ষরা মিলিয়া অধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া লইবেন।

৬. অধ্যক্ষ-সমিতি ব্রহ্মধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিবেন।

৭. শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাষ্টীগণের মধ্যে একজন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইবেন। সম্পাদক অধ্যক্ষ সভার অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিদর্শন হিসাবপরীক্ষা শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ ও পরিবর্তন ছাত্র-নির্বাচন পুস্তক শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

৮. বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থের সঙ্গে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম এবং চতুর্থ বার্ষিক হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্যাখ্যার অধ্যাপন হইবে।

৯. ৩য় বার্ষিক শ্রেণী হইতে এন্ট্রান্স পর্যন্ত সমুদয় ছাত্র অধ্যাপকগণ আশ্রমের প্রতি সায়ং উপাসনায় যোগ দিবে। এবং নিম্নশ্রেণীর বালকগণকে লইয়া অধ্যাপকগণ স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট উপাসনা করিবেন।

(১০ ও ১১ অবান্তর জ্ঞানে প্রতি করি নাই। কী ছিল তাহা জানিবার উপায় আর নাই)

১২. সকল ছাত্রকেই বিদ্যালয়-ভবনে বাস করিতে হইবে। এবং শিক্ষকগণ তাহাদিগকে লইয়া নিরূপিত সময়ে একত্র আহারাদি করিবেন। এবং যথাসম্ভব ছাত্রগণের সহিত ক্রীড়া-কৌতুকেও যোগ দিবেন।

১৩. ছুটির সময় ব্যতীত মাসে ৩ দিন অভিভাবকের সম্মতি থাকিলে অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া বাটী যাইতে পারিবে।

১৪. অভিভাবকগণ প্রতি রবিবারে গিয়া বালকদিগকে দেখিয়া আসিতে পারিবেন।

('রবীন্দ্রজীবনী', খণ্ড ২, পৃ. ৩৭-৩৮)

বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে ১৩০৮ শ্রাবণ-এ এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : "একটা নির্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি। দুই-এক জন ত্যাগ স্বীকারী অধ্যাপকের সন্ধানে ফিরিতেছি' ('চিঠিপত্র' ৬/৯ শ্রাবণ ১৩০৮)। সে-বছরই অগাস্ট মাসে এক চিঠিতে বন্ধুকে জানালেন, "শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহবাসের মতো সমস্ত নিয়ম, বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না ধনী দরিদ্র সকলেই কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হইতে হইবে।" সেবার সেপ্টেম্বরে কবি সপরিবার এলেন শান্তিনিকেতনে। অনুভব করলেন : "এখানে নিভৃতে, নির্জনে ধ্যান ও প্রেমে নিজের জীবনকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে।"

কলকাতার ১৮ বেথুন রো-য় কার্তিকচন্দ্র নানের বাড়িতে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন রেবাচাঁদ। 'নৈবেদ্য'র কবিতা পড়ে ব্রহ্মবান্ধব The Twenteeth Century পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের

উদার প্রশংসা করেছিলেন। এই আলোচনা-সূত্রেই কবির সঙ্গে পরিচয় ব্রহ্মবান্ধবের। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হল ব্রহ্মবান্ধবের বিদ্যালয়। তিনি তাঁদের বিদ্যায়তনের ছাত্রদের নিয়ে এলেন শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে।

১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসবের উপাসনার পর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্বোধন হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৮২৩ শকের সংখ্যায় "শান্তিনিকেতনে একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব" শিরোনামে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে :

> পরে আমরা মেলা দেখিবার জন্য বহির্গত হইলাম। খুব জনতা।...আমরা এই জনতা ভেদ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম। তথায় অতি অপূর্ব দৃশ্য। কতকগুলি বালক ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া বিনীতভাবে উপবিষ্ট হইয়াছে। দেখিলাম সর্বপ্রথমে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্তবাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবকদিগকে নিম্নোক্ত প্রকারের ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিলেন।
>
> ওঁ নমো ব্রহ্মণে। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতুমাম্।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের উপদেশ দিলেন :

> হে সৌম্য মানবকগণ—অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ এই ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল—তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন। তারাই আমাদের পূর্বপুরুষ।...যথার্থ বড়ো কাহাকে বলে? আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী হলে আপনাদের বড়ো মনে করতেন? আজকাল আমাদের মনে তাঁদের সেই বড়ো ভাবটি নেই বলে ধনীকেই আমরা বলি বড়ো মানুষ। তারা তা বলতেন না। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা বড়ো ছিলেন সেই ব্রাহ্মণরা ধনকে তুচ্ছ করতেন। তাঁদের বেশভূষা বিলাসিতা কিছুই ছিল না। অথচ বড়ো বড়ো রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।...তাঁরা বড়ো হয়েছিলেন কী গুণে? তাঁরা সত্যকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে মানতেন—মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নীচু করেন নি। (১৮২৩ শক, মাঘ, পৃ. ১৪৭)

দীক্ষা নিলেন পাঁচজন ছাত্র : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, প্রেমকুমার গুপ্ত, অশোককুমার গুপ্ত ও সুধীরচন্দ্র নান। শিক্ষকরা ছিলেন : রেবাচাঁদ, জগদানন্দ রায়, শিবধন বিদ্যার্ণব। কিছুদিনের মধ্যে ছাত্র হিসেবে যোগ দিলেন : রাজেন্দ্রনাথ দে, যোগানন্দ মিত্র, গিরীন্দ্র ভট্টাচার্য, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম 'নববর্ষ' উৎসবে বিভিন্ন অতিথিরা যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতচন্দ্র সেন প্রমুখ। আশ্রমের ছাত্রদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতা "নববর্ষের চিন্তা" 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮২৪ আষাঢ়-ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ছাত্রদের তিনি প্রাঞ্জল ক'রে এ কথাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের প্রকৃত আদর্শ কী। কী তার অধ্যাত্মিক স্বরূপ। বললেন :

আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন,

আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন, এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও দীর্ঘকালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্য্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্মের বাসনা, জনসংঘের সংঘাত জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে, ভয়হীন শোকহীন মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে।" (১৮২৪ শক, ভাদ্র, পৃ. ৭০-৭১)

বস্তুত বিদ্যালয়ের প্রথম পর্বের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের এই শাশ্বত সাধনার স্বরূপকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। ছাত্রদের তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, ভারতবর্ষের একাকী কাজ করবার ব্রতকে গ্রহণ ক'রে এই নববর্ষকে 'আশিস্ বর্ষণেও কল্যাণ শস্যে' পরিপূর্ণ করতে হবে। দল বেঁধে টাকা জোগাড়ের সংকল্পকে স্ফীত করবার জন্য অপেক্ষা না করে আপনার গ্রামে, প্রান্তরে, পল্লীতে, গৃহে, স্থিরশান্তচিত্তে ধর্মের সঙ্গে, সন্তোষের সঙ্গে পুণ্যকর্ম মঙ্গল কর্ম সাধন করতে হবে। আড়ম্বরের অভাবে ক্ষুব্ধ না হয়ে, দরিদ্র আয়োজনে কুণ্ঠিত না-হয়ে, দেশীয়ভাবে লজ্জিত না-হয়ে, কুটিরে থেকে মাটিতে বসে, উত্তরীয় পরে সহজভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। আমরা যেন 'চাতকপক্ষীর ন্যায় বিদেশীর করতালিবর্ষণের দিকে ঊর্ধ্বমুখে তাকাইয়া না থাকি ; তবে ভারতবর্ষের ভিতরকার যথার্থ বলে আমরা বলী হইব।'

দুই

১৯০২ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিলেন না। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালয়-প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এই সময় থেকে ছাত্রদের বেতন গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিদ্যালয়ের আর্থিক সংকটে কবি-পত্নীর অলংকার পর্যন্ত বিক্রীত হয়। সমসময়ে আশ্রমে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

সূচনাতেই আঘাত এল। ১৩০৯ সালে ৭ অগ্রহায়ণ প্রয়াণ ঘটল মৃণালিনী দেবীর। ব্রাহ্মসমাজের কুঞ্জলাল ঘোষকে আশ্রমের কাজে নিযুক্ত করলেন কবি। তাঁকে লেখা দীর্ঘ চিঠিতে আশ্রমের অনুপুঙ্খ কৃত্যসূচীর বর্ণনা দিয়ে কবি নিজের উদ্‌বেগের কথা জানালেন। ১৯০৩ সালের পূজাবকাশের পূর্বে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। কবি আশ্রমের কাজে একজন তরুণ আদর্শবান যুবককে পেলেন, তিনি সতীশচন্দ্র রায়। মাত্র এক বৎসরকাল তিনি বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আত্মভোলা, সাধক, আদর্শব্রতী এই শিক্ষকের কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার স্মরণ করেছেন। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ সতীশচন্দ্রের আকস্মিক প্রয়াণ ঘটে। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল কালান্তক গুটি বসন্ত রোগে। এরপর বিদ্যালয় চার মাসের জন্য শিলাইদহে স্থানান্তরিত হয়। আশ্রমের কাজে তখন যোগ দেন মোহিতচন্দ্র সেন। এছাড়া এরমধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ

সান্যাল, নগেন্দ্রনাথ আইচও অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছেন। কিছুকাল পরে মোহিতচন্দ্রও স্বাস্থ্যের কারণে বিদায় নিলেন। সতীশচন্দ্রের বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী যোগ দিলেন বিদ্যালয়ের কাজে। বিদ্যালয়ের কর্মভার অর্পিত হল ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের ওপর।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আশ্রমের ছাত্রদের তিনি গ্রামের কাজে উৎসাহিত করলেন, আত্মশাসনের দীক্ষা দিলেন। ছাত্রশাসনের দায়িত্বও ক্রমান্বয়ে ছাত্রদের ওপর অর্পিত হল। এইভাবে ধীরে-ধীরে ছাত্রসভার জন্ম হল। আশ্রম-পরিচালনার কাজেও যুক্ত হল ছাত্ররা।

জাপান থেকে এসেছেন সূত্রধর কুসুমোতো সান্, তিনি বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছেন। সানো সান্ নামে আরো একজন নিপ্পন দেশীয় জুজুৎসু শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছেন। আশ্রমে ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন শিক্ষক হয়ে এসেছেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার বসু। এইসময় সন্ধ্যাবেলায় বিনোদনপর্বে নানাবিষয়ে আলোচনা হয়। কবি আশ্রমে উপস্থিত থাকলে তিনিও সে-আলোচনায় যোগ দেন। কবিপুত্র শমীন্দ্রনাথ ১৩১৩ সালের শ্রীপঞ্চমীর দিন ঋতু-উৎসবের আয়োজন করেন। উৎসবটি অনুষ্ঠিত হল 'আদি-কুটিরে'। ছাত্ররা সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলাকাব্য থেকে ঋতুস্তব আবৃত্তি করল। শমীন্দ্রনাথ গাইলেন 'একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে'। আশ্রমে সূচনা হল ঋতু উৎসবের।

ছাত্ররা নিজেদের লেখা পত্রিকা প্রকাশ করল 'শান্তি' (মাঘ ১৩১৪)। এই পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে তাদের উৎসাহের প্রকাশ ঘটল। কেউ লিখল "বর্ষায় উৎসব", কেউ লিখল, "তারাদের কথা"। এ-কাজে বিশেষ উৎসাহ নিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী।

১৯০৮ সালে আশ্রমের কাজে যোগ দিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। সে-বছরই আসেন কালীমোহন ঘোষ, নেপালচন্দ্র রায়। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার ১৯০৯ সালের পূজাবকাশের পর শান্তিনিকেতনে এলেন। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার আমেরিকা থেকে গো-পালনবিদ্যা এবং কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করে ফিরে এসে আশ্রমের কাজে যোগ দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্মদিন পালিত হয় আশ্রমের আম্রকুঞ্জে। রাত্রে অভিনীত হয় 'বিনিপয়সার ভোজ'।

বিদ্যালয়ের কলেবর বৃদ্ধি হচ্ছে। নতুন গৃহ নির্মিত হয়েছে 'বীথিকা' ও 'বাগান-বাড়ি'। ছাত্রাবাসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে। তাঁর সম্পাদনায় 'বীথিকা' পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে। 'শারদোৎসব' অভিনীত হয় বিদ্যালয়ে শারদাবকাশের আগে। সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরদাদা —অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। লক্ষেশ্বর তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। এবারই অভিনয়ের পর ছাত্ররা 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গান গেয়ে অভিনয় সাঙ্গ করে। অভিনয়ের পরে আশ্রমের পথে-পথে ছাত্ররা এই গানটি গেয়ে পরিক্রমা করেছিল।

১৯১১-১২ সালের মধ্যে 'সতীশকুটির', 'মোহিতকুটির' ও 'সত্যকুটির' নির্মিত

হয়। তিনজন পরলোকগত শিক্ষকের নামে নামকরণ হয় এই আবাসগুলির। তাঁদের নাম : সতীশচন্দ্র রায়, মোহিতচন্দ্র সেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

১৯১২ সালের ২৪ মে রবীন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রা করেন। দীর্ঘ ষোলো মাস তিনি ছিলেন বিদেশে। এ-সময় বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন জগদানন্দ রায়। আদর্শ গুরুগৃহ স্থাপনের জন্য মালদহে ফিরে যান বিধুশেখর শাস্ত্রী। অনেক নূতন শিক্ষক এ-সময় বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়, কিশোরীমোহন জোয়ার্দার, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও রমনীকান্ত রায় এঁদের মধ্যে উল্লেখনীয়।

তিন

এই আশ্রমের আরম্ভকাল থেকে চেষ্টা করা হয়েছে, এখানে অধ্যাপক এবং ছাত্ররা যেন অন্য প্রতিষ্ঠানের মতো বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান না করেন। তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে থেকে সকল কাজেই যোগ রাখবেন। এবং যে-সাধনা সমস্ত আশ্রমের অবলম্বনীয় তা কেবল ছাত্রদের কাছে দাবি করবেন না, আগে নিজেরা তা গ্রহণ করবেন এবং ছাত্ররা পরে তা অনুসরণ করবে। যে-অভ্যাসগুলি ছাত্রদের মধ্যে প্রবল হওয়া দরকার, শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে তার কোনো শৈথিল্য ঘটতে দেবেন না। এই বিদ্যালয় বিষয়ে তাই উল্লেখ করা হয়েছিল যে শিশুরা যেমন মায়ের মুখ থেকে ভাষা শিক্ষা করে, ছাত্ররা তেমনি শিক্ষকের জীবন থেকে জীবন লাভ করে। এই বিদ্যায়তনের চেষ্টা যে, প্রবর্তিত নিয়মশাসন ছাত্ররা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে আর তখনই এখানকার আদর্শ ক্রমান্বয়ে মূর্তি পরিগ্রহ করবে।

ধীরে-ধীরে এই বিদ্যালয় নিজস্ব চরিত্রের স্বাতন্ত্র অর্জন করেছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার থেকে রূপগত এবং আদর্শগত দিক থেকে সে আলাদা হয়েছে। শিক্ষার প্রক্রিয়া ছাত্ররা শুধু গ্রহণ করবে না, তারা একটা জীবনপ্রক্রিয়াকে গড়ে তুলবে। রচনা করবে এক সৃষ্টিশীল পরিবেশ যেখানে ছাত্র-শিক্ষকের দায়িত্ব সম-যোগের মাত্রা পাবে।

১৮৩৩ শকের চৈত্র সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাই লেখা হয়, "ব্রহ্মবিদ্যালয়" নিবন্ধে : "তিনি যাইবার পূর্বে দু-একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। যেমন একটি ছাত্র-অধ্যাপক সম্মিলনী। ছাত্রদের কাজে কর্মে, দিনরাত্রি চালনাটাই যেন বড় হইয়া না উঠে, সাধনাটাই বড় হয়, এইজন্য যথাসম্ভব সকল বিষয়ে তাহাদিগকে অধ্যাপকগণের সহযোগী সহধর্মী করিবার নিমিত্ত তিনি একটি সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছেন।"

এর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের সকল শক্তি ও চেতনার পূর্ণ বিকাশ। শুধু অভ্যাস নয়, কী করলে আশ্রমের সঙ্গে তাদের সকল সম্বন্ধ ভিতরকার সত্য সম্বন্ধ হয়ে ওঠে, এ-চেষ্টা তারই প্রতিফলন। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ছিল :

> আমি মানুষের শক্তির উপরেই সমস্ত শ্রদ্ধা রাখি—আমি জানি একবার মানুষের ঠিক মর্মস্থানটি স্পর্শ করতে পারলেই অসাধ্য সাধন করা যায়। সেইখানেই সোনার কাঠি

ছোঁয়াতে হবে, সেইখানকার ঘুম ভাঙাতে হবে, বিশ্বের সঙ্গে সেই জায়গাকার যোগের পথটাকে কেবলি প্রশস্ত করে তুলতে হবে।

তাঁর মতে ডেমোক্রাসি আমাদের কাছে পৌত্তলিকতায় দাঁড়িয়েছে। শীতকাল থেকে প্রকৃতি এবং মানুষের সঙ্গে আমাদের সংশ্রব ঘনিষ্ঠভাবে সত্য হয়নি বলে আমরা অন্য দেশের ভাবের জিনিষগুলো নিজের জীবনের সঙ্গে সত্যভাবে যুক্ত করে নিতে পারি নি।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় কোথায় স্বতন্ত্র সে-বিষয়ে স্পষ্ট করে বলা আছে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৮৩৪ শকের বৈশাখ সংখ্যায় (এপ্রিল-মে ১৯১২)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে-সকল বিষয়ে 'ম্যাট্রিকুলেশন' পরীক্ষার জন্য শিক্ষা দেয়—আশ্রম বিদ্যালয়েও সে-সব বিষয় পড়ানো হয় ; কিন্তু শিক্ষার সময়, শিক্ষার প্রণালী পদ্ধতি সবই ভিন্নতর। এখানে দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত ইস্কুল ঘরের মধ্যে ত্রিশ বা চল্লিশটি ছাত্রকে এক শ্রেণীতে আবদ্ধ ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয় না। প্রত্যেক অধ্যাপক ছাত্রদের বিশেষ ক'রে জানবেন। তার মানসপ্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করা তার নৈতিক কর্তব্য। এছাড়া মুক্ত আকাশ, আলো-বাতাস শরীর-স্বাস্থ্য ছাত্রদের মনের বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয়। সারা দিন ছাত্রছাত্রীরা পঠন-পাঠনের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করলে পড়াটা তার প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে মিলে যেতে পারে।

এই বিদ্যায়তনে বাংলাভাষা চর্চার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। নিজের ভাষার ভিতর দিয়েই ছাত্রদের বোধশক্তি, প্রকাশক্ষমতা যথাযথ উদ্বোধিত হতে পারে। যন্ত্রের শিক্ষার সুবিধা হল সেখানে সকল মানুষই এক ছাঁদে গড়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের চিত্তশক্তিকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করলে যান্ত্রিক প্রণালীর ওপর ষোল আনা আস্থা রাখা চলে না। এখানে বাংলাভাষায় ছাত্ররা সর্বদা বলতে, লিখতে এবং ভাবতে অভ্যস্ত বলে, বাংলাভাষায় অধিকাংশ বিষয় তাদের শিক্ষা দেওয়া এবং উচ্চ সাহিত্যের সঙ্গে তাদের বিশেষ পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া হয় ব'লে ছাত্রদের 'মানস-উদ্বোধন' ঘটে।

একদা ইংলণ্ডে 'পাবলিক স্কুলে' পরিদর্শনার্থে শিক্ষা কমিশন বসেছিল। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে পাঠের প্রতি স্বাভাবিক আন্তরিক অনুরাগ বা পঠন ব্যাপারে উৎসাহ প্রায়ই ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায়নি তার কারণ : "They learned to distinguish nouns from verbs, how to parse etc. but could not understand the good of it, and had no interest in it." কিন্তু একজন ফরাসী বালকের ক্ষেত্রে এমন ঘটে না। তারা কর্ণেই, রাসিন, মোলিয়ের, উগো, ফেনেলঁ প্রভৃতি দিকপাল সাহিত্যিকদের নাটক কাব্য গদ্যপ্রবন্ধ পড়ে তার রস গ্রহণ করে। "When a French boy leaves school, his mind is stored with the gems of his literature, and the critical spirit of his nation thoroughly imbued."

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যেমন মাতৃভাষার শিক্ষা আবশ্যিক তেমনি ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্বও যথেষ্ট। এখানে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার জন্য 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা' 'ইংরেজি সোপান' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রণয়ন করেছিলেন।

এ-বিদ্যালয়ের আরেকটি বিশেষত্ব 'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ'। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় আশ্রমের ছাত্ররা কীটপতঙ্গ গাছপালা প্রভৃতি বিষয়ে যে পর্যবেক্ষণ করত তার প্রতিবেদন প্রকাশ করত। এর পিছনে প্রেরণা ছিল ইংলণ্ডীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার। কারণ সেখানে 'প্রকৃতি পাঠ' (Nature Study) ছিল বিদ্যালয়-শিক্ষার একটি প্রধান বিষয়। 'কিন্তু এ-দেশে বিষয়টি পাঠ্যক্রমের পরিধিভুক্ত নয়।'

১৩৩৪ শক বৈশাখ সংখ্যায় 'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। ১. গুটি পোকা ও প্রজাপতি : ডিম ও সংস্থান, গুটি বাঁধিবার পূর্বে পোকার আকৃতি ও জীবন, গুটি বাঁধার ব্যাপার, গুটির অভ্যন্তরে পোকার অবস্থা এবং প্রজাপতি। এছাড়াও আছে : অন্য একশ্রেণীর প্রজাপতির জন্ম ইতিহাস। বোলতার জীবনবৃত্তান্ত। এগুলি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন লিখেছে বিদ্যালয় ছাত্ররা। যথাক্রমে—বংশু, সুধাকান্ত ও প্রদ্যোত। অন্য সংখ্যায় আছে মাকড়সা, কাঠ্‌ঠোক্‌রা, আকন্দগাছে গুটি পোকা ও প্রজাপতি, মধুমালতীর প্রজাপতি, তসরের গুটিপোকার প্রজাপতি ইত্যাদি।

আশ্রমের শিক্ষাধারা ব্যাখ্যা করার জন্য যেসব তথ্য ও অনুসন্ধানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এ-পত্রিকার মাধ্যমে ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে যে দেশবিদেশের শিক্ষা-পদ্ধতির যে রূপান্তর ঘটছে আশ্রমের শিক্ষাব্যবস্থা তারই সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। যেমন ইতিহাস শিক্ষার প্রণালী নিয়ে আলোচনা সূত্রে জানানো হয়েছে যে কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, ইটন, হ্যারো থেকে বিভিন্ন শিক্ষকগণ একত্র হয়ে ইতিহাস-শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা ও পরীক্ষা করে পাঠ্যসূচী তৈরী করেছে। এরই পরিণতিস্বরূপ তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ক্লাসে ইতিহাস মুখে মুখে গল্প করে বলা, ছবি মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। ঐতিহাসিক স্থানে বালক-বালিকাদের ভ্রমণেরও উপযোগিতা আছে। তাতে ইতিহাস সজীব হয়ে উঠবে। বিদেশে নিচের শ্রেণীতে যে প্রথা এখন প্রচলিত তা কেন্দ্রমুখিন (concentric method) প্রণালী। নিচের শ্রেণীতে ইতিহাস শিক্ষায় আধুনিক এই প্রণালীর সঙ্গে যথাসাধ্য যোগ রেখে চলেছে ব্রহ্মবিদ্যালয়। এরই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, 'The historical teacher needs literary culture and some power of narrative and description. অর্থাৎ ইতিহাস-শিক্ষকের সাহিত্যজ্ঞান এবং বর্ণনার ক্ষমতা দুইই থাকা চাই—যে সকল শিক্ষকের তা আছে তাঁরাই এ-প্রণালীতে সার্থক হন।

যদিও আশ্রমের সূচনাপর্ব, তবু 'আশ্রম-কথা'য় এর বিবর্তনের ইতিহাসও ধরা আছে। প্রায় প্রথম এক দশকের মধ্যেই এখানকার ছাত্ররা দেশ-বিদেশে গিয়েছে শিক্ষার সন্ধানে। ১৮৩৪ শক শ্রাবণ সংখ্যায় পড়ি, 'শ্রীমান নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, শ্রীমান সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, শ্রীমান চণ্ডীচরণ সিংহ আশ্রমের এই তিনজন ছাত্র শিক্ষার্থী

হয়ে আমেরিকায় যাচ্ছেন। শ্রীমান নারায়ণ কাশীনাথ দেবল বিশেষভাবে শিক্ষা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে ভবিষ্যতে আশ্রমের কাজে যোগ দিয়ে আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালী প্রয়োগ করবেন।' বিদেশ যাত্রা সে-বিষয়েও স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে, "আশ্রমকথা" প্রতিবেদনে। এই ছাত্ররা বিদেশ থেকে যা সংগ্রহ করে আনবেন তার দ্বারা আশ্রমেরই ভাবের প্রসার হবে, কর্মে নতুন প্রেরণা ও শক্তি জাগবে এবং আশ্রমের প্রাণশক্তি এঁদের প্রাণের দ্বারা বেগবান হয়ে উঠবে। এখানে যে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে তা কেমন করে সার্থক হয়ে উঠবে যদি নানা দেশ থেকে নব নব অর্ঘ্য বহন করে ব্রহ্মচারিরা এখানে সমাগত না-হন? আশ্রমকে কোনো সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতায় বদ্ধ করে রাখা হবে না, "সেই জন্যই কোনো আশঙ্কা নাই যে বিদেশের শিক্ষা এবং সাধনা যথার্থ আশ্রমভাবের এবং আশ্রম আদর্শের বিরোধী হইবে।" (১৮৩৪ শ্রাবণ, পৃ. ১০১)

চার

আশ্রমবাসী অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়ে 'আশ্রম-সম্মিলনী' গঠিত হল। আশ্রম সংক্রান্ত সকল বিষয় যাতে অধ্যাপক ও ছাত্ররা মিলিতভাবে আলোচনা করেন এবং যা করণীয় তা স্থির করেন—এই সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য তাই। রবীন্দ্রনাথ এই সভার বিষয়ে বলেছেন, 'আশ্রমের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আহার-বিহার, শ্রীসৌন্দর্য, আচার-ব্যবহার ও চরিত্র নীতি সম্বন্ধে উন্নতি বিধানের জন্য ছাত্রগণ দ্বারা যাহা সম্ভব তাহাই নিজেদের চেষ্টায় সাধন করিবার উদ্দেশে এই 'ছাত্রসভা' স্থাপিত হইল। কেবলমাত্র ছাত্রগণ এই সভার সভ্য'। 'ছাত্রসভা' থেকে একটি প্রতিনিধিসভা গঠিত হয়েছে। তার সভ্য সংখ্যা পনের জন। তার মধ্যে একজন পুরনো ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি শ্রী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। এছাড়া আছে একজন সম্পাদক, দুইজন সহকারী সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ।

প্রাথমিকভাবে আশ্রমসম্মিলনীর বিভাগগুলি ছিল :

১. গ্রাম্য বিদ্যালয় : আশ্রমের নিকটবর্তী যে সকল সাঁওতাল পল্লি আছে সেখানে কয়েকজন আশ্রমবালক রোজ বিকালে গিয়ে সাঁওতাল বালকদের শিক্ষা দেবে।

২. সেবা-ভাণ্ডার : আশ্রমে একটি সেবা-ভাণ্ডার থাকবে। ছাত্র ও অধ্যাপকগণ ঐ-ভাণ্ডারে অর্থসাহায্য করবেন। আশ্রমে কোনো দরিদ্র অতিথি এলে এবং আশ্রমের নিকটবর্তী স্থানসমূহে দরিদ্রদের সাহায্য করার প্রয়োজন হলে ঐ ভাণ্ডারের অর্থ ব্যয়িত হবে।

৩. ক্রীড়া-বিভাগ : আশ্রমের ছাত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে সময়োপযোগী খেলায় অংশ নেবেন।

৪. সাহিত্য সভা : আশ্রমের ছাত্রগণ সাহিত্যসভার জন্য মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে সাহিত্যসভার অধিবেশন করবেন। একটি সভা শিশুদের জন্য এবং অপরটি বালকদিগের জন্য। এই সাহিত্যসভায় সংকলন, মৌলিক প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, অনুবাদ

প্রভৃতি বিবিধ ছাত্রের রচনা পঠিত হবে। এছাড়া গান ও আলোচনাও হবে। 'তর্কযুদ্ধ'ও এ-সভার বিশেষ অঙ্গ। মাঝে মাঝে ছাত্ররা ইংরেজি সাহিত্যসভার আয়োজনও করবে।

৫. পত্রিকা : এখানকার ছাত্ররা মাসে মাসে পাঁচটি মাসিক পত্রিকা হাতে লিখে প্রকাশ করে। 'শান্তি', 'বীথিকা' বড়ো ছেলেদের উপযোগী। 'প্রভাত', 'বাগান' মধ্যমবয়স্কদের এবং 'শিশু' শিশুদের জন্য।

৬. বাগান : আশ্রমের ছাত্ররা আশ্রমের পথ বাঁধানো, জঙ্গল পরিষ্কার এসব কাজেও ব্যাপৃত থাকবে।

আশ্রমজীবনের সামগ্রিক রূপটির অবয়ব দেবার জন্যই গঠিত হয়েছিল আশ্রমসম্মিলনী। অধ্যয়ন ব্যতীত আশ্রমের স্বাস্থ্য, সেবা, সাহিত্য, আহার্য, নিকটবর্তী পল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ—সবই সম্মিলনীর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হল ক্রমান্বয়ে। আশ্রম সম্মিলনীর সভা বসত মাসে দুবার—অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়। সেদিন অনধ্যায় থাকত। ছাত্ররা নিজেদের সমস্যার সমাধান করে নিজেরাই। আগামী দিনের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের দায়িত্বও ছিল তাদের। এই আশ্রম সম্মিলনীই স্বাধীনভাবে আত্মকর্তৃত্বচর্চার ক্ষেত্র তৈরী করে দেয় ছাত্রদের। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছাত্র স্বরাটের কথা ভেবেছিলেন। বিদ্যালয় পরিচালনার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ছাত্রদের সক্রিয় যোগদান তার কাছে নানা দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। আশ্রমের সঙ্গে বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্র ও অধ্যাপকদের চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটেছে প্রায় প্রতি সপ্তাহে, 'আশ্রমকথা' প্রতিবেদনে তার পরিচয় পাওয়া যায়। জানা যায় যে কালীমোহন ঘোষ এবং নারায়ণ কাশীনাথ দেবল লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে একজন ইংরেজি সাহিত্য ও রচনার এবং অপরজন ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনের পাঠ গ্রহণ করছে। কালীমোহনবাবু সেখানকার শিশুশিক্ষা প্রণালী বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে অনুধাবন করছেন। অরবিন্দমোহন বসু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। চণ্ডীচরণ সিংহ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন। সোমেন্দ্র দেববর্মন ও বঙ্কিমচন্দ্র রায় আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন।

১৩১৮-১৯ বঙ্গাব্দের বার্ষিক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে ১৮৩৪ শকের মাঘ সংখ্যায়। এ-বিবরণ থেকে আশ্রমের ইতিহাস ধরা পড়ে। আশ্রম-আচার্য দীর্ঘদিন অনুপস্থিত। আশ্রমের প্রতিষ্ঠার পর এত দীর্ঘকালের জন্য তিনি কখনই অনুপস্থিত ছিলেন না। প্রতিবেদনে বলা আছে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান প্রণালী চাক্ষুষ করে আসা এবং তার মধ্যে যা ভালো ও আমাদের দেশের উপযোগী তদনুসারে রোজ নতুন ও উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতি রচনা করা তাঁর বিদেশ-যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সংস্কৃতের অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী, গণিতের বঙ্কিমচন্দ্র রায়, গণিত ও বাংলার হীরালাল সেন ও তেজেশচন্দ্র সেন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কালীমোহন ঘোষ নানা অনিবার্য কারণে আশ্রম ত্যাগ করে গিয়েছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বিষয়ে মন্তব্য আছে, 'বহুশাস্ত্রবিদ সুপণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী' মহাশয়-এর অভাব সহজে পূরণ হইবার নয়।

নানা পারিবারিক সঙ্কটে পড়িয়া অনিচ্ছায় তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ নিষ্ঠা জ্ঞানপিপাসা এবং নিরভিমান ও সরল হৃদয়খানি আশ্রমবাসী অধ্যাপক ও ছাত্র সকলেরই সুদৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র রায় ও কালীমোহন ঘোষ শিক্ষার্থী হয়ে বিদেশে গেছেন। তেজেশচন্দ্র সেন 'শিক্ষাব্যপদেশে' স্থানান্তরে গেছেন। দিনেন্দ্রনাথ 'অসুস্থতা নিবন্ধন' আশ্রম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সংখ্যা তখন ১৮৬। বার্ষিক প্রতিবেদনে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা দেওয়া আছে। যেমন : ত্রিপুরা ৪৩, ঢাকা ৩২, ময়মনসিংহ ১২, শ্রীহট্ট ১৬, ফরিদপুর ৭, বরিশাল ৯, চট্টগ্রাম ১, পাবনা ১০, রাজশাহী ৫, রংপুর ২, দিনাজপুর ১, ভাগলপুর ৫, পূর্ণিয়া ২, দার্জিলিং ৪, মালদহ ২, মুঙ্গের ১, যশোহর ৫, খুলনা ৫, কলকাতা ৪২, নদীয়া ৬, মুর্শিদাবাদ ৫, হাওড়া ১, হুগলী ৬, বর্ধমান ৩, মানভূম ১, বাঁকুড়া ২, বীরভূম ২, হাজারিবাগ ৩, মেদিনীপুর ১, উড়িষ্যা ৩, আসাম ১, ব্রহ্মদেশ ৩, বোম্বাই ৩, রাজপুতানা ৩, পাঞ্জাব ১। ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় একটি সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করছে।

বিদ্যালয় ছাত্রদের শিক্ষার বিষয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। ইংরেজি-বাংলা-সংস্কৃত ভূগোল ও গণিত ছাড়াও পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সকল ছাত্রদের বাধ্যতামূলক। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এখানকার শিক্ষার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। পর্যবেক্ষণের দ্বারা অনেক কীটপতঙ্গ ও গুটিপোকার জীবনের ইতিহাস ছাত্ররা লিপিবদ্ধ করে। বৎসরে কত ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে এবং প্রতিদিন কী প্রকারে আমাদের চতুর্দিকের বায়ুর উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, ছাত্ররা মানযন্ত্রের সাহায্যে তা লিপিবদ্ধ করে। এছাড়াও আছে রাতে দূরবীন দিয়ে বৃহৎ গ্রহগুলির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় স্থাপনের ব্যবস্থা।

এ-বিদ্যালয় যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র তা এর বিদ্যাচর্চা ও জীবনচর্চার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত। এখানে বিভিন্ন দিনে ইশা, মুহম্মদ, গৌতমবুদ্ধ, কবীর, চৈতন্য, নানক, রাজা রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়। আবার বিভিন্ন অধ্যাপকরা, যেমন নেপালচন্দ্র রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, শরৎকুমার রায়, কালিদাস বসু, নগেন্দ্রনাথ আইচ ও অজিতকুমার চক্রবর্তী আশ্রমবালকদের ধর্ম ও নীতিসম্বন্ধে উপদেশ দেন।

সাধারণত সন্ধ্যা বা রাত্রিতে আশ্রমবালকেরা বিদ্যাভ্যাস করে না। পরীক্ষার্থী ছাত্ররা প্রয়োজন অনুসারে রাত্রিতে পাঠ করে। সান্ধ্য উপাসনার পর থেকে রাত্রির আহারকাল পর্যন্ত বিনোদনপর্ব। এরই সঙ্গে "অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় কতকগুলি বালককে লইয়া সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, নগেন্দ্রনাথ আইচ, নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় প্রভৃতি মনোরঞ্জন অথচ শিক্ষাপ্রদ গল্প বলিয়া বালকদিগকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। কোনো কোনো দিন এই সময়ে কতকগুলি ছাত্রকে লইয়া আকাশের নক্ষত্রগুলির সহিত তাহাদের পরিচয় স্থাপন করাইয়া দেওয়া

হয়।" (১৩৩৪ শক, মাঘ, পৃ. ২৪৮)

প্রতিদিন রাত্রে শোবার আগে এবং সকালে শয্যাত্যাগের পূর্বে একদল ছাত্র বৈতালিক গান ক'রে আশ্রম পরিভ্রমণ করে। ছাত্র অধ্যাপকরা মিলে গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশের আগে কোন নাটক মঞ্চস্থ করে। যেমন একবার হ'ল 'রাজা ও রানী', আরেকবার 'শারদোৎসব'।

এই আশ্রমের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য আছে পূর্তবিভাগ, বীক্ষণাগারে আছে দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, রশ্মিনির্বাচন যন্ত্র। আশ্রমের অসুস্থ বালক বা আশ্রমবাসীদের প্রয়োজনে আছে 'রুগ্নাবাস', আশ্রমের ঔষধালয় থেকে নিকটবর্তী গ্রামবাসীদেরও ঔষধ বিতরণ করা হয়। 'আশ্রম বৈদ্য' প্রয়োজনে তাদের চিকিৎসা করেন। এছাড়া আছে আশ্রমসংলগ্ন গোষ্ঠ। গোষ্ঠচালনার ভার সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের। আশ্রমশিক্ষা সমাপন করে আমেরিকায় তিন বৎসর তিনি গো-পালন বিদ্যা শিক্ষা করে এসে আশ্রমের কাজে যোগ দিয়েছেন। আশ্রম-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছে একটি সেবা ভাণ্ডার। দরিদ্র বিদ্যার্থীকে এবং অসহায় ও বিপন্ন মানুষদের এই ভাণ্ডার থেকে সাহায্য করা হয়। এই সেবাভাণ্ডার এবং গ্রাম্য বিদ্যালয় পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীর সঙ্গে আশ্রমবাসীর সম্বন্ধের সেতু রচনা করে চলে।

১৮৩৫ শকের আশ্বিন সংখ্যা থেকে জানা যায়, দিল্লী কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড সি. এফ. এন্ড্রুজ প্রায় দেড় মাস আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন। অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনায় একদিন এন্ড্রুজ বলেন যে ইংলণ্ডে নানা পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়েছে যে স্কুলে পাঠের ঘণ্টার মধ্যে মধ্যে ছেদ না দিলে ছাত্ররা যথেষ্ট মনোযোগ করতে পারে না। দেখা গেছে যে একঘণ্টা অধ্যয়নের পর যদি কিছু সময় অবকাশ দিয়ে তারপর আবার এক ঘণ্টা পাঠাভ্যাস শুরু হয় তবে ছাত্ররা অধিক মনোযোগ ও উৎসাহ পায়। এন্ড্রুজ সাহেবের এই আলোচনার পর বিদ্যালয়ের সময়সূচী সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়। এই সংখ্যায় ঘোষণা করা হয় মিঃ পিয়ার্সন আশ্রমে আগামী জানুয়ারি মাস থেকে যোগদান করবেন।

১৮৩৫ অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় 'আশ্রমকথা'য় আছে, "আশ্রমের আচার্য পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে চারদিন এবং কলিকাতা হইতে সম্বর্দ্ধনার জন্য যে দিবস পাঁচশত জন গণ্যমান্য ব্যক্তি আসিয়াছিলেন সেই একদিন সেই পাঁচ দিন বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ ছিল।"

বার্ষিক বিবরণ থেকে জানা যায় ইংরেজির অধ্যাপক কিশোরী মোহন জোয়াদ্দার আশ্রম ত্যাগ করেছেন। তাঁর পরিবর্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তও আশ্রম ত্যাগ করেছেন, এখন সেখানে নিযুক্ত হয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ সেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে আশ্রম ছেড়ে গিয়ে দিনেন্দ্রনাথ আবার ফিরে এসে ইংরেজি ও সঙ্গীতের শিক্ষাভার গ্রহণ করেছেন। ইংরেজির অধ্যাপক শচীন্দ্রমোহন বসু কিছুকাল আশ্রম থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তিনি আবার ফিরে এসেছেন। কালীমোহন ঘোষ এক বৎসরকাল ইংলণ্ডে

অধ্যাপনা-পদ্ধতি শিক্ষা করে এসে আশ্রমের শিশুদের শিক্ষা বিধানের ভার নিয়েছেন। আশ্রমের অক্লান্ত কর্মী সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় অবসর নিয়েছেন। তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। বিখ্যাত চিত্রকর অসিত কুমার হালদার বালকদের চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ভার গ্রহণ করবেন বলে স্থির হয়েছে।

দেশ অথবা বিদেশ—যে কোনো দুর্যোগের দিনে আশ্রমবাসী ছাত্র-অধ্যাপকরা সাধ্যমতো সেবাকার্যে নিজেদের নিযুক্ত করত। ১৩১৯-২০ বার্ষিক প্রতিবেদনে আছে যে প্লাবন-পীড়িত নিরন্ন ব্যক্তিদের সাহায্যকরা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উৎপীড়িত ভারতবাসীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার জন্য ছাত্র-অধ্যাপকরা দুটি অনুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিল। এই কাজে অর্থ সংগ্রহের জন্য ছাত্র-অধ্যাপকরা 'মৃত্তিকা খনন' প্রভৃতি সেবাদান করে অর্থোপার্জন করেছে।

১৮৩৬ জ্যৈষ্ঠের সংবাদে আছে, পিয়ার্সন সাহেব আশ্রম বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করেছেন। তিনি বিগত ১৭ চৈত্র দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাগমন করেছেন। আশ্রমে প্রবেশের সময় বৈদিক প্রথানুসারে তাঁকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা জানান হয়।

৬ বৈশাখ ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাগমন করেছেন এন্‌ড্রুজ। আশ্রমের প্রবেশ দ্বারে উপনীত হলে তাঁকে আসনে বসিয়ে শঙ্খধ্বনি করে লোক সমাগমের মধ্যে আচার্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে 'স্রক্‌চন্দনে' ভূষিত করেন। তারপর ছাত্ররা সমস্বরে যোগদান করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরচিত কবিতা পাঠ করেন :

"প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার
হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।"

বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে, ছাত্ররা পূর্ববঙ্গবাসীদের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য নিজেরা নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করছে এবং আশ্রমের নিকটবর্তী সাঁওতাল অধিবাসীদের হিতকল্পে একটি বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ করেছে। বালকদের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি বাংলা তর্কসভা এবং হস্তলিখিত ইংরেজি বাংলা পত্রিকাগুলি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী, কালীমোহন ঘোষ এবং জগদানন্দ রায় সান্ধ্য সম্মিলনে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করে বালকদের চিত্তবিনোদন করছেন। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বৎসরান্তে দলবদ্ধ হয়ে নানা স্থানে ভ্রমণে যাচ্ছে : পরেশনাথ পাহাড়, ঝরিয়ার কয়লা খনি, বক্রেশ্বরের উষ্ণপ্রস্রবন, পূর্ববঙ্গ, আসাম। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চারিদিকের গ্রাম-পল্লির বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশই। কয়েকটি ছাত্র নিয়মিতভাবে গ্রামের বালকদের শিক্ষাদান করছে। আশ্রমের সুযোগ্য চিকিৎসক যথাসাধ্য গ্রামের অসুস্থদের চিকিৎসা করছেন। ক্রীড়া নিয়ে বালকদের উৎসাহ যথেষ্ট। সিউড়ি থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তারা পুরস্কার আনছে। তাদের নাট্যচর্চা বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'অচলায়তন', 'A Midsummer Night's Dream' ছাত্র-অধ্যাপকরা অভিনয় করছে।

ছাত্রপরিচালনার প্রায় সকল ভার আশ্রমবালকদের উপর। প্রত্যেক বিভাগে

একটি 'ছাত্রসভা'। সমগ্র আশ্রমবালকদের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত 'আশ্রমসম্মিলনী' বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে অনেক মান্য অতিথিরা আসছেন। যেমন ১৩২০-২১ বঙ্গাব্দে এসেছেন দিল্লী কলেজের অধ্যাপক লরেন্স ও ইয়ং সাহেব, হাজারিবাগ কলেজের টমাস সাহেব, স্কটল্যাণ্ডের অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনাল্ড, ধর্মপ্রচারিকা মিসেস ষ্টানার্ড, মিশরদেশীয় কবি বোস্তানি, চতুর্দশ মহাসঙ্ঘের ধর্মপাল ও পূর্ণানন্দ স্বামী, আমেরিকার মার্শেল সাহেব। মাত্র ১৪/১৫ বৎসর আগে যে ছাত্ররা ক্ষৌমবস্ত্র পরে বৈদিকমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল, আজ বিদ্যালয়ের সেই ছাত্রদের কাছে এসে পৌঁছল দেশ বিদেশের শিক্ষা-দীক্ষার নিয়ত জায়মান এক সার্বিক চিন্তাপ্রবাহ। বস্তুত বীরভূমের প্রান্তবর্তী এক গ্রামীণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল পৃথিবীর নানা প্রান্তের চিন্তার স্রোত-উপস্রোতের। এভাবেই ভিতরে-ভিতরে তার প্রস্তুতি ঘটছিল। বিদ্যায়তনের এই চরিত্রটিই প্রার্থিত ছিল প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের—"আমাদের এই আশ্রমটি কোথাও প্রাচীর তোলেনি, গম্ভীর রেখা কোথাও আঁকেনি। একেবারে বিশ্বের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এই আশ্রম। সেইজন্য আজ বিশ্বের নানা দিক থেকে যাত্রীর দল এখানে আসছে। যে ছেলেরা এখানে আসছে তাদের বিশ্বের চারিদিকে পথে পথে এই আশ্রম বের করে দেবে, উন্মুক্ত জীবনের পথে তাদের বেরিয়ে পড়তেই হবে।...

আজ নববর্ষের দিনে আশ্রমের ভিতরকার কথাটি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ঐ যে দরজা খুলল—বহুযুগের বন্ধ দরজা। ঐ যে এসে পড়ল—বিশ্বযাত্রীর দল। তারা হাঁক দিয়ে বলল,—আমরা যে বেরিয়েছি। তোমরা এখনো বেরওনি? সমুদ্রের বাধা, জাতীয়তার বাধা, স্বাদেশিক অভ্যাসের বাধা, ধর্ম সংস্কারের বাধা আমরা যে পার হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি।

তোমরা নবীনযাত্রী তোমরা একবার বল—না, আমরা আলোকের পথে চলব, আমরা সত্যের পথে চলব, আমরা অমৃতের পথে চলব।" (জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৬, পৃ. ২৭-২৯)

পঠন-পাঠন ছাড়াও এ-আশ্রমে বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা হয়। তারই পরীক্ষা-লব্ধ ফল মাঝে মাঝে প্রকাশিত হত পত্রপত্রিকায়। ছাত্ররা উত্তাপমান প্রস্তুত করে বায়ুচক্রযান বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেয়। ৫ম ও ৪র্থ বর্গের ছাত্ররা নিজেরা তাপমান ও বায়ুমান, বর্ষমান যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ ও কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেন।

এ-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ক্রমান্বয়ে বিশ্ববোধে দীক্ষিত হচ্ছে তখন। এক দিকে যেমন বিশ্বের বিদ্যা আহরণ করে এ-বিদ্যায়তনের প্রাক্তন ছাত্ররা অথবা স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ঋদ্ধ করে তুলছেন এর সামগ্রিক শিক্ষাচর্চার, তেমনি দেশবিদেশ থেকে আগত অতিথিবৃন্দ তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিচ্ছেন ছাত্রদের প্রতিনিয়ত। যেমন সিরীয় দেশের আরবী কবি ওয়াদি বোস্তানী আসছেন আশ্রমে, তেমনি মহারাষ্ট্রের সুগায়ক

সংস্কৃতজ্ঞ শাস্ত্রীও আশ্রমে আসছেন। যেমন ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ হলাণ্ড সাহেব, বাঁকুড়া কলেজের অধ্যাপক টমসন্ সাহেব, স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক ওয়াটসন সাহেব, দিল্লী কলেজের অধ্যাপক লরেনস্ সাহেব, ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের সভ্য রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব—এরা সবাই আশ্রমে আসছেন। আর এই বহুমুখী বিদ্যাচর্চা এই বিদ্যালয়কে ক্রমশ স্বতন্ত্র করছে। জন্ম দিচ্ছে এক বিশ্বকতূহলী জিজ্ঞাসা। কিন্তু শুধু হৃদয়হীন কোনো জ্ঞানচর্চাই এই বিদ্যায়তনের বিষয় নয়। এক বিশ্ব-অধ্যাত্মবোধে তারা দীক্ষিত হচ্ছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মর্মঘাতী ঘোষণায় ২০ শ্রাবণ বুধবার শান্তিনিকেতন মন্দিরে ছাত্ররা শুনছে তাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের ভাষণ "মা মা হিংসীঃ"।

মানুষের সকল প্রার্থনার মধ্যে এই একটি প্রার্থনা দেশে দেশে কালে কালে চলে আসছে—মা মা হিংসীঃ।

আমাকে বিনাশ কোরো না।

সমস্ত ইউরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকে আপনি একদিন বিদীর্ণ করবে। 'এক এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করছে। বর্মে বর্মে চর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগত তলোয়ারে শান দিচ্ছে।

মানুষের এই প্রচণ্ড শক্তিও বিধাতার দান। তিনি মানুষকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েছেন এবং দিয়ে বলে দিয়েছেন—যদি তুমি একে কল্যাণের পক্ষে ব্যবহার কর, তবেই ভালো। আর যদি পাপের পক্ষে ব্যবহার কর তবে এ ব্রহ্মাস্ত্র তোমার নিজের বুকেই বাজবে।

স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে, এই যে আমরা প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত করছি ও আঘাত পাচ্ছি—সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্দনধ্বনি একটা ভয়ানক বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনা রূপে রক্তস্রোতে গর্জিত হয়ে উঠছে 'মা মা হিংসীঃ।' (আশ্বিন-কার্তিক ১৮৩৬, পৃ. ১০৭)

বস্তুত ধীরে-ধীরে একটি বিদ্যালয়ের মধ্যেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হচ্ছে। তার জ্ঞানচর্চা পরিধি বহুমুখী শাখা প্রসারিত করে ক্রমান্বয়ে যুক্ত হচ্ছে সর্বজাতিক জ্ঞানচর্চার বোধবৃত্তে। ভবিষ্যতে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রস্তুতিকে ধারণক্ষম হয়ে সে জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের সীমা ছাড়িয়ে যাবে। যার প্রকাশ ঘটবে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এই ভাবনাতেই ১১ অক্টোবর ১৯১৬ সালে এক চিঠিতে কবি এই পরিকল্পনার উল্লেখ করেছিলেন : শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।

সূচি

আশ্রমকথা

শান্তিনিকেতন

মহর্ষি মনু কহিয়াছেন যে স্থলে অনেকানেক স্থানের ভগবদ্ভক্ত সাধুলোক সকল আসিয়া আশ্রয় লন তাহাই তীর্থ এবং তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণেই তৎ তৎ স্থান পবিত্র স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ফলত তীর্থস্থান থাকাতে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য ও উপকার সাধিত হয়। সংসারের অনেক পাপ তাপ জ্বালা যন্ত্রণা। কিছুদিনের জন্য ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ করিলে মনের নির্বৃত্তিলাভ হয় এবং সংসার তাপ অনেকটা ঘুচিয়া যায়। এই সাধু উদ্দেশে আজও অনেকে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সাধুসঙ্গে ও সৎ প্রসঙ্গে নবজীবন লাভ করিয়া থাকে। আমরা অতি আহ্লাদের সহিত ব্রাহ্ম সাধারণকে জানাইতেছি যে তাঁহাদের জন্য ঐ রূপ একটি পবিত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুরের সুপ্রসিদ্ধ শান্তিনিকেতন। তিনি ব্রাহ্মদিগের উপকারার্থ ঐস্থান উৎসর্গ করিলেন। ব্রহ্মসন্তান সকল ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থে ঐ স্থানে যাইবেন। উহা ব্রহ্মবিৎ সাধু লোকের আশ্রয়-ভূমি হইয়া রহিল। যাঁহারা সাংসারিক উৎপীড়নে কাতর হইয়া মনের শান্তি হারাইয়াছেন তাঁহারা ঐ শান্তিনিকেতনে যাত্রা করুন। উহা সাধু সমাগমে সততই পবিত্র। তথায় যাইলে জ্ঞানবল ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতে পারিবেন। ঐ স্থানে বর্ষে বর্ষে একটি সাধু সজ্জনের মেলা হইবে। দেশ দেশান্তরের জ্ঞানী ও সাধুর সমাগম হইবে। যিনি সংশয়ী ধর্ম্মবাদ তাঁহার সংশয় দূর করিবে। যিনি আরুরুক্ষু তিনি ধর্ম্মের সোপান পাইবেন। যিনি প্রেমিক তিনি হৃদয়োন্মাদকর অনেক সৎকথা শুনিবেন। যিনি সজ্জনভক্ত তাঁহার আশা চরিতার্থ হইবে। এই স্থানের যেমন পবিত্রতা তেমনি রমণীয়তা। ইহার চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত প্রান্তর। স্বাস্থ্যকর মুক্ত বায়ু সততই বহিতেছে। মধ্যে উদ্যান ভূমি ও প্রকাণ্ড প্রাসাদ। তথায় ছায়াবৃক্ষ ও নির্ম্মল জলের অভাব নাই। কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সুমধুর সঙ্গীতের বিরাম নাই। এই নির্জ্জন স্থান শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সাধনস্থান ছিল। তিনি অনেক সময় ঐ স্থানে কালাতিপাত করিতেন। ফলত তাঁহার অধিষ্ঠানে ঐ স্থান পবিত্র। যিনি যতই মনোবিকার লইয়া যান স্থানমাহাত্ম্যে তাঁহার মনে নির্ম্মল ও পবিত্র শান্তি আসিবে। ব্রাহ্মসমাজের অদ্বিতীয় ও চির বন্ধু শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মদিগের উপকারার্থ এই পবিত্র স্থান উৎসর্গ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের যে সকল কার্য্য তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে ইহাও তন্মধ্যে একটি প্রধান কার্য্য। এখন ঈশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি তিনি যে উদ্দেশ্যে ইহা দান করিলেন তাহা যেন সুপ্রসিদ্ধ হয়।

আমরা নিম্নে ইহার ট্রষ্টডীড মুদ্রিত করিয়া দিলাম। ইহা পাঠ করিলে ইহার কত উচ্চ ও সৎ উদ্দেশ্য তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ট্রষ্টডীড

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাং যোড়াসাঁকো কলিকাতা। শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। সাং মাণিকতলা কলিকাতা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। পিতার নাম কৃপানাথ মুন্সী। হাং সাং পার্কষ্ট্রীট কলিকাতা।

স্নেহাপদেষু

লিখিতং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার নাম দ্বারকানাথ ঠাকুর সাকিম সহর কলিকাতা যোড়াসাঁকো হাল সাং পার্কষ্ট্রীট।

কস্য ট্রষ্ট ডিড পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতি ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্টারী বীরভূম সব রেজেষ্টারী বোলপুর পুলিশ ডিবিজন বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক সুপুরের অন্তর্গত হুদা বোলপুরে পত্তনির ডৌল খারিজান মৌজে ভুবন নগরের মধ্যে বাঁধের উত্তরাংশে প্রথম তপসিলের লিখিত চৌহদ্দির অন্তর্গত আনুমানিক বিশ বিঘা জমি ও তদুপরিস্থিত বাগান ও এমারত যাহা এক্ষণে শান্তিনিকেতন নামে খ্যাত আছে ঐ বিশ বিঘা জমি আমি সন ১২৬৯ সালের ১৮ ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংদিগরের নিকট হইতে মৌরসী পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি বাগান ও একতালা দোতালা ইমারত প্রস্তুত পূর্ব্বক মৌরসী স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলিকার আছি। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও অত্র ট্রষ্টডিডের লিখিত কার্য্য সম্পাদনার্থে আমি উক্ত শান্তিনিকেতন নামক সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর হক হকুক যাহা কিছু আছে ও যাহার মূল্য আনুমানিক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ঐ সমুদায় সম্পত্তি তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতেছি যে তোমরা ট্রষ্টী স্বরূপে স্বত্ববান হইয়া স্বয়ং ও এই ডিডের স্বর্ত্তমত স্থলাভিষিক্ত গণ ক্রমে চিরকাল এই ডিডের উদ্দেশ্য ও কার্য্য পশ্চালিখিত নিয়ম মতে সম্পন্ন করিয়া দখলিকার থাকিবে। আমার বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব দখল রহিল না। উক্ত সম্পত্তি চিরকাল কেবল নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে। ঐ ব্যবহারের প্রণালী এই ট্রষ্টডিডে যেরূপ লিখিত হইল তৎ-বিপরীতে কখনো হইতে পারিবে না। এই ট্রষ্টীর কার্য্য সম্বন্ধে ট্রষ্টীগণের মধ্যে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মত অনুসারে কার্য হইবেক। কোন ট্রষ্টীর মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণ তাহার স্থানে এই ডিডের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে উপযুক্ত ও ইচ্ছুক কোন প্রাপ্তবয়স্ক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবেন। নূতন ট্রষ্টী সর্ব্বাংশে এই ডিডের নিয়মাধীন হইবেন। উক্ত শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন, গৃহের অভ্যন্তরে উপাসনা করিতে হইলে ট্রষ্টীগণের সম্মতি আবশ্যক হইবেক, গৃহের বাহিরে

ঐরূপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেক না। নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু, পক্ষী, মনুষ্যের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীবহিংসা বা মাংস আনয়ন বা আমিস ভোজন বা মদ্য পান ঐ স্থানে হইতে পারিবে না। কোন ধর্ম্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐ স্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা বন্দনাদি ধ্যান ধারণার উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতি ধর্ম্ম উপচিকীর্ষা এবং সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়। কোন প্রকার অপবিত্র আমোদ প্রমোদ হইবে না। ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্ম্ম-বিচার ও ধর্ম্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোন রূপ আয় হয় তবে ট্রষ্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির জন্য ট্রষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহ-নির্ম্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রম ধর্ম্মের উন্নতির বিধায়ক সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ যত্নসহকারে চিরকাল ঐ অর্পিত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ও তজ্জন্য এবং শান্তিনিকেতনের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত তথায় একজন উপযুক্ত সচ্চরিত্র, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আশ্রমধারী নিযুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ঐ আশ্রমধারী ট্রষ্টীগণের তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। যদি আশ্রমধারী আপনার শিষ্যগণ মধ্যে কাহাকেও উপযুক্ত বোধ করেন তবে তিনি ট্রষ্টীগণের লিখিত অনুমতি গ্রহণে সেই শিষ্যকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে পারিবেন। কিন্তু ট্রষ্টীগণের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐ রূপ করিতে পারিবেন না, কিম্বা আশ্রমধারী তাহার যে শিষ্যকে ঐরূপ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে ইচ্ছা করেন যদি ট্রষ্টীগণের বিবেচনায় ঐ ব্যক্তি ঐ কার্য্যের উপযুক্ত না হয় তাহা হইলে তাঁহারা ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে আশ্রমধারী মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আশ্রমধারীর মনোনীত শিষ্যকে আশ্রমধারীর পদে নিযুক্ত করিবার ও তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ট্রষ্টীগণের থাকিবে। যদি কেহ কখন এই আশ্রমের উন্নতি বা সাহায্যের জন্য কিছু দান করেন তবে ট্রষ্টীগণ তাহা গ্রহণ করিবেন এবং তাহা এই ডিডের লিখিত উদ্দেশ্য সাধন ও কার্য্য নির্ব্বাহ ও ব্যয় সঙ্কুলান জন্য দ্বিতীয় তফশীলের লিখিত সম্পত্তি সকল দান করিলাম, উহার আনুমানিক মূল্য ১৮৪৫২ টাকা। ট্রষ্টীগণ অদ্য হইতে ঐ সকল সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সর্ব্বপ্রকার

বিলি-বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সকল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ও রাজস্ব প্রভৃতি বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা দ্বারা আশ্রমের আবশ্যকীয় ব্যয় আশ্রমের গৃহাদি মেরামত ও নির্ম্মাণ এবং এই ডিডের লিখিত অন্যান্য সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, উক্ত প্রদত্ত সম্পত্তি সকলের আয়ের দ্বারা ট্রষ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তবে ট্রষ্টীগণ তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট বা কোন রূপ নিরাপদ মালিকি সত্ত্বে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিবেন কিম্বা আশ্রম কিম্বা মেলার উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। যদি কোন রূপ সম্পত্তি কিম্বা প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তবে তাহা ট্রষ্টী-সম্পত্তি গণ্য হইয়া এই ডিডের সর্ত্ত মত ব্যবহার হইবেক। কিন্তু উদ্বৃত্ত আয় হইতে যদি কোন গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তাহা হইলে যদি আশ্রমের কোন কার্য্যে সেই প্রমিসরি নোট বিক্রয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহা ট্রষ্টীগণ বিক্রয় করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ এই আশ্রমের আয় ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। এই ডিডের লিখিত কার্য্য সমূহ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে অর্পিত সম্পত্তির আয় ট্রষ্টীগণ ব্যয় করিতে পারিবেন না ও এই সকল সম্পত্তির কোন রূপ দান বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর ও দায় সংযোগ করিতে পারিবেন না। ও ট্রষ্টীগণের নিজের কোন রূপ দেনার নিমিত্ত এই সকল সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ দায়ি হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় তপশীলের লিখিত সম্পত্তির মধ্যে জেলা রাজসাহী ও পাবনার অন্তর্গত গালিমপুর ও ভার্ত্তিপাড়া নামে রেশমের যে দুইটি কুঠী আছে কোন কারণ বশত ঐ কুঠীর দ্বয়ের আয় যদি বন্ধ হয় তাহা হইলে আবশ্যক বিবেচনায় ট্রষ্টীগণ এই দুই কুঠী বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যের টাকা দ্বারায় ট্রষ্টীগণ গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট অথবা অন্য কোন নিরাপদ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন। সেই খরিদা সম্পত্তি আমার অর্পিত মূল সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইয়া এই ডিডের স্বর্ত্তমতে কার্য্য হইবেক এতদর্থে তৃতীয় তপশীলের লিখিত দলিল সমস্ত ট্রষ্টীগণকে বুঝাইয়া দিয়া সুস্থচিত্তে এই ট্রষ্টীডিড্ লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈশাখ ১৮১০ শক। পৃ. ১১-১৪

শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রম অতি পবিত্র রমণীয় স্থান। সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ, নির্ম্মল জল, বিহঙ্গ-কূজিত নানারূপ বৃক্ষরাজি, উন্মুক্ত নীলাকাশ ও শষ্পাচ্ছাদিত বিশাল প্রান্তর এই আশ্রমকে রমণীয় শোভায় শোভিত করিয়াছে। সংসারতাপে উত্তপ্ত ঈশ্বর-পিপাসু

সাধকেরা এই আশ্রমে আগমন করিয়া নির্জ্জনে পরমাত্মার শ্রবণ মনন ও জ্ঞানচর্চা ধর্ম্মপ্রসঙ্গাদি করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মার্থী অতিথিগণের কি শারীরিক কি আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার সুবিধার জন্য পূজ্যপাদ মহর্ষি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া আশ্রমের সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখানে বাহিরের কোন কোলাহল নাই, নির্জ্জনে শান্তমনে পরমেশ্বরের আরাধনার সমুদায় অনুকূল ভাব এখানে বর্ত্তমান। এত দিন এই আশ্রমে ব্রহ্মোপাসনার জন্য পৃথক মন্দির না থাকায় প্রাসাদেই উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইত। মহর্ষি, সাধক দিগের এই অসুবিধার কথা জ্ঞাত হইয়া শান্তিনিকেতনে লৌহময় সুপ্রশস্ত ব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ ট্রষ্টী মহোদয়দিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গত ২২ শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়। অনন্ত নীলাকাশের নিম্নে আশ্রম প্রাঙ্গণে উপাসনার জন্য সকলে একত্র হইয়াছিলেন। সুরুল, রায়পুর, বোলপুর প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী ভদ্রপল্লী হইতে ৬০। ৭০ জন নানাশ্রেণীর বিশিষ্ট ভদ্রলোক আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করেন; এবং অতিশ্রদ্ধেয় সুকবি ও সুগায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুরাগভরে ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। উপাসনা শেষে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য এবং স্বদেশবাসী জনগণের ধর্ম্মোন্নতির জন্য পরম ভক্তিভাজন মহর্ষির প্রাণগত যত্ন ও ভূরিপরিমাণ অর্থ ব্যয় ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই, "যদিও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় স্থান ব্রহ্মসত্তাতে পরিপূর্ণ এবং আমাদের হৃদয়ই যথার্থতঃ ব্রহ্মের মন্দির, কিন্তু বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া সামাজিকভাবে ভগবদারাধনার জন্য ব্রহ্মমন্দিরের প্রয়োজন। আমরা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। পরমেশ্বর আমাদের শুভ সংকল্পের সহায় হউন। তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া আমরা আজ যে বীজ প্রোথিত করিলাম, তাঁহার প্রসাদে কালক্রমে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইবে। এই মন্দিরে কেবল একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তিও হইবে। পরমেশ্বর করুন সমগ্র ভারতভূমি সমগ্র বঙ্গদেশ প্রতি পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক, কল্পিত দেবদেবীপূজার পরিবর্ত্তে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রহ্মের নাম ধ্বনিত হউক।"

অনন্তর ভিত্তিমূলে যে খোদিত তাম্রফলক প্রোথিত করা হয়, সত্যেন্দ্র বাবু সর্ব্বসমক্ষে তাহা পাঠ করিলেন। তাম্রফলকে এই কয়েকটি কথা দেবনাগর অক্ষরে খোদিত আছে।

"ওঁ তৎসৎ। ঠক্কুরবংশাবতংসেন পরমর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণা

ধৰ্ম্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কল্যব্দ। অগ্রহায়ণ ২২ রবিবাসর।" পরে সকলে মন্দিরের ভিত্তি মূলে গমন করিলে তাম্রফলক, পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা এবং উক্ত ২২শে অগ্রহায়ণের Statesman পত্রিকা, এই অগ্রহায়ণ মাসের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" একটি আধারে আবদ্ধ করিয়া মন্দিরের ঈশান কোণে প্রোথিত করা হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত দ্রব্যগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া স্বহস্তে কর্ণিক দ্বারা ভিত্তি প্রস্তর গাঁথিয়া দিলেন। সর্ব্বশেষে সত্যেন্দ্র বাবু পরমেশ্বরের নিকট এই শুভকার্য্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া কার্য্য শেষ করিলেন।

পৌষ ১৮১২ শক। পৃ. ১৬৮-৮৯।

প্রতিষ্ঠা পত্র।

"অদ্য সর্ব্বসাক্ষী পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের কৃপা স্মরণ পূর্ব্বক এই শান্তিনিকেতন আশ্রমস্থ নূতন ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার জাতি বর্ণ অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণের ব্রহ্মোপাসনার জন্য উন্মুক্ত হইল। এই শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের এক জন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন। নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায় বিশেষের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন ধর্ম্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা এইস্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা বন্দনা ও ধ্যান ধারণাদির উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতি ধর্ম্ম উপচিকীর্ষা এবং সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়। কোন প্রকার অপবিত্র আমোদ প্রমোদ হইবে না। ট্রষ্টডীডের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির জন্য ট্রষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিবেন এবং এই আশ্রম ধর্ম্মের উন্নতির বিধায় সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারিবেন।"

অনন্তর সকলে মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে অর্চ্চনা পাঠ করিলেন। তৎপরে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত শ্রীঅচ্যুতানন্দ স্বামী বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা কার্য সুসম্পন্ন করিলেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠা কার্য্যের উপযোগী বক্তৃতা করিলেন।

"অদ্য আমরা এখানে এই শান্তিনিকেতনে সবান্ধবে সমাগত হইয়া সুনির্ম্মল শান্তির পরমধাম পরব্রহ্মের উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছি। এই শুভ অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের আরাধ্য দেবতা সর্ব্বশুভদাতা বিশ্ববিধাতা পরম পুরুষ পরব্রহ্মের প্রসাদ

যাচ্ঞা করিতেছি যাহার প্রসাদে শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হয় এবং মরুভূমিতে উৎস উৎসারিত হয়। অদ্য আমরা সকলে মিলিয়া একান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি প্রসন্ন হইয়া এই বিজন প্রান্তর মধ্যে তাঁহার অপার করুণার সাক্ষীরূপে তাঁহার এই উপাসনা মন্দির অটলভাবে দণ্ডায়মান রাখুন ; যেন তাঁহার পূজার পুণ্য-প্রবাহিনী স্রোতস্বতী এখান হইতে স্বর্গীয় শান্তি সুধায় নিত্য নিত্য পৃথিবী পবিত্র করিতে থাকে।

হে পরমাত্মন্! এই কোলাহল-পূর্ণ সুখ দুঃখময় জগৎ সংসারে তুমিই আমাদের শান্তিনিকেতন! তুমি সর্ব্বশুভদাতাঃ মঙ্গলের মূল প্রবর্ত্তক ; তাই এই শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে সর্ব্বাগ্রে আমরা তোমার প্রসাদ যাচ্ঞা করিতেছি ; তোমার এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা প্রদীপিত বিশ্ব মন্দিরে তোমার অনুপম সুন্দর পবিত্র মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া নিরুপদ্রবে তোমার প্রেমামৃতরস পান করিবার মানসে এখানে যাঁহারা তৃষিত হৃদয়ে আগমন করিবেন, তোমার সর্ব্বসন্তাপহারী মঙ্গল-চ্ছায়া যেন তাঁহাদের সকল পাপ সকল তাপ সকল শোক দূর করিয়া দেয় এবং এই পবিত্র উপাসনা-মন্দির যেন তোমার সুবিমল প্রেম-সুধার ভাণ্ডারী হইয়া সেই দেবস্পৃহনীয় অমৃত বারিতে অভ্যাগত ভক্তজনের অন্তরাত্মা নিত্য নিত্য পরিতৃপ্ত করিতে থাকে। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বেদীর পার্শ্বদেশ হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা।

অনেক দিন হইল আমার দেশে বাসগৃহের সন্নিকটে দুই চারিজন বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম, এমন সময় এক জন বৃদ্ধা নৈবেদ্য লইয়া উপস্থিত হইল। সে কহিল যে পীড়ার সময় ভগবানকে নৈবেদ্য মেনেছিলাম তাই আজ নৈবেদ্য লইয়া দেবোদ্দেশে যাইতেছি। সে অজ্ঞ স্ত্রীলোক, এমন স্থান পাইল না যেখানে ভগবানকে নৈবেদ্য দেয়। আমি বলিলাম ঈশ্বরের স্থান সর্ব্বত্রই। ঈশ্বরের স্থান তোমার হৃদয়ের ভিতরে। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর চিন্তা হইল সকল দেবতার স্থান আছে, কিন্তু ঈশ্বরের স্থান পাব কোথায়। তৎপরেই মহাত্মা রামমোহন রায়কে মনে পড়িল। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরের উপাসনা মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। বর্ত্তমানে অন্যূন ২২০ ব্রহ্মমন্দির ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা এ সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার কার্য্যের গুরুত্ব ভাবী বংশীয়েরা সুস্পষ্ট অনুভব করিবে।

আজিকার মন্দির শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ঈশ্বরের পূজার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল। যে মহাত্মার সাধুভাবে ধর্ম্মবলে এই মন্দির সুনির্ম্মিত হইল, শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই! আমি যখন তাঁহার সহিত ইতিপূর্ব্বে দেখা করিতে যাই, তিনি বলিলেন, "আমি যাইতে পারিব না বটে কিন্তু আমার ছায়া তোমাদের সঙ্গে থাকিবে।"

বিষয়ী লোকেরা বলিবেন, কোথায় ব্রহ্মোপাসনা প্রচার হইতেছে? কি আশা অবলম্বন করিয়া মহর্ষি এত দূরে এত অর্থ ব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন? আমরা অবিশ্বাসী; কিন্তু এমন দিন আসিবে যখন ঈদৃশ মন্দির-প্রতিষ্ঠার সার্থকতা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বিষয়ী লোকের মনে হইতে পারে বটে, কেন এত অর্থব্যয় করি। কিন্তু যিনি ইহার প্রতিষ্ঠাতা তিনি বালক নহেন, যুবা নহেন। তিনি প্রাচীন। তিনি কি আশা অবলম্বন করিয়া এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন? তাঁহার ইহাই বিশ্বাস যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত ভারতের ধর্ম্ম হইবে। এই জন্য তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিকল্পে প্রচুর ব্যয় করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। (নির্বাচিত)

মাঘ ১৮১৩ শক। পৃ. ১৮৪-১৮৫

শান্তিনিকেতনে নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

৭ই পৌষ ৭০ ব্রাহ্মসম্বৎ

রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল। আমরা শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাভাতিক বায়ু সেবনে বহির্গত হইলাম। উদ্যানভূমি অতি রমণীয়। নানাজাতীয় পক্ষী বৃক্ষশাখায় বসিয়া মধুর স্বরে গান করিতেছে। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ মাঠ। আমরা কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, এই অবসরে পূর্ব্বদিকে অরুণরাগ দৃষ্ট হইল। তখন আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক এক সহৃদয় বন্ধুকে কহিলাম—

উদেতি খলু ভানুমান্ বিমলপদ্মরাগদ্যুতিঃ
প্রভাভিরবভাসয়ন্ তিমিরগর্ভলীনং জগৎ।
অহোবত নিশাপতিঃ সমভিবীক্ষ্য তস্যোদয়ং
বিষাদতমসাবৃতোমলিনিমানমাপদ্যতে।

দেখ, নির্ম্মল-পদ্মরাগ-সদৃশ সূর্য্য অন্ধকারগর্ভে নিমগ্ন সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া কেমন উদিত হইতেছে। কিন্তু হায়! রাত্রিশেষের চন্দ্র সূর্য্যের এই উদয় * দেখিয়া যেন বিষাদের কালিমায় মলিন হইয়া পড়িতেছে।

---

* উত্থান ও শ্রীবৃদ্ধি।

চল, আর না, আমরা ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুত হই। পরেই মঠধারী স্বামীজী প্রকাণ্ড ঘণ্টারব সহকারে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ধূপধুনার সুগন্ধ আশ্রম প্রদেশ আমোদিত করিয়া তুলিল। ক্রমশঃ আমরা দলবদ্ধ হইয়া সমস্বরে 'অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি' এই বন্দন গীতি গাহিতে গাহিতে নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত পথ দিয়া সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম।

পরে সকলে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদি গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গীত হইতে লাগিল। অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এইরূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

অদ্য শান্তিনিকেতনের মহোৎসব—ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে দিন নিজের পূর্ণ আদর্শে, নিজের প্রকৃতিগত সত্যে মনুষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে প্রথম উন্মেষিত হইয়াছিল সেই দিনের এই ব্রহ্মোৎসব। অদ্য আমরা এই উৎসব ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া শান্তির প্রদাতা পরব্রহ্মের স্তুতিরবে প্রভাতকে জাগ্রৎ করি ; সে মহা স্তুতিরবে এই দিগন্তব্যাপী বিশাল প্রান্তর নিনাদিত হউক, ব্রহ্মোপাসনার সুগন্ধি কুসুম আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া পরমাত্মার চরণপ্রান্তে নিপতিত হউক।

শান্তির নিকেতন যিনি, তিনি ব্রহ্ম ; ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়া যে স্থান পবিত্র হইয়াছে, তাহাও শান্তিনিকেতন। অধ্যাত্ম চক্ষে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে যে, যেখানে স্বীয় অব্যক্ত মহিমাতে হিরণ্ময় পরম কোষেতে ঈশ্বর বিরাজিত রহিয়াছেন সে কেমন নির্জ্জন, কেমন সত্য, কেমন শান্ত। আবার চর্ম্মচক্ষে অবলোকন কর, যে, জ্ঞান-যোগে, প্রেমযোগে তাঁহাকে উপাসনা করিবার জন্য যে স্থান মনোনীত হইয়াছে, সেই এই শান্তিনিকেতন কেমন নির্জ্জন, কেমন মনোনুকূল। ইহা নির্জ্জন পবিত্র ভূমি, ইহাই ঋষি তপস্বী জনের রম্য তপস্যাভূমি! প্রভাত সূর্য্য যখন নূতন রশ্মিতে ইহার দিগ্‌দিগন্ত সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করে, যখন ইহার উদ্যানের পত্র সকল মর্ম্মরিত করিয়া মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় এবং নেত্রোদ্‌ঘাটন করিবামাত্র ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ ও নিম্নে বিশাল প্রান্তর দৃষ্টি পথে পতিত হয়, তখন সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পরম পুরুষের সহজ সুন্দর প্রেমের হিল্লোলে আত্মা স্নিগ্ধ হইয়া কৃতজ্ঞতারসে পূর্ণ হয়। অতএব ইহার সদৃশ ব্রহ্মসাধনের, ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জনের অনুকূল স্থান আর কোথায় পাইব ? যে সকল শান্ত পুরুষেরা—ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্ গৃহস্থেরা শ্রদ্ধার সহিত, তপস্যার সহিত নির্জ্জনে বসিয়া নিষ্কাম ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহারা পুণ্যপাপবর্জ্জিত হইয়া প্রকৃষ্ট রূপে সেই স্থানে গমন করেন যেখানে সেই অব্যয়াত্মা অমৃত পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন। উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, "উপনিষদ্ বিদ্যা-রূপ মহা ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ শর উপাসনার দ্বারা শানিত করিয়া তাহাতে যোজনা করিবেক। ব্রহ্মভাবনাগতচিত্ত দ্বারা এই ধনু আকর্ষণ করিয়া, হে শিষ্য, সেই অক্ষর পরম পুরুষকে বিদ্ধ কর।" বেদের শিরোভাগ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মও উপনিষদের সহিত সমস্বরে

বলিতেছেন, "প্রণব ধনুস্বরূপ, জীবাত্মা শরস্বরূপ এবং ব্রহ্ম লক্ষ্য-স্বরূপ ; প্রমাদশূন্য হইয়া সেই প্রণব ধনুর অবলম্বনেতে জীবাত্মারূপ শর দ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক।" এই জ্ঞান-প্রাণ-পূর্ণ জগতের মূলে, এই বিজ্ঞানময় জীবাত্মার অভ্যন্তরে জ্ঞান-স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ সেই পরমাত্মা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ", সকলের প্রভুব মহান্ পুরুষ। সেই মহান্ পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে জগতের নিয়ন্তৃত্ব ও শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব প্রকাশ পাইতেছে। যিনি ঈশ্বরকে পরম পুরুষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাঁহার নিকটে তিনি অপ্রকাশিত রহিয়াছেন। কিন্তু যিনি তাঁহাকে জ্ঞানময়, প্রেমময় এবং ইচ্ছাময় বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তিনি এই জগতের মূলে তাঁহাকে নিয়ন্তারূপে এবং আপনার আত্মাতে প্রত্যেক শুভ বুদ্ধির মূলে তাঁহাকে নিয়ন্তা রূপে দেদীপ্যমান দেখেন। তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞান কর্ত্তৃত্ব এবং মঙ্গলভাব সকলই আছে। সেই স্বতন্ত্রশক্তি, সেই পরম পুরুষ, সেই জীবিত ঈশ্বরই পরম কারণ— তিনি জগতের নিয়ন্তা এবং আত্মার পরমাত্মা, পরম উপাস্য দেবতা।

তাঁহার দুই কার্য্য মহান্ ; এক আমাদের সম্মুখে অগণ্যগ্রহোপগ্রহমণ্ডিত অসীম আকাশ, দ্বিতীয় আমাদের অন্তরে অনন্ত উন্নতিশীল এই চিরজীবী জীবাত্মা। আত্মা স্থূলও নহে অণুও নহে, হ্রস্বও নহে, দীর্ঘও নহে, কিন্তু সে কি সারবান্ বস্তু। এক বিন্দু আত্মা অসীম আকাশ দর্শন করিতেছে, এক বিন্দু আত্মার উপর যেন সমুদয় আকাশ অবলম্বিত রহিয়াছে। আত্মা না থাকিলে আর কিছুই থাকে না, আত্মার অভাবে শত শত সূর্য্য অন্ধকারময়। আত্মার উদয়েই সকল বস্তু জ্যোতিষ্মান্ হয়। বাহিরে আকাশ, অন্তরে আত্মা, দুইই সেই অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ অনন্ত পুরুষের আদর্শ। এই দুইয়েতেই তাঁহার আবির্ভাব। অসীম আকাশে তিনি বর্ত্তমান, আবার হিরণ্ময় আত্মাতেও তাঁহার সিংহাসন। অন্তরে বাহিরে তিনি প্রাণরূপে রহিয়াছেন। যখন নিভৃত নিলয়ে গমন করি, সেখানে সাক্ষী রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই, যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি, তখন দেখি তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ্যরূপে সকল ঘটনাকেই নিয়মিত করিতেছেন। তিনি বিষয়-রাজ্যের যেমন রাজা, তেমনি তিনি আত্মারও অধীশ্বর। তিনি ধর্ম্মরাজ্যে আত্ম সিংহাসনে থাকিয়া, পাপকে দমন করিয়া ও পুণ্যের পুরস্কার দিয়া আপনার দিকে সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার করুণা বিস্তৃত আকাশে, তাঁহার করুণা নিভৃত আত্মাতে—তিনি বৃষ্টি দিয়া পৃথিবীকে শীতল করিতেছেন, তিনি অমৃত সিঞ্চন করিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করিতেছেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতেছি এবং অমৃত হইয়া তাঁহার সহবাসে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতেছি। যেমন তাঁহার সঙ্গে আমাদের এই নিগূঢ়তম কল্যাণকর সম্বন্ধ—পিতা-পুত্র যোগ, তেমনি সেই সম্বন্ধের গুণে, তাঁহার নিত্য উপাসনায় এইস্থানের এত মাহাত্ম্য, তেমনিই এই মহোৎসবের অবসর। অতএব আইস, হে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ, এখন আমরা সংসারের আর সকলই ভুলিয়া যাই এবং সেই প্রাণদাতা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের হস্তে প্রাণ মন সকলই সমর্পণ করিয়া এই নির্ম্মল

প্রভাতে তাঁহার উপাসনা করি ও জীবনকে ধন্য করি।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্বাভিপ্রায় এইরূপ ব্যক্ত করিয়া ব্যাখ্যান পাঠ করিলেন।

"যিনি মহতো মহীয়ান আমরা ক্ষুদ্র হইয়া তাঁর কথা কি বলিব। জানি না তাঁর কথা কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায়ই বা শেষ করিব। এতক্ষণ যে তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া কৃতার্থ হইলাম তাহা ভারতের প্রাচীন ঋষিবাক্যে। যাঁহারা ধ্যানযোগে তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন সেই সকল প্রাচীন ঋষিগণের মহাবাক্যে। এখানে আমরা নিজের কথা কিছু বলিতে আসি নাই। এক্ষণে যে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিব তাহাও ঋষিবাক্যে। যিনি এই নির্জ্জন প্রশান্ত তপোবনে ভগবচ্চিন্তায় সিদ্ধকাম হইয়াছেন, যাঁর কৃপায় এই ভারত আবার ব্রহ্মনামে জাগিত হইয়াছে, যাঁর এই মহতী কীর্ত্তি, তাঁরই অগ্নিময় মহাবাক্যে। ঋষিবাক্য প্রাচীন হইলেও চিরনূতন। সকলে ভক্তিসহকারে অবহিত হইয়া শুন, এতকাল যাহা পাও নাই ইহাতে তাহাই পাইবে।"

পরে ব্যাখ্যান পাঠ হইলে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

পরমাত্মা আনন্দঘন। তিনি যে আনন্দ নিত্য উপভোগ করিতেছেন, যাহাতে অপরে সেই আনন্দের কণামাত্র ভোগ করিতে পারে, সেই জন্যই তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিলেন। প্রীতির ধর্ম্মই এই যে সে অপরকে সহভাগী করিতে যায়। আমরা যে আজ শান্তিনিকেতনের সুরম্য মন্দিরে বসিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেছি ইহার প্রতিষ্ঠার মূলে কোন্ লক্ষ্য কার্য্য করিয়াছে? যিনি সাধনার বলে ঈশ্বরকে আত্মস্থ করিয়াছেন, মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াই মুক্তির পূর্ব্বাভাস অবলোকন করিতেছেন, যিনি আত্মপ্রসাদের পূত সলিলে স্নাত হইয়া স্বর্গীয় সুধা পান করিতেছেন, তিনি ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও আমাদের জন্য আজ ব্যাকুল। তিনি চান আমরা সেই পরম দেবতাকে জীবনের কাণ্ডারী করি। জীবন ও ধন তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসাদদত্ত অনুপম শান্তি-সুখ লাভ করি। তাই তিনি আপনার জন্য নহে, দূরে থাকিয়া কেবল আমাদেরই জন্য, এই উদাস প্রান্তরের ভিতরে এই সাধন-মন্দির বহুল অর্থে নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ইহা হইতে ঈশ্বরপ্রেমীর হৃদয়ের আকুলতা, ব্রহ্মানন্দের অনুপম মাধুর্য্য—উহার অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্য পরিমাণ কর।

আমরা সংসারের জীব, পার্থিব মলিন সুখ—রূপ যৌবনের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, ধন-ঐশ্বর্য্যের উপর যাহার ভিত্তি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি সামর্থ্য উৎসাহ অবসাদের উপর যাহার স্থায়িত্ব, জীবন ও মরণ বিক্ষোভিত জগতে আমরা তাহারই পিপাসু, তাহারই জন্য লালায়িত। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় জন্য সুখ অপেক্ষা যে নির্ম্মলতর স্থায়িতর আনন্দের উৎস আছে, তাহা তিনিই জানেন, কাব্য সাহিত্য, জ্যোতিষ রসায়ন, ভূতত্ত্ব পদার্থতত্ত্ব যাহার চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে; বলিতে কি জ্ঞানের অনুশীলনে যিনি তৎপর,

সংসারের বিপ্লবে তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত অনাহত।

এই পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ, তাহার মধ্যে বৈষম্যই বা কত। মুষ্টিভিক্ষার জন্য কেহ বা নিত্য-লাঞ্ছিত, শীতের নিদারুণ প্রকোপে কেহ বা প্রকম্পিত, কঠোর বাক্যবাণে কেহ বা মর্ম্মপীড়িত, অপমান অত্যাচারে ভীত শঙ্কিত, কেহ বা গৃহহীন সহায়-হীন, এমন এক কপর্দক নাই যাহাতে নিজ সন্তানকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে চিকিৎসার গুণে রক্ষা করিতে পারে, কেবলই হা হুতাশ ক্রন্দন বিলাপের অভিনয়—সংসারের এই ত এক দিক। অপর দিকে ভোজ্যপেয়ের প্রাচুর্য্য, বসন ভূষণের বৈচিত্র, ধনগর্ব্বের স্ফীতিভাব, ভোগসামগ্রীর পর্য্যাপ্তি ও হাস্যোল্লাসের কলরব ; কি ভয়ানক বৈষম্য। যিনি এই অপ্রতিবিধেয় অসামঞ্জস্য কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য, হৃদয়ের কোমল বৃত্তির পরিচালনায় মুক্ত-হস্তে অন্ন-বস্ত্র অকাতরে দান করেন—আর্ত্তের মর্ম্মপীড়া দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, তিনিই ধন্য।

যখন সংসার ক্ষেত্রেই আমাদিগকে বিচরণ করিতে হইবে, তখন আপাতপ্রতীয়মান বৈষম্যে বিপদের কষাঘাতে আমরা একেবারে অবসন্ন হইয়া না পড়ি, তাহার জন্য আমাদের পূর্ব্বসাবধানতা চাই, জ্ঞানের আলোচনা চাই, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষলাভের জন্য চেষ্টা চাই। যখন আমরা বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে নির্ম্মলতর জ্ঞানানন্দ লাভ করিতে সক্ষম হইব, জগতের কৌশল আলোচনা এবং তাহার মর্ম্মভেদ করিতে সক্ষম হইব, বিবিধ গ্রন্থে মনীষিগণের গবেষণার পরিচয় পাইতে থাকিব, তখন সে আনন্দের অবস্থা হইতে সংসারের প্রতিকূল তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। আমরা উচ্চতর জ্ঞানের আনন্দে সংসারের নিম্নতর রাজ্যের বিপদপাতের হস্ত হইতে অনাহত থাকিব, আমাদের মনের শান্তিকে কেহ অপহরণ করিতে পারিবে না।

এই জ্ঞানের আলোচনায় সাংসারিক বিপদপাতের তীক্ষ্ণাগ্রকে বিকুণ্ঠিত করিবার সামর্থ্য জন্মিলেও, এই কালসাধ্য শিক্ষালাভের সুযোগ ও সুবিধা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। তাই বলিয়া কি তাহাদের কোন আশা নাই। কালের ক্রীড়নক হইয়া সে চিরকাল কি সংসারসমুদ্রে ভাসিতে থাকিবে? ঈশ্বরের রাজ্যে কি তাহার কোন প্রতিবিধান নাই? যিনি মঙ্গলস্বরূপ যিনি নিখিল জগতের কল্যাণ কামনা করেন, তিনি তাহার উপায় করিয়া দিয়াছেন। যদি জ্ঞান-রাজ্যের উৎস উৎসারিত করিয়া দিয়া সে আনন্দ-স্রোতে সাংসারিক বিপর্য্যয়কে পরাস্ত করিবার সুবিধা না ঘটে আধ্যাত্মিক আনন্দের—বিমলতম শান্তিবারির আগমন পথ অনাবৃত করিয়া দাও। সেখান হইতে যে মধুধারা ক্ষরিত হইবে তাহা হইতে সাংসারিক জ্বালাযন্ত্রণার নরকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে, জগতের বৈষম্য-জনিত কষ্টক্লেশ তিরোহিত হইয়া যাইবে, অপার অসীম আনন্দে জগৎ-সংসার পরিপূরিত হইবে।

তুমি আজীবন বিদ্যাশিক্ষা করিতেছ, জ্ঞানের উপদেশ দিতেছ, শুষ্ক জ্ঞানে তোমার জীবন নীরস হইতে পারে, কোন গভীর তত্ত্বের মীমাংসা না পাইয়া তোমার চিত্ত অস্থির

হইতে পারে, কাহাকেও তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবৃদ্ধ দেখিয়া তোমার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইতে পারে, তোমার অন্তরে যে জ্ঞান-বৃক্ষ রোপণ করিয়াছ, উহার মধ্যে নাস্তিকতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ লোভ অভিমান অহঙ্কারের বিষবৃক্ষ আপনা হইতে জন্মিয়া তোমার জীবনকে অশান্তিময় করিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি অপরের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজ সাধনা-বলে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হও, আত্মাফলকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে সক্ষম হও, তবে তাহা হইতে যে স্বর্গীয় শান্তিসুখ প্রাপ্ত হইবে, তাহার নিকটে কোথায় তোমার জ্ঞানের আনন্দ! কাব্য জ্যোতিষ আলোচনার তৃপ্তি! ইন্দ্রিয়-সুখ-জনিত আনন্দ ত দূরের কথা।

সেই জন্যই বলিতেছি সংসারের বৈষম্য দেখিয়া ভীত হইও না, এখানকার হাহাকারে ম্রিয়মাণ হইও না। তোমার অন্তরে এমন এক পদার্থ রহিয়াছে, যাহাকে সতেজ ও সবল করিতে পারিলে সংসারের তাবৎ অন্ধকার বিদূরিত হইবে, অন্তর্দ্দেশ পুলকে পরিপূরিত হইবে, নয়নাশ্রু বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে সর্ব্বাপেক্ষা বিমলতম সুখ বিমলতম আনন্দ বিমলতম শান্তি অন্তরে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই আধ্যাত্মিক জগতের গুরু একমাত্র ঈশ্বর, তিনিই একমাত্র নেতা, তিনিই আমাদের শিক্ষা দীক্ষার পুরস্কার। প্রাতে সায়াহ্নে তাঁহাতে চিত্তের সমাধান কর। ধনী দরিদ্র সকলেরই তাঁহাতে সমান অধিকার। পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই তিনি অভিগম্য। "প্রখরবুদ্ধি না পেয়ে সন্ধান আসে ফিরে তিনি হে অকিঞ্চনগুরু। ব্যাকুল অন্তরে চাহরে তাঁহারে ধন-মান সকলই তাঁহাতে সঁপিয়ে।"

যিনি সাধারণের আধ্যাত্মিক কল্যাণ-কামনায় নিভৃতে এই সাধনমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, তিনি চান আমরা সাধনাবলে ঈশ্বরকে লাভ করিয়া জগতের বৈষম্য বিদূরিত করি, দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, আরণ্যক ঋষিদিগের ধর্ম্ম এদেশে প্রচার করি, জ্ঞানের সঙ্গে নীতির এবং এই উভয়ের সহিত ধর্ম্মের যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হই, ব্রাহ্মধর্ম্মর প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতির অনুরূপ এইরূপ বিজন প্রান্তরে আসিয়া তাঁহাতে আত্মার সমাধান করি।

পরমাত্মন্! এখানে আমরা নিজের কথা বলিবার জন্য আসি নাই, তুমি নিঃশব্দ বাণীতে নিরন্তর যে শিক্ষা ও উপদেশ এখানে ঢালিতেছে, তাহাই শ্রবণ করিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছি। তোমার যে দৈববাণী শ্রবণে ঋষিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছিল আমরা তাহাই শ্রবণের জন্য ব্যাকুল। তোমার যে বিরাটমূর্ত্তি সন্দর্শনে তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আমরা তাহাই দেখিবার জন্য লালায়িত। আবিরাবির্ম্মএধি তুমি আমাদের নিকট আবির্ভূত হও। বৈরাগ্যের কবচে আবৃত হইয়া তোমাকে চাহিতেছি তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। দীনভাবে তোমার নিকট ক্রন্দন করিতেছি তুমি আমাদের অশ্রুজল মার্জ্জনা কর ; অনন্যগতি হইয়া তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি তুমি আমাদিগকে তোমার উদার ক্রোড়ে স্থান দাও ;

মুমুক্ষু হইয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছি তুমি আমাদের কামনা পূর্ণ কর। তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইলে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনাথ দীন দরিদ্রদিগের জন্য সমস্তক ভোজ্য উৎসর্গ করিলেন।

ব্রহ্মমন্দিরের তোরণোপরি স্বর্ণাক্ষরে বেদোদিত মুক্তির উপদেশ খোদিত। অনেকে উর্ধ্বমুখে নির্নিমেষে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল দলবলসহ নিম্নোক্ত সঙ্কীর্তন করিতে করিতে উদ্যান প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিলেন।

সঙ্কীর্ত্তন।

(তেওট) গাও আনন্দে সবে জয় ব্রহ্মনাম।
যে নামের গুণে হবে পূর্ণকাম।
সরল ব্যাকুল অন্তরে, পিতা পরমেশ্বরে,
ডাক অবিরাম ; সশরীরে প্রবেশিবে স্বর্গধাম।

(খয়রা) বসি যোগাসনে, স্তিমিত লোচনে, কর ব্রহ্ম দরশন (শান্তিনিকেতনে) সেই চিদানন্দঘন, প্রাণরমণ, যোগীহৃদয়রঞ্জন। (অপরূপরূপ) অনন্ত সুন্দর, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ; যাঁহার পরশে, প্রেমানন্দরসে, উথলে হৃদয় মাতি। (যোগানন্দরসে)

(দুঠুকি) জড় জীব নরে, দেবতা অমরে, করে যাঁর যশোগানচ সেই প্রাণসখা আছেন অন্তরে—হইয়ে প্রাণের প্রাণ। বিলাস লালসা, বাসনা পিপাসা, মিছে আশা পরিহরি ; হও শুদ্ধচিত, শান্ত সমাহিত, শান্তিরস পান করি।

(খয়রা) এস ভাই, চল যাই, সবে মিলে
শান্তিনিকেতনে।
অন্তরে বাহিরে, হেরি প্রাণভরে,
প্রাণারাম নিরঞ্জনে।
ভুলে ভেদাভেদ জ্ঞান, বৃথা অভিমান রে ;
প্রেম আলিঙ্গনে বাঁধ জগদ্বাসী জনে।
জ্বলে ব্রহ্মজ্যোতি প্রতি জীবনে জীবনে ;
দিব্যজ্ঞানালোকে দেখ, দেখ প্রেমনয়নে।
মত্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দে, নাম সঙ্কীর্ত্তনে ;
বিতর প্রেম পুণ্য শান্তি নিখিল ভুবনে।

———

এবারে উদ্যানভূমিতে ইষ্টকনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত একটি গৃহ দেখিতে পাইলাম। তাহা ব্রহ্মবিদ্যালয়। তাহার সোপানে পূর্ণকুম্ভ। নানাবিধ পত্র পুষ্পে তাহার শ্রী সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ দিন ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের জন্য গৃহপ্রতিষ্ঠা হইবে। ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এইরূপ করিলেন—

"প্রভাতে ঈশ্বরোপাসনা সমাপন করিয়া এক্ষণে আমরা এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি। এদেশে ব্যায়াম শিক্ষার স্থান আছে, জ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়াদি আছে, কিন্তু যেখানে অধ্যাত্মবিদ্যা অধীত হইতে পারে, এরূপ কোন স্থান নাই। নিরবচ্ছিন্ন শরীর লইয়া মনুষ্য নহে মনের উন্নতি সাধনও মনুষ্যের পক্ষে তাবৎ নহে, আত্মার উন্নতি চাই। এই এক আত্মার উন্নতি সাধনেই মনুষ্যের দেবত্ব স্থাপিত হইতে পারে। শরীর মন ও আত্মা লইয়াই মনুষ্য। আমরা দেখিতে পাই বিদ্যা দুই প্রকার, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। এই অপরা-বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে পরা-বিদ্যার আলোচনা চাই, তাহা হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। বিষয়-সুখে মনুষ্যের তৃপ্তি নাই, কেবলমাত্র জ্ঞানের আলোচনায়ও শান্তি লাভ হইতে পারে না, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে ঈশ্বরলাভেই প্রকৃত শান্তি লাভ হইতে পারে। "স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা"

কিন্তু সেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্জ্জনের জন্য সর্ব্বপ্রথমে সৎগুরুর নিকটে যাওয়া চাই। ব্রাহ্মধর্ম্মেও আছে "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ পাইবার জন্য গুরুর নিকট গমন করিবেন; গুরুও সেই অনুরাগী শিষ্যকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবেন। সেই জন্যই এই অনুকূল স্থানে এই ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, এবং যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদত্ত হয়, তজ্জন্য সুনিয়ম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইতেছে।

এদেশের শাস্ত্র নিচয়ে আধ্যাত্মিক সত্য প্রচুর পরিমাণে নিহিত। প্রাচীন ঋষিগণ আমাদের জন্য অক্ষয় অমূল্য সম্পত্তি বেদ উপনিষদের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ সমুদায়ের জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। দেশীয় সত্য সম্বন্ধে অগ্রে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে পরে বিদেশের সত্য আলোচনা করা যাইতে পারে। এই পৃথিবীতে নানা ধর্ম্ম প্রচলিত। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ মধ্যবর্ত্তিতা স্বীকার করেন, মুসলমানেরা মহম্মদকে প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং বাইবেল ও কোরাণকে এই দুই সম্প্রদায় আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্য দেশ কাল বা মনুষ্য বিশেষে আবদ্ধ নহে। বৌদ্ধগণ নীতির উপরেই আস্থাবান কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহারা সন্দিহান। কিন্তু আমরা বলি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে না নীতি দাঁড়াইতে পারে, না আমাদের অন্তরে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বৃত্তি আছে তাহা চরিতার্থ হইতে পারে। সেই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্ব এত অধিক। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা এবং প্রচারের জন্য এই ব্রহ্মবিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র; তাঁহার নিকটে সকলেরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

এই ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য এবং আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলা হইল; এক্ষণে ইহার দ্বার সাধারণের সমক্ষে উৎঘাটন করিবার ভার আমার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমি এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রমুক্ত করিয়া দিলাম। ইহার উপরে তাঁহার প্রসাদবারি অবতীর্ণ হউক, এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সংসিদ্ধ হউক। ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা তিনি আমাদের এই সাধুসঙ্কল্প সুসিদ্ধ করুন।

আবার কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে সপ্তপর্ণ মূলে উপস্থিত হইলাম।

তথায় প্রস্তরনির্ম্মিত একটি সাধন বেদি আছে। বেদির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্র তদুপরি যেন এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলাম এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কহিলাম ;

কোঽয়ং পদ্মপরাগপিঞ্জরবপুর্লাবণ্যবারাংনিধি-
মেধ্যৈর্মূলফলৈরযত্নসুলভৈঃ সংপ্রাপ্য প্রাণস্থিতিং।
প্রেম্না কস্য পিনদ্ধচীরবসনোকাং সিদ্ধমুদ্দিশ্য বা
নিঃসঙ্গো নিভৃতে বিরাগপরমো যোগাসনং সেবতে।

পদ্মপরাগকান্তি লাবণ্যের সমুদ্র এই মহাপুরুষ কে? ইনি অযত্ন-সুলভ পবিত্র ফলমূলে দেহধারণ পূর্ব্বক কাহার প্রেমে চীরবাসা হইয়া এবং কোন্ সিদ্ধিয় উদ্দেশে এই নিভৃত প্রদেশে নিঃসঙ্গ ও বিরাগী হইয়া যোগাসনে বসিয়া আছেন।

ঐ ধ্যানস্তিমিতলোচন মহাপুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত ভক্তির উদ্রেক হইল এবং মনে মনে তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সমস্বরে সকলে 'কর তাঁর নাম গান' এই গানটি গাহিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বাহ্ণের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। যাঁহার যথায় ইচ্ছা তিনি তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমিও একাকী উদ্যানের ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম এক একটি স্তম্ভোপরি কোথাও বেদমন্ত্রের একাংশ, কোথাও ব্রহ্মসঙ্গীতের অল্পাংশ। স্থানে স্থানে ছায়াবহুল বক্ষমূলে বাধনবেদি এবং তন্নিকটে স্তম্ভোপরি খোদিত বৈরাগ্য সঙ্গীত। এই সযত্ন মন্ত্র ও বৈরাগ্য সঙ্গীতের এমনই প্রভাব যে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলে সহজেই সমস্ত ভোগ ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ বোধ হয় এবং মন ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমি এক সুচ্ছায় বেদিতে বসিলাম এবং সম্মুখস্থ স্তম্ভে একটি বেদ মন্ত্র পাঠ করিয়া কহিলাম

ব্রাহ্মীং নেচ্ছামি ভূতিং ন খলু দিনপতের্নাপি চান্দ্রীং নচৈন্দ্রীং,
কর্ম্মারব্ধোহি ভোগঃ ফলতি সুকৃতিনাংভ্রশ্যতে চাপি কালে।
দাসস্ত্বৎপাদপঙ্কেরুহনিহিতমতির্যাচতে সর্ব্বকালং
ধ্যাতুং তে প্রেমমূর্ত্তিং কথিতুমবিতথাং কীর্ত্তিগাথাঞ্চ দেব।

হে দেব! আমি ইন্দ্র চন্দ্রাদির ঐশ্বর্য্য চাহি না, কারণ সুকৃতিমানদিগের ঐশ্বর্য্যভোগ কর্ম্মাধীন এবং কালে তাহা নাশ হইয়া যায়। আমি এক্ষণে তোমার পাদপদ্মে মতি রাখিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যেন সর্ব্বকাল তোমার প্রেমমূর্ত্তি ধ্যান ও তোমারই কীর্ত্তি গান করিয়া বেড়াই।

ক্রমশঃ স্নানাদির সময় হইয়া আসিল। আমি কূপোদকে সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিয়া লইলাম এবং সোপান পরম্পরা দিয়া সাধন-শৈলে গিয়া উঠিলাম। আহা কি মনোরম স্থান। তথায় সতত সুনির্ম্মল বায়ু বহিতেছে এবং বৃক্ষে পক্ষিদিগের অব্যক্ত মধুর কোলাহল শুনা যাইতেছে। তথায় গিয়া এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের মূল আশ্রয় করিলাম। আমার মস্তকোপরি সুনির্ম্মল আকাশ, দূর হইতে সুদূরে প্রসারিত এবং নিম্নে বিস্তীর্ণ মাঠ। উহা উচ্চ নীচ বলিয়া তরঙ্গায়িত সমুদ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আমি তখন অনেকটা উচ্চ ভূমিতে আরূঢ়, তন্নিবন্ধন সহজেই মনে এই ভাবোদয় হইল।

কুতশ্চিৎ সংস্থানাৎ ঘনতিমিরগাঢ়ব্যতিকরৈঃ
সুদুপ্রেক্ষ্যাৎ ক্ষিপ্তোন্যপতমহমস্মিন্ জলনিধৌ।
তৃষার্ত্তঃ সংক্ষোভাদমৃতসিতি মত্বাহহ্নিভধিয়া
অপামন্তর্লীনং গরলমুপভুঞ্জেহঞ্জলিপুটৈঃ।

হা! আমি ঘনান্ধকার সম্পর্কে নিতান্ত অলক্ষিত কোনও স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া এই সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছি, এবং পতন-ক্ষোভ বশত অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অন্ধ বুদ্ধিতে অমৃত বুঝিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি কেবল জলের অন্তর্লীন গরলই পান করিতেছি। এই ভাবিয়া কিছু আকুল হইয়া উঠিলাম এবং শান্তিলাভের জন্য ব্রহ্মে মন সমাহিত করিলাম।

ইত্যবসরে অতিথিবৎসল দ্বিপেন্দ্র বাবুর হাঁক ডাক পড়িয়া গিয়াছে। আহার প্রস্তুত। তাঁহার সর্ব্বতঃপ্রসারিণী দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া কাহারও কোথাও থাকিবার যো নাই। লোক আসিয়া কহিল বাবু ডাকিতেছেন। কি করি দ্বিপেন্দ্র বাবুর আহ্বান। গাত্রোত্থান করিলাম এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরকে কহিলাম

চিত্তং হৃতং নু ভবতা ভুবি ভোগমূলং
তেনাত্যজং বিষয়জন্মসুখং হি ভূমন্।
পাদৌ পদং ন চলতস্তরুপাদমূলাৎ
কিং ভো ব্রবীমি বিবশোস্মি তবানুবৃত্ত্যা।

হে ভূমন্, পৃথিবীতে ভোগের মূল মনকে তুমিই হরণ করিয়াছ সেই কারণে আমি সমস্ত বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছি। এক্ষণে এই বৃক্ষের পাদমূল হইতে আমার পদদ্বয় এক পদও চলিতেছে না, বলিব কি, আমি তোমারই অনুবৃত্তিতে একান্ত বিবশ হইয়া পড়িয়াছি।

পরে আহারান্তে কিছুক্ষণের জন্য সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

এ দিকে যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। অভিনয়ের বিষয় কবিগুরু বাল্মীকি। তিনি প্রথমাবস্থায় দস্যু ছিলেন। তাঁহার নাম রত্নাকর। রত্নাকর স্ত্রীপুত্রগণের ভরণপোষণের জন্য অরণ্যে দস্যুবৃত্তি করিত। একদা একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুত্র লইয়া দিবা দুই প্রহরে বন দিয়া যাইতেছিলেন। রত্নাকর তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া লগুড় হস্তে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে কহিলেন দেখ ব্রহ্মহত্যা করিয়া পাপভাগী হইও না। রত্নাকর কহিল কিসের পাপ, আমি এইরূপ হত্যা করিয়া স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করিয়া থাকি। যাহাদের জন্য এইরূপ করিয়া থাকি, বলিতে কি, তাহাদেরই এই পাপ। ব্রাহ্মণ কহিলেন ভাল, আমরা এই স্থানে থাকিয়া তোমার প্রত্যাগমনকাল অপেক্ষা করিতেছি, তুমি জানিয়া আইস, তোমার স্ত্রীপুত্র তোমার এই পাপের ভাগী হইবে কি না। তখন রত্নাকর গৃহে গিয়া সকলকে কহিল আমি মনুষ্যহত্যা করিয়া তোমাদেরই প্রতিপালন করিতেছি সুতরাং তন্নিবন্ধন যা কিছু পাপ তাহা তোমাদেরই হইবে। তখন তাহারা কহিল দেখ তুমি আমাদের আশ্রয় আর আমরা তোমার আশ্রিত, তুমি যে কোন উপায়ে আমাদের ভরণ-পোষণ কর তন্নিবন্ধন পাপপুণ্য তোমারই হইবে, আমরা কেন তাহার অংশী হইব। রত্নাকর এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইল এবং অবিলম্বে অরণ্যমধ্যে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, ঠাকুর, আমার স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি কেহই আমার এই পাপের অংশী হইতে চাহে না। এক্ষণে আমার মোহ অপনীত এবং মনে অত্যন্ত নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর আর আমি হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইব না, আপনি নির্বিঘ্নে চলিয়া যান। এই দস্যু রত্নাকরই ভবিষ্যতে মহাকবি বাল্মীকি। যাত্রায় তাহারই অভিনয় হইয়াছিল। আমরা অনেকক্ষণ তাহা দেখিতেছিলাম, ইত্যবসরে, মনাংসি বংশিধ্বনিনা জহার, কোথা হইতে বংশীরব আসিয়া সকলের মন হরণ করিল। গিয়া দেখি অদ্ভুত ব্যাপার। একটা সচ্ছিদ্র বাঁশের বাঁশরী হইতে অতি মধুর রাগরাগিণী বাহির হইতেছে এবং এক জন সাত আট খানা খঞ্জনী লইয়া কখন ভূমিতে কখন মস্তকে কখন বক্ষে ও কখন বা উরুদেশে তাহা ঠুকিয়া ঠুকিয়া অতি সুলয়ে সঙ্গত করিতেছে। অবাক হইয়া অনেকক্ষণ তাহা শুনিতে লাগিলাম।

ঐ সময় উদ্যানের বহিঃপ্রদেশ লোকে লোকারণ্য। নানাবিধ দোকান পসার বসিয়াছে। কোথাও নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র বালকেরা খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতেছে। কোথাও নানারূপ সুশোভন কৃত্রিম ফলপুষ্প বিক্রয় করিবার জন্য আনীত হইয়াছে। এইটি বস্তুতই আনন্দবাজার। লোকজন কতদিকে কতরূপ ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে। কেহ হাসিতেছে কেহ নাচিতেছে, কোথাও অনেকে দলবদ্ধ হইয়া গাহিতেছে, সকলেই যেন আনন্দে উন্মত্ত। ইতর ভদ্র সকলেই এক স্থানে মিলিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। বড়ই অদ্ভুত দৃশ্য।

উদ্যানের ভিতর স্বামীজী একস্থলে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার চতুর্দিকে লোক। তিনি

সাধারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে আরও ক'একজন উত্থান করিলেন এবং উচ্চস্বরে বক্তৃতা করিয়া সকলকে মোহিত করিতে লাগিলেন। সেদিনকার প্রচারকদিগের উৎসাহ অতুলনীয়। তখন চতুর্দ্দিকে খুব জনতা। উৎসব দর্শনের জন্য চারিদিক হইতে লোকসমাগম হইতেছে। কি উৎসাহ! কি ঘোর কলরব!

ক্রমে রক্তচ্ছবি সূর্য্য অস্তমিত হইল। গাঢ় অন্ধকার অল্পে অল্পে চতুর্দ্দিক আবৃত করিয়া ফেলিল। অন্ধকারে নক্ষত্র সকল আকাশে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন আমি ঊর্দ্ধে নক্ষত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সহচরকে কহিলাম

যোজন্মস্থিতিভঙ্গকারণমজো যোনিস্বভাবানভি
ব্যাপ্য প্রোজ্‌ঝিতসর্ব্বসঙ্গসুখিতো বিশ্বং প্রশাস্তি স্বরাট্।
তস্যেয়ং লিখিতা বিভাতি পুরতঃ সৎকীর্ত্তিবর্ণাবলী
তারাস্তোমমিষেণ সংশয়জুষামুন্মেষণার্থং হি খে।

যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ও জন্মরহিত যিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে ব্যাপ্ত ও সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া আপনাতে আপনি অবস্থান পূর্ব্বক বিশ্বরাজ্য শাসন করিতেছেন, ঐ দেখ, সংশয়ীদিগের জ্ঞানলাভের জন্য তারা-সমূহ-চ্ছলে যেন তাঁহারই সৎকীর্ত্তি বর্ণাবলী লিখিত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সুপ্রশস্ত কাচময় গৃহে নানাবর্ণের আধারে আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মঠাধ্যক্ষ স্বামীজী সাধকের মন পুলকিত করিয়া ঘন ঘন ঘণ্টারবের সহিত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। আমরাও ব্রহ্মোপাসনার জন্য লোকের ভিড় ভেদ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া বেদি গ্রহণ করিলেন। সর্ব্ব প্রথমে সঙ্গীত হইল। পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

"অনুকূল স্থানে অনুকূল ভাবের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করিবার জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি ; হৃদয়ের বদ্ধভাব বিদূরিত করিবার জন্য আজ আমরা সমাগত। মুক্তগগনের নিম্নে উদাস প্রান্তরের ক্রোড়ে সমাসীন হইয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া দিলে, অনন্তের ছায়া এখনও কি আত্মাতে প্রতিভাত হয় নাই। তরুণঅরুণের রক্তালোকে পূর্ব্বগগন উৎভাসিত দেখিয়াছ, মহান ও শান্তভাব কি হৃদয়ে মুদ্রিত হয় নাই। অদ্যকার সঞ্চরমান বায়ুহিল্লোলে তাঁহারই পবিত্র নিশ্বাস সমীরিত—ইহাতেও কি ব্রহ্মসংস্পর্শ অনুভব করিতে পার নাই। ব্রহ্মের মঙ্গলগীতে আজ চারিদিক মুখরিত—ইহাতেও কি আত্মার মোহনিদ্রা বিদূরিত হয় নাই। এখন আবার সূর্য্যের অস্তমিত মহিমার মধ্যে অবস্থান করিতেছ, ইহাতেও কি হৃদয়দেশ স্তব্ধ পুলকে পরিপূরিত হয় নাই। এই অসীম শূন্যের ভিতরে আসিয়াছ, বৈরাগ্যবহ্নি কি অন্তরে সন্ধুক্ষিত হয় নাই। স্তম্ভে স্তম্ভে মৃতসঞ্জীবনমন্ত্র

সঙ্গীতকণা খোদিত দেখিতেছ, ইহাতেও কি আত্মার বলাধান হয় নাই। ঐ দেখ 'শান্ত উপাসীত' শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা কর এই মহামন্ত্র ব্রহ্মধ্যানে প্রস্তুত হইবার জন্য ডাকিতেছে। "ব্রহ্মাভয়ং ঈশ্বরের অভয় মঙ্গলমূর্ত্তি বরাভয় দান করিবার জন্য উদ্বোধিত করিতেছে। আর নিশ্চিন্ত থাকিও না, উত্থান কর, জাগ্রত হও, দিবারাত্রের পবিত্র সন্ধিক্ষণ এই অমৃত বেলা চলিয়া যায়। চির-অনুরাগের সামগ্রী সেই অতি-প্রাচীন আর্য্য কুলদেবতা, যাঁহার আশীর্ব্বাদ বংশপরম্পরাক্রমে আমাদের মস্তকের উপরে বর্ষিত হইতেছে, আজ তিনি এখানে বর্ত্তমান। কৃতজ্ঞতার গুরুভারে তাঁহার চরণে অবনত হও, প্রীতি ভক্তির বিমল উচ্ছ্বাস তাঁহার চরণে ঢালিয়া দাও। বৈদিক সিদ্ধমন্ত্রে পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ কর। তিনি কৃপা করিয়া আমাদের প্রীতিপূজা গ্রহণ করুন।"

পরে সাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ দিলেন।

"ওঁ নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ, পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, এবং অদ্যকার সভায় সমাগত আর্য্যমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করি—ব্রহ্মবাদী ঋষিরা যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে কি একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে? অদ্য আমরা কি তাঁহাদের সহিত সমুদয় যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি? বৃক্ষ হইতে যে জীর্ণ পল্লবটি ঝরিয়া পড়ে সেও বৃক্ষের মজ্জার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া যায়—সূর্য্যকিরণ হইতে যে তেজটুকু সে সংগ্রহ করে তাহা বৃক্ষের মধ্যে এমন করিয়া নিহিত করিয়া যায় যে মৃত কাষ্ঠও তাহা ধারণ করিয়া রাখে, আর আমাদের ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ ব্রহ্ম-সূর্য্যালোক হইতে যে পরম তেজ, যে মহান্ সত্য আহরণ করিয়াছিলেন তাহা কি এই নানা শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন বনস্পতির—এই ভারতব্যাপী পুরাতন আর্য্যজাতির মজ্জার মধ্যে সঞ্চিত করিয়া যান নাই? তবে কেন আমরা গৃহে গৃহে আচারে অনুষ্ঠানে কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের মহাবাক্যকে প্রতি মুহূর্ত্তে পরিহাস করিতেছি? তবে কেন আমরা বলিতেছি, নিরাকার ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের গম্য নহেন, আমাদের ভক্তির আয়ত্ত নহেন, আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য নহেন? ঋষিরা কি এ সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কি প্রত্যক্ষ এবং তাঁহাদের উপদেশ কি সুস্পষ্ট নহে? তাঁহারা বলিতেছেন

ইহ চেৎ অবেদীদথ সত্যমস্তি,
নচেৎ ইহাবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ ;

এখানে যদি তাঁহাকে জানা যায় তবেই জন্ম সত্য হয়, যদি না জানা যায় তবে মহতী বিনষ্টিঃ, মহা বিনাশ। অতএব ব্রহ্মকে না জানিলেই নয়। কিন্তু কে জানিয়াছে? কাহার কথায় আমরা আশ্বাস পাইব? ঋষি বলিতেছেন—

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তৎ বয়ং—
নচেৎ অবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ—

এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে আমরা জানিয়াছি, যদি না জানিতাম তবে আমাদের মহতী বিনষ্টি হইত। আমরা কি সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিব?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ সবিনয়ে বলেন—আমরা অবিশ্বাস করি না—কিন্তু ঋষিদের সহিত আমাদের অনেক প্রভেদ ; তাঁহারা যেখানে আনন্দে বিচরণ করিতেন আমরা সেখানে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি না। সেই প্রাচীন মহারণ্যবাসী বৃদ্ধ পিপ্পলাদ ঋষি এবং

"সুকেশাচ ভরদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্য্যায়নী চ গার্গ্যঃ, কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো, ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ—সেই ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যপুত্র গার্গ্য, অশ্বলপুত্র কৌশল্য, ভৃগুপুত্র বৈদর্ভি কাত্যায়নপুত্র কবন্ধী, সেই ব্রহ্মপর ব্রহ্মনিষ্ঠ পরংব্রহ্মান্বেষমাণ ঋষিপুত্রগণ, যাঁহারা সমিৎ হস্তে বনস্পতিচ্ছায়াতলে গুরুসম্মুখে সমাসীন হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতেন তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা হয় না।

না হইতে পারে, ঋষিদের সহিত আমাদের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য এক, ধর্ম্ম এক, ব্রহ্ম এক ;—যাহাতে ঋষিজীবনের সার্থকতা, আমাদের জীবনের সার্থকতাও তাহাতেই ; যাহাতে তাঁহাদের মহতী বিনষ্টি তাহাতে আমাদের পরিত্রাণ নাই। শক্তি এবং নিষ্ঠার তারতম্য অনুসারে সত্যে ধর্ম্মে এবং ব্রহ্মে আমাদের ন্যূনাধিক অধিকার হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া অসত্য অধর্ম্ম অব্রহ্ম আমাদের অবলম্বনীয় হইতে পারে না। ঋষিদের সহিত আমাদের ক্ষমতার প্রভেদ আছে বলিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত পথের বিপরীত পথে গিয়া আমরা সমান ফল প্রত্যাশা করিতে পারি না। যদি তাঁহাদের এই কথা বিশ্বাস কর যে, ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি, এখানে তাঁহাকে জানিলেই জীবন সার্থক হয়—নচেৎ মহতী বিনষ্টিঃ তবে বিনয়ের সহিত শ্রদ্ধার সহিত মহাজনপ্রদর্শিত সেই সত্যপথই অবলম্বন করিতে হইবে। সত্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেরই পক্ষে একমাত্র এবং ঋষির মুক্তিবিধানের জন্য যিনি ছিলেন, আমাদের মুক্তিবিধানের জন্যও সেই একমেব অদ্বিতীয়ং তিনি আছেন। যাঁহার পিপাসা অধিক তাঁহার জন্যও নির্ম্মল নির্ঝরিণী অভ্রভেদী অগম্য গিরিশিখর হইতে অহোরাত্র নিঃস্যন্দিত, আর যাঁহার অল্পপিপাসা এক অঞ্জলি জলেই পরিতৃপ্ত তাঁহার জন্যও সেই অক্ষয় জলধারা অবিশ্রাম বহমানা,—হে পান্থ, হে গৃহী, যাহার যতটুকু ঘট, লইয়া আইস, যাহার যতটুকু পিপাসা, পান করিয়া যাও! আমাদের দৃষ্টিশক্তির প্রসর সঙ্কীর্ণ তথাপি সমুদয় সৌর জগতের একমাত্র উদ্দীপনকারী সূর্য্যই কি আমাদিগকে আলোক বিতরণের জন্য নাই? অবরুদ্ধ অন্ধকূপই আমাদের মত ক্ষুদ্রকায়ার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে তবু কি অনন্ত আকাশ হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি? পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র একাংশ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলেই আমাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, তবু কেন মনুষ্য চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারার অপরিমেয় রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অশ্রান্ত কৌতূহলে নিরন্তর

লোকলোকান্তরে আপন গবেষণা প্রেরণ করিতেছে? আমরা যতই ক্ষুদ্র হই না কেন তথাপি ভূমৈব সুখং ভূমাই আমাদের সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে আমাদের সুখ নাই। হঠাৎ মনে হইতে পারে ব্রহ্ম হইতে অনেক অল্পে, পরিমিত আকারবদ্ধ আয়ত্তগম্য পদার্থে আমাদের মত স্বল্পশক্তি জীবের সুখে চলিয়া যাইতে পারে—কিন্তু তাহা চলে না। ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং—যিনি উত্তরতর অর্থাৎ সকলের অতীত, যাঁহাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, যিনি অশরীর, রোগশোকরহিত—য এতদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি ইঁহাকেই যাঁহারা জানেন তাঁহারাই অমর হন—অথ ইতরে দুঃখমেব অপিয়ন্তি, আর সকলে কেবল দুঃখই লাভ করেন।

দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি বলিবেন, উপদেশ সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহা পালন কঠিন। অরূপ ব্রহ্মের মধ্যে দুঃখ শোকের নির্ব্বাপন সহজ নহে। কিন্তু যদি সহজ না হয় তবে দুঃখ নির্ব্বাপনের, মুক্তিলাভের অন্য যে কোন উপায় আরও কঠিন—কঠিন কেন, অসাধ্য। স্বতঃ-প্রবাহিত অগাধ স্রোতস্বিনীর মধ্যে অবগাহন স্নান যদি কঠিন হয় তবে স্বহস্তে ক্ষুদ্রতম কূপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে অবতরণ আরও কত কঠিন—তাই বা কেন, নিজের ক্ষুদ্র কলস-পরিমিত জল নদী হইতে বহন করিয়া স্নান করা সেও দুরূহতর। যখন ব্রহ্মকে অরূপ অনন্ত অনির্ব্বচনীয় বলিয়া জানি তখনি তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন অতি সহজ হয়—তখনি তাঁহার দ্বারা পরিপূর্ণরূপে পরিবৃত হইয়া আমাদের ভয় দুঃখ শোক সর্ব্বাংশে দূর হইয়া যায়। এই জন্যই উপনিষদে আছে—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন,—

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কাহা হইতেও ভয় পান না। অতএব ব্রহ্মের সেই বাক্য মনের অগোচর অনন্ত পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের ভয় দুঃখ নিঃশেষে নিরস্ত হয়। তাঁহাকে বিশ্বজগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বাঙ্‌মনোগোচর ক্ষুদ্র করিয়া খণ্ড করিয়া দেখিলে আমরা সেই পরম অভয়, সেই ভূমা আনন্দ লাভ করিতে পারি না। আমরা ত সংসারের সঙ্কীর্ণতা-দ্বারা প্রতিহত, জটিলতা দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত, খণ্ডতা দ্বারা শতধা-বিক্ষিপ্ত হইয়া আছি,—আমরা জানি সংসারের "স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি," সংসারের সমুদয় স্রোত ভয়াবহ—সকলেরই মধ্যে ভয় দুঃখ ক্লেশ জরা মৃত্যু বিচ্ছেদের কারণ রহিয়াছে ;—অতএব আমরা যখন শান্তি চাই, অভয় চাই, আনন্দ চাই, অমৃত চাই তখন সহজেই স্বভাবতই কাহাকে চাই? যাঁহাকে পাইলে শান্তিমত্যন্তমেতি, অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। তিনি কে? উপনিষৎ বলেন—স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ তিনি সংসার, কাল এবং আকৃতি অর্থাৎ সাকার পদার্থ হইতে পরঃ, শ্রেষ্ঠ, এবং অন্যঃ অর্থাৎ ভিন্ন। যদি তিনি সংসার, কাল, ও সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং

ভিন্ন না হইতেন তবে ত সংসারই আমাদের যথেষ্ট ছিল—তবে ত তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।

বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া অত্যন্ত শিব এবং অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। অতএব যাঁহারা বলেন আমরা সেই ভূমা স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারি না সেই জন্য তাঁহাতে আমাদের স্থিতি আমাদের শান্তি নাই তাঁহারা উপনিষৎ-কথিত পরম সত্য হইতে স্খলিত হইতেছেন—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন

বাক্য মন যাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না তাঁহাতেই আমাদের পরম আনন্দ, আমাদের অনন্ত অভয়। ঋষিরা করিতেছেন,

যৎবাচা নভ্যুদিতং যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে,
তদেব ব্রহ্ম ত্বংবিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে—

যিনি বাক্য দ্বারা উদিত নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা উদিত, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহর্মনোমতম্,
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে—

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে। যাঁহাকে বলা যায় না, যাঁহাকে ভাবা যায় না তাঁহাকেই জানিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নহে—যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব হইত তবে তাঁহাকে জানিয়া আমাদের আনন্দামৃতলাভ হইত না। তাঁহাকে আমরা অন্তরাত্মার মধ্যে এতটুকু জানি যাহাতে বুঝিতে পারি তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না এবং তাহাতেই আমাদের আনন্দের শেষ থাকে না।

নাহং মন্যে সুবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদচ, যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদচ—

তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানি এমন আমি মনে করি না, না জানি যে তাহাও নহে, আমাদের মধ্যে যিনি তাঁহাকে জানেন তিনি ইহা জানেন যে, তাঁহাকে জানি এমনও নহে, না জানি এমনও নহে। শিশু কি তাহার মাতার সম্যক্ পরিচয় জানে? কিন্তু সে অনুভবের দ্বারা এবং এক অপূর্ব্ব সংস্কার দ্বারা এটুকু ধ্রুব জানিয়াছে যে তাহার ক্ষুধার শান্তি, তাহার ভয়ের নিবৃত্তি, তাহার সমস্ত আরাম তাহার মাতার নিকট। সে তাহার মাতাকে জানে এবং জানেও না। মাতার অপর্য্যাপ্ত স্নেহ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার সাধ্য তাহার নাই, কিন্তু যতটুকুতে তাহার তৃপ্তি ও শান্তি ততটুকু সে আস্বাদন করে এবং আস্বাদন করিয়া ফুরাইতে পারে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুরী তীর্থ-যাত্রীর জাহাজ

সমুদ্রে ডুবিয়া গেলে দেখা গিয়াছিল ভাসমান মৃতদেহের মধ্যে অনেকগুলি রমণী আপন সন্তানকে বক্ষের মধ্যে দৃঢ়বাহুপাশে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে; যে মাতৃস্নেহ প্রলয় বিক্ষুব্ধ অকূল সমুদ্রের মৃত্যুবিভীষিকার মধ্যেও আপনাকে জয়ী ও জাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করে, সেই মৃত্যুঞ্জয় স্নেহের পূর্ণ পরিচয় কোন সন্তান প্রাত্যহিক গৃহকর্ম্মের মধ্যে পায় না—অথচ সেই অসম্পূর্ণ পরিচয়ের অন্তরালে অপরিমেয় মাতৃস্নেহের একটা আভাস সন্তানের মনে অলক্ষ্য ভাবেও বিরাজ করিতে থাকে। আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মাকে এই জগতের মধ্যে এবং আপন অন্তরাত্মার মধ্যে কিছু জানিতে পারি এবং সেইটুকু জানাতেই ইহা জানি যে, তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না; জানি যে তাঁহা হইতে বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ, বাক্য তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলে বিফল হইয়া ফিরিয়া আসে—এবং মাতৃ-অঙ্ককামী শিশুর মত ইহাও জানিতে পারি যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন—তাঁহার আনন্দ যে পাইয়াছে তাহার আর কাহারও নিকট হইতে কদাচ কোন ভয় নাই।

যাঁহারা উপনিষৎ অবিশ্বাস করিয়া ঋষিবাক্য অমান্য করিয়া ব্রহ্মলাভের সহজ উপায়স্বরূপ সাকার পদার্থকে অবলম্বন করেন তাঁহারা একথা বিচার করিয়া দেখেন না যে, ঐকান্তিক সহজ কঠিন বলিয়া কিছু নাই। সন্তরণ অপেক্ষা পদব্রজে চলা সহজ বলিয়া মানিয়া লইলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জলের উপর দিয়া পদব্রজে চলা সহজ নহে। সেখানে তদপেক্ষা সন্তরণ সহজ। অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে চক্ষুদ্বারা দেখা সহজ একথা স্বীকার্য্য কিন্তু তাই বলিয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থকে চক্ষুদ্বারা দেখা সহজ নহে। এমন কি, তাহা অসাধ্য। তেমনি সাকার মূর্ত্তির রূপ ধারণা সহজ সন্দেহ নাই কিন্তু সাকার মূর্ত্তির সাহায্যে ব্রহ্মের ধারণা একেবারেই অসাধ্য কারণ, স বৃক্ষ কালাকৃতিভিঃ পরোন্যঃ তিনি সংসার হইতে কাল হইতে সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন এবং সেই জন্যই তাঁহাতে সংসারাতীত দেশকালাতীত শিবংশান্তিমত্যন্তমেতি অত্যন্ত মঙ্গল এবং অত্যন্ত শান্তিলাভ হয়; অথচ তাঁহাকে পুনশ্চ আকৃতির মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা এত কঠিন যে তাহা অসাধ্য, অসম্ভব, তাহা স্বতোবিরোধী।

কিন্তু সহজ কঠিনের কথা উঠে কেন? আমরা সহজ চাই, না সত্য চাই? সত্য যদি সহজ হয় ত ভাল, যদি না হয় তবু সত্য বই গতি নাই। পৃথিবী কূর্ম্মের পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত আছে এ কথা ধারণা করা যদি কাহারও পক্ষে সহজ হয়, তথাপি বিজ্ঞান-পিপাসু সত্যের মুখ চাহিয়া তাহাকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মরু প্রান্তরের মধ্যে ভ্রাম্যমান ক্ষুধার্ত্ত যখন অন্ন চায়, তখন তাহাকে বালুকাপিণ্ড আনিয়া দেওয়া সহজ—কিন্তু সে বলে আমি ত সহজ চাই না, আমি অন্নপিণ্ড চাই—সে অন্ন এখানে যদি না পাওয়া যায়, তবে দুরূহ হইলেও তাহাকে অন্যত্র হইতে আহরণ করিতে হইবে, নহিলে আমি বাঁচিব না। তেমনি সংসার মধ্যে আমরা যখন অধ্যাত্ম পিপাসা মিটাইতে চাই তখন মরীচিকায় সে কিছুতেই মিটে না—যত দুর্লভ হউক্ সেই

পিপাসার জল—আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় পরমাত্মাকেই চাই—তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার বাক্য মনের অগোচর হইলেও তবু তাঁহাকেই চাই, নহিলে আমাদের মুক্তি নাই। ধর্ম্মপথ ত সহজ নহে, ব্রহ্মলাভ ত সহজ নহে, সে কথা সকলেই বলে—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—সেই জন্যই মোহনিদ্রাগ্রস্ত সংসারীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ঋষি উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"—না উঠিলে না জাগিলে এই ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম দুরত্য পথে চক্ষু মুদিয়া চলা যায় না, আত্মার অভাব আলস্যভরে অনায়াসে মোচন হয় না—এবং ব্রহ্ম ক্রীড়াচ্ছলে কল্পনাবাহিত মনোরথের গম্য নহেন। সংসারে যদি বিদ্যালাভ, বিত্তলাভ, যশোলাভ সহজ না হয়,—তবে ধর্ম্মলাভ, সত্যলাভ, ব্রহ্মলাভ সহজ, এমন আশ্বাস কে দিবে এবং সে আশ্বাসে কে ভুলিবে! কোন্ মূঢ় বিশ্বাস করিবে যে, মন্ত্রোচ্চারণে লোহা সোনা হইয়া যাইবে, ঋষি অন্বেষণের প্রয়োজন নাই? উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি!

তবে ব্রহ্মলাভের চেষ্টা কি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে? তবে কি এই কথা বলিয়া মনকে বুঝাইতে হইবে যে, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রম গ্রহণ করেন, যাঁহাদের নিকট ভালমন্দ সুন্দর কুৎসিত অন্তর বাহিরের ভেদ একেবারে ঘুচিয়া গেছে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদেরই জন্য? তাই যদি হইবে তবে ব্রহ্মবাদী ঋষি ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে কেন অনুশাসন করিতেছেন প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ, সন্তান সূত্র ছেদন করিবে। কেন মনু বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতেছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন ; এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ, তত্ত্বজ্ঞানী হইবেন, অর্থাৎ যে নিষ্ঠার কথা কহিলেন তাহা যেন অজ্ঞান নিষ্ঠা না হয়, গৃহী যথার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মে নিরত হইবেন, এবং যদ্‌যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ, যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন ; অতএব মনুর অনুশাসন এই যে গৃহী ব্যক্তিকে কেবল ভক্তিতে নহে, জ্ঞানে, কেবল জ্ঞানে নহে, কর্ম্মে, হৃদয়ে মনে এবং চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে। অতএব সংসারের মধ্যে থাকিয়া আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিব, অন্তরাত্মার মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠান অনুভব করিব এবং আমাদের সমুদয় কর্ম্ম তাঁহার সম্মুখে কৃত এবং তাঁহার উদ্দেশে সমর্পিত হইবে।

কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে হইলে, চতুর্দ্দিকের জড়বস্তুরাশিকে অপসারিত করিয়া ব্রহ্মের মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণ আশ্রিত আবৃত নিমগ্ন অনুভব করিতে হইলে তাঁহাকে সাকাররূপে কল্পনাই করা যায় না। উপনিষদে আছে, যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই সমস্ত জগৎ সেই প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে। অনন্ত প্রাণের মধ্যে সমস্ত বিশ্বচরাচর অহর্নিশি স্পন্দমান রহিয়াছে এই ভাব কি আমরা কোন প্রকার হস্তপদবিশিষ্ট মূর্ত্তি দ্বারা কল্পনা করিতে পারি? অথচ যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি, এই যাহা কিছু জগৎ সমস্ত প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে একথা মনে উদয় হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ

তৃণগুল্মলতাপুষ্পপল্লব পশুপক্ষীমনুষ্য চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্র, জগতের প্রত্যেক কম্পমান অণু পরমাণু এক মহাপ্রাণের ঐক্যসমুদ্রে হিল্লোলিত দেখিতে পাই—এক মহাপ্রাণের অনন্তকম্পিত বীণাতন্ত্রী হইতে এই বিপুলবিচিত্র বিশ্বসঙ্গীত ঝঙ্কৃত শুনিতে পাই। অনন্তপ্রাণের সেই অনির্দ্দেশ্যতা অনির্ব্বচনীয়তাই আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সেই জগদ্ব্যাপী জগদতীত প্রাণকে কোন নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ আকারের মধ্যে কল্পনা করিতে গেলে তখন আর তাঁহাকে আমাদের নিঃশ্বাসের মধ্যে পাই না, আমাদের চক্ষের নিমেষের মধ্যে পাই না, আমাদের রক্তের উত্তপ্ত প্রবাহ, আমাদের সর্ব্বাঙ্গের বিচিত্র স্পর্শ, আমাদের দেহের প্রত্যেক স্পন্দিত কোষ, প্রত্যেক নিঃশ্বসিত রোমকূপের মধ্যে পাই না, আকৃতির কঠিন ব্যবধানে, মূর্ত্তির অলঙ্ঘনীয় অন্তরালে তিনি আমাদের নিকট হইতে আমাদের অন্তর হইতে দূরে বাহিরে গিয়া পড়েন। আমার অশরীরী অভাবনীয় প্রাণ আমার আদ্যোপান্তে অখণ্ডভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, আমার পদাঙ্গুলির কোষাণুকে যোগযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে,—আবার আমার এই রহস্যময় প্রাণের মধ্যে সেই পরমপ্রাণ আমার শরীরকোষের প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত সুদূরতম নক্ষত্রবর্ত্তী বাষ্পাণুর প্রত্যেক আন্দোলনকে এক অনির্ব্বচনীয় ঐক্যে এক অপূর্ব্ব অপরিমেয় ছন্দোবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা অনুভব করিয়া এবং অনুভবের শেষ করিতে না পারিয়া কি আমাদের চিত্ত পুলকিত প্রসারিত হইয়া উঠে না? কোনও মূর্ত্তির কল্পনা কি ইহা অপেক্ষা সহজে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন, খণ্ডতার কারাপ্রাচীর হইতে মুক্তিদানে সহায়তা করিতে পারে, অনন্তের সহিত আমাদের এমন অন্তরতম ব্যাপকতম যোগ সনিবদ্ধ করিতে পারে? সাকার মূর্ত্তি আমাদিগকে সহায়তা করে না, ব্রহ্মকে দূরে লইয়া দুষ্প্রাপ্য করিয়া দেয়।

যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনি-লয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ংগতো ভবতি—

যখন সাধক সেই অদৃশ্যে, অশরীরে, নির্ব্বিশেষে, নিরাধারে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ দরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি—

কিন্তু যখন তিনি ইঁহাতে লেশমাত্র অন্তর অর্থাৎ দূরত্ব স্থাপন করেন তখন তিনি ভয় প্রাপ্ত হন। সেই অদৃশ্যকে দৃশ্য, অশরীরকে শরীরী, নির্ব্বিশেষকে সবিশেষ এবং নিরাধারকে আধারবিশিষ্ট করিলে ব্রহ্মের সহিত দূরত্ব স্থাপন করা হয় এবং তখন আমাদের আত্মার অভয় প্রতিষ্ঠা চূর্ণ হইয়া যায়।

উপনিষৎ বলিতেছেন—

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

তিনি আছেন এই কথা যে বলে সে ছাড়া অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে কি করিয়া উপলব্ধি করিবে? তিনি আছেন ইহার অধিক আর কি বলিবার আছে? তিনি আছেন একথা যখনি

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পূর্ণভাবে বলিতে পারি তখনই আমাদের মনোনেত্রের সম্মুখে অনন্ত শূন্য ওতপ্রোত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে—তখনি যথার্থতঃ বুঝিতে পারি যে, আমি আছি, বুঝিতে পারি যে, আমার বিনাশ নাই, আত্ম ও পর, জড় ও চেতন, দেশ ও কাল নিষ্কল পরমাত্মার দ্বারা এক মুহূর্ত্তেই অখণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে ; তখন আমাদের এই পুরাতন পৃথিবীর দিকে চাহিলে ইহাকে আর ধূলিপিণ্ড বলিয়া বোধ হয় না, নিশীথ নভোমণ্ডলের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিলে তাহারা শুদ্ধমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে প্রতীয়মান হয় না, তখন আমার অন্তরাত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ধূলিকণা, এই ভূমিতল হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত একটি শব্দ ধ্বনিহীন গাম্ভীর্য্যে উদ্‌গীত হইয়া উঠে—ওঁ,—একটি বাক্য শুনিতে পাই—অস্তি, তিনি আছেন—এবং সেই একটি কথার মধ্যেই সমস্ত জগৎ চরাচরের, সমস্ত কার্য্যকারণের সমস্ত অর্থ নিহিত পাওয়া যায়। সেই মহান্ অস্তি শব্দকে কোনও আকারের দ্বারা মূর্ত্তি দ্বারা সহজ করা যায় কি ? এমন সহজ কথা কি আর কিছু আছে যে তিনি আছেন ? আমি আছি এ কথা যেমন জগতের সকল কথার অপেক্ষা সহজ তিনি আছেন এ কথা কি তাহা অপেক্ষাও সহজ নহে ? তিনি আছেন এ কথা না বলিলে আমি আছি এ কথা যে আদ্যোপান্ত নিরর্থক মিথ্যা হইয়া যায়। আমার অস্তিত্ব বলিতেছে, আমার আত্মা বলিতেছে তিনি আছেন, সাকার মূর্ত্তি কি তদপেক্ষা সহজ সাক্ষ্য আর কিছু দিতে পারে।

অনেকে বলেন, দুর্ব্বল মানবপ্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার চরিতার্থতা আমরা ঈশ্বরে পাইতে চাই ; আমাদের প্রেম কেবল জ্ঞানে ও ধ্যানে পরিতৃপ্ত হয় না, সেবা করিতে চায় ; আমাদের প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ঈশ্বরকে মূর্ত্তিতে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অশন বসন ভূষণ উপহারে পূজা করিয়া থাকি।

এ কথা সত্য যে, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা মানবপ্রকৃতির চরম চরিতার্থতা অন্বেষণ করি ; কেবল ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা সেই চরিতার্থতা লাভ হইতে পারে না, সেই জন্যই মনু গৃহস্থকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে বলিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বলিয়াছেন, গৃহী যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মকে সমর্পণ করিবেন। সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যপালনই ব্রহ্মের সেবা। যদি প্রতিমাকে অন্নবস্ত্র পুষ্পচন্দন দান করিয়া আমরা দেবসেবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করি তবে তাহাতে আমাদের কর্ম্মের মহত্ত্ব লাভ না হইয়া ঠিক তাহার বিপরীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদিগকে সকল জ্ঞানের চরিতার্থতার দিকে লইয়া যায়, ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি আমাদিগকে পুত্রপ্রীতি বিত্তপ্রীতি ও অন্য সকল প্রীতির পরম পরিতৃপ্তিতে লইয়া যায়, এবং ব্রহ্মের কর্ম্মও সেইরূপ আমাদের শুভ চেষ্টাকে চরম মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের অভিমুখে আকর্ষণ করে। আমাদের জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের এইরূপ মহত্ত্ব সাধনের জন্যই মনু গৃহীকে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়াছেন—মানবপ্রকৃতির যথার্থ চরিতার্থতা তাহাতেই—ভোগে নহে, খেলায় নহে। প্রতিমাকে স্নান করাইয়া বস্ত্র পরাইয়া অন্ন নিবেদন করিয়া আমাদের কর্ম্ম চেষ্টার কোন মহৎ পরিতৃপ্তি হইতেই পারে

না, তাহাতে আমাদের কর্ত্তব্যের আদর্শকে তুচ্ছ ও সঙ্কীর্ণ করিয়া আনে। ভক্তি ও প্রীতির উদারতা অনুসারে কর্ম্মেরও উদারতা ঘটিয়া থাকে। পরিবারের প্রতি যাহার যে পরিমাণে প্রীতি সে পরিবারের জন্য সেই পরিমাণে প্রাণপাত করিয়া থাকে। দেশের প্রতি যাহার ভক্তি, দেশের সর্ব্বপ্রকার দৈন্য ও কলঙ্ক মোচনের জন্য বিবিধ দুরূহ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া সে আপন ভক্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতা সাধন করিয়া থাকে। ব্রহ্মের প্রতি যাহার গভীর নিষ্ঠা, সে, পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দেশের প্রতি, সকলের প্রতি মঙ্গল চেষ্টা নিয়োগ করিয়া ভক্তিবৃত্তিকে সফলতা দান করে। দীনকে বস্ত্রদান, ক্ষুধিতকে অন্নদান ইহাতেই আমাদের সেবাচেষ্টার সার্থকতা। প্রতিমার সম্মুখে অন্ন বস্ত্র উপহরণ করা ক্রীড়ামাত্র—তাহা কর্ম্ম নহে, তাহা ভক্তিবৃত্তির মোহাচ্ছন্ন বিলাসমাত্র, তাহা ভক্তিবৃত্তির সচেষ্ট সাধনা নহে। এই খেলায় যদি আমাদের মুগ্ধ হৃদয়ের কোন সুখ সাধন হয় তবে সে ত আমাদের আত্মসুখ, আমাদের আত্মসেবা, তাহাতে দেবতার কর্ম্মসাধন হয় না। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ইচ্ছাকৃত কর্ম্ম নিজের সুখের জন্য না করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে করা এবং তাহাতেই সুখানুভব করা দেবসেবার উচ্চ আদর্শ। সেই আদর্শকে রক্ষা করিতে হইলে জড় আদর্শকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সত্যজ্ঞান দুরূহ, প্রকৃত নিষ্ঠা দুরূহ, মহৎ কর্ম্মানুষ্ঠান দুরূহ সন্দেহ নাই, তাই বলিয়া তাহাকে লঘু করিয়া, ব্যর্থ করিয়া, মিথ্যা করিয়া, মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া আমরা কি ফল লাভ করিয়াছি? কর্ত্তব্যকে খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে, জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মকে, মানব প্রকৃতির সর্ব্বোচ্চ শিখরকে কয়েক খণ্ড মৃৎপিণ্ডে পরিণত করিয়া খেলা করিতে করিতে আমরা কোনখানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি! আমরা নিজেকে অক্ষম অশক্ত নিকৃষ্ট অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া নিশ্চেষ্ট জড়ত্বকে আনন্দে বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা অকুণ্ঠিত স্বরে নিজেকে আধ্যাত্মিক শিশু বলিয়া প্রচার করি, এবং সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যোচিত কঠিন সাধনা ও মহৎ প্রয়াস হইতে নিষ্কৃতি, জ্ঞানীর নিকট হইতে মার্জ্জনা ও ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রশ্রয় প্রত্যাশা পূর্ব্বক নিদ্রা, ক্রীড়া ও উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার দ্বারা সুখলালিত হইয়া নিস্তেজ নির্বীর্য্য হইতে থাকি ; যুক্তিকে পঙ্গু করিয়া, ভক্তিকে অন্ধ করিয়া, আত্মপ্রত্যয়কে আচ্ছন্ন করিয়া, ব্রহ্মকে চিন্তা ও চেষ্টা হইতে দূরীভূত করিয়া, হৃদয় মন আত্মার মধ্যে আলস্য এবং পরাধীনতার সহস্রবিধ বীজ বপন করিয়া আমরা জাতীয় দুর্গতির শেষ সোপানে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছি। অদ্য আমরা ভয়ে ভীত, দীনতায় অবনত, শোক তাপে জর্জ্জর। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত, হীনবল। আমাদের বাহিরে লাঞ্ছনা, অন্তরে গ্লানি, চতুর্দ্দিকেই জীর্ণতা। আমাদের বাহিরে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যেরূপ বিচ্ছেদ, আমাদের নিজের প্রকৃতির মধ্যে আমাদের চিত্তে যাচি ক্রিয়ায়াং—মনে বাক্যে ও কর্ম্মে বিরোধ, শিক্ষায় ও আচরণে বিরোধ, ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে ঐক্য নাই—সেই কাপুরুষতায় এবং বিচ্ছিন্নতায় আমাদের সমাজ আমাদের গৃহ আমাদের অন্তঃকরণ অসত্যে আদ্যোপান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়াছে।

আমাদিগকে এক হইতে হইবে, সতেজ হইতে হইবে, ভয়হীন হইতে হইবে। অজ্ঞান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইব। কে আমাদের বল, কে আমাদের আশ্রয়? সে কোন্ সর্ব্বব্যাপী সত্য, কোন্ অদ্বিতীয় এক, যিনি আমাদিগকে জাতিতে জাতিতে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনে বাক্যে ও কর্ম্মে একতা দান করিবেন। সংসারের মধ্যে আমরা লোকভয়-মৃত্যুভয়-জয়ী পরম নির্ভর পাই নাই ; সংসার গুরুভার লৌহ-শৃঙ্খলে আমাদের অবমানিত মস্তককে আরও অবনত করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের জড়দুর্ব্বল দেহকে আরও গতিশক্তিবিহীন করিয়াছে। এই সকল ভয় এবং ভার এবং ক্ষুদ্রতা হইতে ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র মুক্তি। দিনে রাত্রে সুপ্তিতে জাগরণে অন্তরে বাহিরে আমরা তাঁহার মধ্যে আবৃত নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছি—কোন প্রবল রাজা, কোন পরম শত্রু কোন প্রচণ্ড উপদ্রবে তাঁহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। অদ্য আমরা সমস্ত ভীত ধিক্কৃত ভারতবর্ষ কি এক হইয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে বলিতে পারি না যে,—

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

তুমি অজাত, জন্মরহিত, কোন ভীরু তোমার শরণাপন্ন হইতেছে, হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর! তিনি রহিয়াছেন—ভয় নাই, ভয় নাই! সম্মুখে যদি অজ্ঞান থাকে তবে দূর কর, অন্যায় থাকে তবে আক্রমণ কর, অন্ধ সংস্কার বাধাস্বরূপ থাকে তবে তাহা সবলে ভগ্ন করিয়া ফেল ; কেবল তাঁহার মুখের দিকে চাও এবং তাঁহার কর্ম্ম কর! তাহাতে যদি কেহ অপবাদ দেয় তবে সে অপবাদ ললাটের তিলক করিয়া লও ; যদি দুঃখ ঘটে সে দুঃখ মুকুটরূপে শিরোধার্য্য করিয়া লও, যদি মৃত্যু আসন্ন হয় তবে তাহাকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ কর, নৈরাশ্য দূর কর, অবসাদ অপসারিত করিয়া দাও—অক্ষয় আশায়, অক্ষুণ্ণ বলে অনন্ত প্রাণের আশ্বাসে, ব্রহ্মসেবার পরম গৌরবে সংসারের সঙ্কট পথে সরল হৃদয়ে ঋজু দেহে চলিয়া যাও! সুখের সময় বল—অস্তি—তিনি আছেন, দুঃখের সময় বল—অস্তি—তিনি আছেন, বিপদের সময় বল—অস্তি—তিনি আছেন! পরমাত্মার মধ্যে আত্মার অবাধ স্বাধীনতা, অপরিসীম আনন্দ, অপরাজিত অভয় লাভ করিয়া সমস্ত অপমান দৈন্য গ্লানি নিঃশেষে প্রক্ষালিত করিয়া ফেল! বল, যে মহান্ অজ আত্মা হইতে বাক্য মন নিবৃত্ত হইয়া আসে আমি সেইখান হইতে আনন্দ লাভ করিয়াছি, আমি কদাচ ভয় করি না, আমি কাহা হইতেও ভয় পাই না। আমার ন জরা, ন মৃত্যু ন শোকঃ। বল—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুশ্রোত্রমথো
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং।
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ
অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেহস্তু।

তদাত্মনিঃনিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ
তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥

উপনিষৎ-কথিত সর্ব্বান্তর্য্যামী ব্রহ্ম আমার বাক্য প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র বল ইন্দ্রিয়, আমার সমুদয় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি, তিনি অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা-কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত থাকুন! সেই পরমাত্মায় নিরত আমাতে উপনিষদের যে সকল ধর্ম্ম তাহাই হৌক্, আমাতে তাহাই হৌক্!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

অনন্তর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এই প্রার্থনা করিলেন।

হে রস-স্বরূপ তৃপ্তিহেতু পরমেশ্বর! এই প্রয়োজন-সুলভ সুন্দর বিচিত্র বিশ্ব তোমার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! ঊর্ধ্বে জ্যোতিষ্কগণ-পরিশোভিত আকাশের দিকেই নেত্রপাত করি, কিম্বা এই ভূতধাত্রী পৃথিবীর গিরি নদী তরুরাজির প্রতিই দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সর্ব্বত্র তোমারই নিপুন হস্তের চিহ্ন সকল দেখিতে পাই। প্রীতি এবং মঙ্গল ভাব এবং আনন্দ বিধানই তোমার এই সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। তোমার মঙ্গল ভাবে সমস্ত জগৎ পরিপূরিত, তোমার আনন্দ কিরণে সকল দিক্ সমুজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। তোমার সৃষ্ট সুন্দর পদার্থ সকল, নয়ন মনকে পরিতৃপ্ত করিয়া, তুমি যে নয়নের নয়ন, মনের মন, তোমার নিকট প্রণত হইবার জন্য আমাদিগকে ইঙ্গিত করে। বিষয়রসই আস্বাদন করি, কিম্বা গভীর তত্ত্বানুসন্ধানেই নিমগ্ন হই, দেখি যে তোমার স্নেহ প্রেমের নিদর্শন সেখানে উজ্জ্বল। জিহ্বা বিষয়ের রসাস্বাদন করিয়া পুলকিত হয়, মন তত্ত্বের সুগভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সুশৃঙ্খলা ও সুপ্রণালী-বদ্ধ নিশ্চয় সত্য মঙ্গলের সহজ পথ প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দ রসে মগ্ন হয়। অন্তর্বাহ্যে তুমিই এক মাত্র রস-স্বরূপ, তৃপ্তি-হেতু।

তুমি প্রেমের আকর! যে তোমাকে দেখে না, জানিতে চাহে না, তাহাকেও তুমি প্রেম দান করিতেছ। দিবসে তোমার সূর্য্য-কিরণ পুণ্যাত্মা পাপী উভয়কেই আলোক বিতরণ করে, আকাশ-বিহারী তোমারই বায়ু উভয়েরই শরীরে জীবন বিধান করে, তোমারই জলধারা সকলেরই সাধারণ হিতকারী। তুমি জীবিত জনকে শুভ বুদ্ধি দিয়া ধর্ম্মপথে পরিচালন কর এবং মৃতকেও আপনার উদার ক্রোড়ে স্থান দিয়া কৃতার্থ কর। এত যে তোমার প্রেম, তোমার করুণা, তাহার জন্য কি ক্ষণকালের নিমিত্ত তোমার চরণে প্রণত হইয়া উপাসনা করিতে, কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি হস্তে করিয়া অবনত মস্তকে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে আমরা আলস্য বোধ করিব? কিন্তু হে দেব, তোমার সহায়তা ব্যতীত কোন্ কর্ম্ম করিতেই বা আমরা সক্ষম হই? অতএব প্রার্থনা করি যে, তুমি দয়া করিয়া আমাদের হৃদয়ের ভক্তি কৃতজ্ঞতার বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া দাও যে, তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত ও পুষ্পান্বিত হইয়া তোমার চরণতল সুশোভিত করুক।

হে দয়াময়! তোমার দয়া কত প্রকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমি তোমার যে

করুণা আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে অনুভব করিতেছি, যখন দেখি যে, তোমার সেই করুণা তোমার অসীম রাজ্যের অগণ্য লোককে তৃপ্ত করিতেছে, তখন বাক্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। তোমার করুণা দিবসে রাত্রিতে, তোমার করুণা মাতৃ-হৃদয়ে, তোমার করুণা সাধু লোকের অন্তঃকরণে। যখন দেখি, ক্ষুদ্র প্রাণী বৃহৎ রোমাবলীর দ্বারা আবৃত হইয়া উচ্চ হিমাদ্রি-শৃঙ্গের চিরতুষাররাজির মধ্যে কেমন উত্তপ্ত থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছে, তখন তোমার করুণার রহস্য ভাবিতে গিয়া মন স্তম্ভিত হয়! অতএব হে পরমাত্মন্, তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, বিনীত ভাবে হৃদয় মনকে তোমাতে অর্পণ করিতেছি যে, যাহা কিছু তোমার পূজার জন্য দিতে হয়, সকলই প্রদান কর। হস্তকে তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্ত কর, পদকে তোমার কার্য্যে প্রেরিত কর, রসনাকে তোমার সহিত যুক্ত কর, তোমাতে যাইয়া আত্মা শান্ত হউক। তোমার প্রস্ফুটিত জ্ঞান-চক্ষু দেখিয়া আত্মা পরিতৃপ্ত হউক। তুমি যখন রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু হইয়া আমাদিগের সকল অভাব মোচন করিতেছ, তখন হে পরমাত্মন্, কাতর প্রাণে, বিনীত অন্তঃকরণে তোমার উন্নত ধামের প্রতি অবলোকন করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি যে, তুমি এই পৃথিবীর শোক মোহ কোলাহলে ব্যথিত আমাদের আত্মার প্রতি কৃপা কর। কৃপা কর, হে দীন-দয়ালু, কৃপা কর। আমাদের আত্মার শান্তি রক্ষা কর। তোমার মঙ্গল-ছায়া সর্ব্বত্র বিস্তার কর, ব্রাহ্ম ভ্রাতৃবর্গকে তোমার পথে অগ্রসর কর। এ দেশকে তোমার জ্ঞানে উজ্জ্বল কর। পৃথিবীকে শান্তি-সলিলে শীতল কর, সকলকে তোমার উপাসনাতে প্রবৃত্ত কর। আমাদের অদ্যকার উৎসবকে অনন্তজীবনের উৎসবে পরিণত কর, ইহাই তোমার নিকটে প্রার্থনা। ধন্য জগদীশ্বর, তুমিই ধন্য!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

পরিশেষে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

পরে সমস্ত নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চটচটা শব্দে বহ্ন্যুৎসব পর্ব্ব আরম্ভ হইল। লোকতরঙ্গ মহা কোলাহলে ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। কি ভীষণ জনতা! কি বিষম কলরব!

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

মাঘ ১৮২১ শক। পৃ. ১৫৪-১৭৪

শান্তিনিকেতনে একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

...পরে আমরা মেলা দেখিবার জন্য বহির্গত হইলাম। খুব জনতা। বেশ ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। বাউল সম্প্রদায় স্থানে স্থানে নৃত্যগীত করিতেছে। চারিদিকে যেন আনন্দের বাজার। আমরা এই জনতা ভেদ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম। তথায় অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। কতকগুলি বালক ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিয়া বিনীতভাবে উপবিষ্ট হইয়াছে। আমরাও ব্যাপার দেখিবার জন্য বসিয়া গেলাম। দেখিলাম সর্ব্ব প্রথমে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবকদিগকে নিম্নোক্ত প্রকারে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিলেন।

ওঁ নমো ব্রহ্মণে। ঋতংবদিষ্যামি। সত্যংবদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মকে নমস্কার! ঋত বলিব। সত্য বলিব। তিনি আমাকে রক্ষা করুন। তিনি বক্তাকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন। বক্তাকে রক্ষা করুন।

ওঁ আমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বিমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্—সহস্রশাখে। নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতায়ন্তি, যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব।

আমার নিকট ব্রহ্মচারিগণ আসুন। আমার নিকট ব্রহ্মচারিগণ আসুন। আমার নিকট ব্রহ্মচারিগণ আসুন। ব্রহ্মচারিগণ দম সাধন করুন। ব্রহ্মচারিগণ শম লাভ করুন। আমি যেন লোকে যশস্বী হই। আমি যেন ধনবান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই। হে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, তোমাতে আমি যেন প্রবেশ করি। হে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, তুমি আমাতে প্রবেশ কর। হে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, সহস্রশাখা যে তুমি, তোমাতে আপনাকে পবিত্র করি। জল যেমন নিম্নস্থানে যায়, মাস সমূহ যেরূপ সংবৎসরে যায়, হে বিধাতঃ সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক হইতে আমার সমীপে আসুন। তুমি আশ্রয়, আমাকে আলোকিত কর, আমাকে অধিকার কর।

ব্রহ্মচারিগণ সম্মুখে উপনীত হইলে কহিলেন,

সহ নৌ যশঃ সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্।

আমরা একত্রে যশলাভ করি, আমরা একত্রে ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হই।

ব্রহ্মচারিগণ কহিলেন

ওঁ ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং।
তেনর্ঘ্যাসমিদমহম্ অনৃতাং সত্যমুপৈমি।

হে ব্রহ্মপত্তে, আমি ব্রতপালন করিব। তোমার নিকট প্রার্থনা করি যেন আমি সমর্থ হই। অর্ঘ্যসমিদ্‌যুক্ত শ্রদ্ধাবান্ আমি যেন অসত্য হইতে সত্যে উপনীত হই।

শরীরং মে বিচষণম্। জিহ্বা যে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। শ্রুতং মে গোপায়।

আমার শরীর উপযুক্ত হউক। আমার জিহ্বা অত্যন্ত মধুরভাষিণী হউক। আমি যেন কর্ণে বহু শ্রবণ করি। যে জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিব তাহা যেন রক্ষা করিতে পারি।

গুরু। ওঁ সত্যংবদ। সত্য বল।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ ধর্ম্মং চর। ধর্ম্মাচরণ কর।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। অধ্যয়ন হইতে স্খলিত হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ সত্যান্ন প্রমদিতব্যং। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং। ধর্ম হইতে পতিত হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ কুশলান্ন প্রমদিতব্যং। কুশল হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ ভূত্যৈর্ন প্রমদিতব্যং। মহত্ত্বলাভে উদাসীন হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ মাতৃদেবোভব। মাতাকে দেবতার ন্যায় জানিবে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ পিতৃদেবোভব। পিতাকে দেবতার ন্যায় জানিবে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ আচার্য্যদেবোভব। আচার্য্যকে দেবতার ন্যায় জানিবে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ যানি অনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যে সকল কর্ম্ম অনিন্দনীয় সেই সকল কর্ম্ম করিবে অন্য কর্ম্ম করিবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। আমাদের যে

সকল কর্ম্ম সৎ সেই সকলই তোমার কর্ত্তব্য, অন্য কর্ত্তব্য নহে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। শ্রীর সহিত দান করিবে। বিনয়ের সহিত দান করিবে। ধর্ম্মভয়ের সহিত দান করিবে। বুদ্ধির সহিত দান করিবে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এতৎ অনুশাসনম্। এবম্ উপাসিতব্যম্। এবমু চৈতৎ উপাস্যম্। ইহাই আদেশ। ইহাই উপদেশ, ইহাই অনুশাসন। এইরূপই আচরণ করিবে, এইরূপই আচরণ করিবে।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি
মম চিত্তম্ অনুচিত্তম তে অস্তু।
মম বাচমেকমনা জুষস্ব
বৃহস্পতিষ্টা নিযুনক্তুমহ্যম্।

আমার ব্রতে তোমার হৃদয়কে আমার অধীন করি। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুকূল থাকুক্। আমার বাক্য একমনা হইয়া গ্রহণ কর—বৃহস্পতি ব্রহ্ম তোমাকে আমার সহিত যুক্ত করুন।

হরিঃ ওঁ। সহ নাববতু। সহনৌ ভুনক্তু। সহবীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে আচার্য্য ও শিষ্যকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদের উভয়কে ভোগ করুন। আমরা উভয়ে যেন বীর্য্য প্রাপ্ত হই। আমাদের উভয়ের জ্ঞান অধীত হউক। আমরা পরস্পরকে যেন বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরে ছাত্রগণের প্রতি এই উপদেশ দিলেন।

হে সৌম্য মানবকগণ—অনেককাল পূর্ব্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে যথার্থ বড় ছিল—তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন। তাঁরাই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ।

যথার্থ বড় কাহাকে বলে? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি হলে আপনাদের বড় মনে করতেন? আজকাল আমাদের মনে তাঁদের সেই বড় ভাবটি নেই বলেই ধনীকেই আমরা বড় হবার উপায় মনে করি। ধনীকেই আমরা বলি বড় মানুষ। তাঁরা তা বলতেন না। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা বড় ছিলেন সেই ব্রাহ্মণরা ধনকে তুচ্ছ করতেন। তাঁদের বেশভূষা বিলাসিতা কিছুই ছিল না। অথচ বড় বড় রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।

যে মানুষ কাপড়চোপড় জুতো ছাতা নিয়ে নিজেকে বড় মনে করে ভেবে দেখ

দেখি সে কত ছোট। জুতো কি মানুষের বড় করতে পারে? দামী জুতো দামী কাপড় কি আমাদের কোন গুণের পরিচয় দেয়। আমাদের প্রাচীনকালে যে সব ঋষিদের পায়ে জুতো ছিল না গায়ে পোষাক ছিল না, তাঁরা কি সাহেবের বাড়ির জুতো এবং বিলাতি দোকানের কাপড় পরা আমাদের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন না? আজ যদি আমাদের সেই যাজ্ঞবল্ক্য সেই বশিষ্ঠ ঋষি খালি গায়ে খালি পায়ে তাঁদের সেই জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি, তাঁদের সেই পিঙ্গল জটাভার নিয়ে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান, তাহলে সমস্ত দেশের মধ্যে এমন কোন্ রাজা এমন কত বড় সাহেব আছেন যিনি তাঁর জুতো ফেলে দিয়ে মাথার তাজ নামিয়ে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা নিয়ে নিজেকে কৃতার্থ না মনে করেন? আজ এমন কে আছে যে তার গাড়িজুড়ি অট্টালিকা এবং সোনার চেন্ নিয়ে তাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে?

তাঁরাই আমাদের পিতামহ ছিলেন, সেই পূজ্য ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি। কেবল মাথা নত করে নমস্কার করা নয়—তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করি, তাঁরা যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার অনুসরণ করি। তাঁদের মত হবার চেষ্টা করাই হচ্ছে তাঁদের প্রতি ভক্তি করা।

তাঁরা বড় হয়েছিলেন কি গুণে? তাঁরা সত্যকে সকলের চেয়ে বড় বলে জানতেন—মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নীচু করেন নি। সত্য কি তাই জানবার জন্যে সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্যা করতেন—কেবল আমোদপ্রমোদ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। যাতে সত্য জানবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত করত তাকে তাঁরা অনায়াসে পরিত্যাগ করতেন। মনে সত্য জানবার অবিশ্রাম চেষ্টা করতেন, মুখে সত্য বলতেন, এবং সত্য বলে যা জানতেন কাজেও তাই পালন করতেন, সে জন্যে কাউকে ভয় করতেন না। আমরা টাকাকড়ি জুতোছাতা পাবার জন্যে যে রকম প্রাণপণ খেটে মরি, তাঁরা সত্যকে পাবার জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতেন। সেই জন্যে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড় ছিলেন।

তাঁরা অভয় ছিলেন, ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুকেই ভয় করতেন না। তাঁদের মনের মধ্যে এমন একটি তেজ ছিল, সর্ব্বদাই এমন একটি আনন্দ ছিল, যে, তাঁরা কোন রাজা মহারাজার অন্যায় শাসনকে গ্রাহ্য করতেন না, এমন কি মৃত্যুকেও তাঁরা ভয় করতেন না। তাঁরা এটা বেশ জানতেন যে, তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার ত কিছু নেই—বেশভূষা ধনসম্পদ গেলে ত তাঁদের কোন ক্ষতিই হয় না। তাঁদের যা কিছু আছে সব মনের মধ্যে। তাঁরা যে সত্য জানতেন তা ত দস্যু কিম্বা রাজা হরণ করতে পারত না। তাঁরা নিশ্চয় জানতেন মৃত্যু ভয়ের বিষয় নয়। মৃত্যুতে এই শরীরটা মাত্র যায়, কিন্তু অন্তরের জিনিস যায় না।

তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্যে ভালর জন্যে চিন্তা করতেন, কিসে সকলের ভাল হবে সেইটে তাঁরা ধ্যান করতেন এবং যাতে ভাল হয় সেইটে তাঁরা ব্যবস্থা করতেন।

কার কি করা উচিত সেইটে সকলে তাঁদের কাছে জানতে আসত। কিসে ঘরের লোকের মঙ্গল হয় তাই জানবার জন্য গৃহস্থ লোকেরা তাঁদের কাছে আসত—কিসে প্রজাদের ভাল হয় তাই পরামর্শ নেবার জন্যে রাজারা তাঁদের কাছে আসত। পৃথিবীর সকলের ভালর জন্য তাঁরা সমস্ত আমোদ প্রমোদ সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে চিন্তা করতেন।

কিন্তু তখন কি কেবল ব্রাহ্মণ ঋষিরাই ছিলেন? তা নয়। রাজারাও ছিলেন, রাজার সৈন্যসামন্ত ছিল। রাজ্যের প্রয়োজনে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ করতে হত। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও তাঁরা ধর্ম্ম ভুলতেন না। যে লোকের হাতে অস্ত্র নেই তাকে মারতেন না, শরণাপন্নকে বধ করতেন না, রথের উপর চড়ে নীচের লোকদের উপর অস্ত্র চালাতেন না। সৈন্যে সৈন্যেই যুদ্ধ চলত কিন্তু শত্রুপক্ষের দেশের নিরীহ প্রজাদের ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে দিতেন না। রাজার ছেলের যখন বড় বয়স হত তখন রাজা আপনার সমস্ত টাকাকড়ি রাজত্ব ছেলের হাতে দিয়ে সত্য জানবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত মন দেবার জন্যে বনে চলে যেতেন। তখন আর তাঁদের হীরা মুক্তো ছাতাজুতো লোকজন কিছুই থাকত না। রাজ্যেশ্বর রাজা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দীনহীনের মত সমস্ত ছেড়ে যেতেন। তাঁরা জানতেন রাজ্য টাকাকড়ি বাইরের জিনিস, তাতেই যে মানুষ বড় হত তা নয়, বড় হবার জিনিস ভিতরে। তবে ধর্ম্ম নিয়ম মতে রাজত্ব করা রাজার কর্ত্তব্য, সুতরাং সে জন্যে প্রাণ দেওয়া দরকার হলে তাও দিতেন—কিন্তু যুবরাজ বড় হয়ে উঠলে যখন সে কর্ত্তব্যের শেষ হয় তখন আর তাঁরা রাজত্ব আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতেন না।

গৃহস্থদেরও ঐ রকম নিয়ম ছিল। যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র বড় হয়ে উঠত তখন তারই হাতে সমস্ত সংসার দিয়ে তাঁরা দরিদ্রবেশে তপস্যা করতে চলে যেতেন। যতদিন সংসারে থাকতে হত ততদিন প্রাণপণে তাঁরা সংসারের কাজ করতেন। আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেশী, অতিথি, অভ্যাগত, দরিদ্র, অনাথ কাউকেই ভুলতেন না—প্রাণপণে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ দূরে রেখে তাদেরই সেবা করতেন—তার পরে সময় উত্তীর্ণ হলেই আর ধন সম্পদ ঘর দুয়ারের প্রতি তাকাতেন না।

তখন যাঁরা বাণিজ্য করতেন তাঁদেরও ধর্ম্মপথে সত্যপথে চলতে হত। কাউকে ঠকান, অন্যায় সুদ নেওয়া, কৃপণের মত সমস্ত ধন কেবল নিজের জন্যেই জড় করে রাখা এ তাঁদের দ্বারা হত না।

যাঁরা রাজত্ব করতেন, যাঁরা বাণিজ্য করতেন, যাঁরা কর্ম্ম করতেন, তাঁদের সকলের জন্যই ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করতেন। যাতে সমাজে ধর্ম্ম থাকে, সত্য থাকে, শৃঙ্খলা থাকে, যাতে ভাল হয় এই তাঁদের একান্ত লক্ষ্য ছিল। সেই জন্য তাঁদের আদর্শে তাঁদের উপদেশে তখনকার সকল লোকেই ভাল হয়ে চলতে পারত। সমস্ত সমাজের মধ্যে সেই জন্যে এত উন্নতি এত শ্রী ছিল।

সেই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে শিক্ষা যে ব্রত অবলম্বন করে বড় হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই তোমাদের এই নির্জ্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ—আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য, তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্ব্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব—আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীরপুরুষ হয়ে উঠবে—তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্ব্বে স্ফীত হবে না ; মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে রেখে, সর্ব্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দ মনে সকল দুষ্কর্ম্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্ত্তব্য-কর্ম্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্ম্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্ত্তব্য-বোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভাল করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভাল হবে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কিরূপ শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন ? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জ্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে থাকতে হত। গুরুকে একান্তমনে ভক্তি করতেন, গুরুর সমস্ত কাজ করে দিতেন। গুরুর জন্যে কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গরু চরান, তাঁর জন্যে গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আনা এই সমস্ত তাঁদের কাজ ছিল, তা তাঁরা যত বড় ধনীরই পুত্র হোন না। শরীর মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে, তাঁদের শরীরে ও মনে কোন রকম দোষ একেবারে স্পর্শ করত না। গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতা নেই, মাথায় ছাতা নেই, সাজসজ্জায় বড়মানুষী কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষালাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি দমনে, নিজের ভাল গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত।

তোমাদের সেই রকম কষ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে, সকল প্রকার বড়মানুষীকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে—কোন দোষ যেন স্পর্শ না করে। মনকে গুরু-উপদেশের সম্পূর্ণ অধীন করে রাখবে।

আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমত সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তার

পরে যা সত্য বলে জানবে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন ও ঘোষণা করবে।

আজ থেকে তোমাদের অভয় ব্রত। ধর্ম্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নাই। বিপদ না, মৃত্যু না, কষ্ট না কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্ব্বদা দিবারাত্রি প্রফুল্ল চিত্তে প্রসন্ন মুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্য লাভে ধর্ম্ম লাভে নিযুক্ত থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের পুণ্য ব্রত। যা কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয় তা সর্ব্বসযত্নে প্রাণপণে শরীর মন থেকে দূর করে প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলের মত পুণ্যে ধর্ম্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের মঙ্গল ব্রত। যাতে পরস্পরের ভাল হয় তাই তোমাদের কর্ত্তব্য। সে জন্যে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন।

এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকোবার জো নেই। তিনি তোমাদের মনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দেখচেন যখন যেখানে থাক শয়ন কর উপবেশন কর তাঁর মধ্যেই আছ তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ করচ। তোমার সর্ব্বাঙ্গে তাঁর স্পর্শ রয়েছে—তোমার সমস্ত ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয় তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।

প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ করে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে একবার উচ্চারণ কর।—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

ইহার পরে বক্তা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। সুপ্রশস্ত কাচনির্ম্মিত ব্রহ্মমন্দিরে আলোক জ্বলিয়া উঠিল। কি সুন্দর দৃশ্য। আলোকচ্ছটায় গৃহের নানা রূপ বর্ণ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে খুব কলরব। এই অবসরে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম দেবদেব।

দিনান্তে সংপ্রাপ্তস্তব চরণমূলং দিনপতেঃ
প্রপাতং সম্পশ্যন্ বসুভিরবহীনস্য মহতঃ।
বিবেকপ্রোন্মেষাৎ নিহতমদমোহোঽমধুনা
নিরাসীঃ সন্ধ্যাতুং ভুবনমহনীয়ং তব মহ।

জ্যোতির্বিহিন মহান্ দিনপতি সূর্য্যের পতন দেখিয়া (পক্ষান্তরে বসু শব্দে ধন, অর্থাৎ ধননাশে বড়লোকের পতন দেখিয়া) বিবেক জন্মিয়াছে, সেই বিবেকের বলে

মদমোহ সমস্তই উন্মুলিত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া ভুবনপূজ্য তোমার তেজ ধ্যান করিবার জন্য দিনান্তে তোমার চরণমূলে উপস্থিত হইলাম।

উপাসনার শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদি গ্রহণ করিলে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় গম্ভীর স্বরে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন। রবীন্দ্রবাবু এই রাত্রিকালে যে উপদেশ দেন তাহা সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। পরে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল এবং মহান চটচটা শব্দে বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ হইল।

মাঘ ১৮২৩ শক। পৃ. ১৪৫-১৫১

শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ।

পুরাতন বর্ষের সূর্য্য পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তে নিঃশব্দে অস্তমিত হইল। যে কয় বৎসর পৃথিবীতে কাটাইলাম অদ্য তাহারই বিদায় যাত্রার নিঃশব্দ পক্ষধ্বনি এই নির্ব্বাণালোক নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে যেন অনুভব করিতেছি। সে অজ্ঞাত সমুদ্র-পারগামী পক্ষীর মত কোথায় চলিয়া গেল তাহার আর কোন চিহ্ন নাই।

হে চিরদিনের চিরন্তন। অতীত জীবনকে এই যে আজ বিদায় দিতেছি এই বিদায়কে তুমি সার্থক কর—আশ্বাস দাও যে, যাহা নষ্ট হইল বলিয়া শোক করিতেছি তাহার সকলি যথাকালে তোমার মধ্যে সফল হইতেছে। আজি যে প্রশান্ত বিষাদ সমস্ত সন্ধ্যাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের হৃদয়কে আবৃত করিতেছে, তাহা সুন্দর হউক মধুময় হউক, তাহার মধ্যে অবসাদের ছায়ামাত্র না পড়ুক! আজ বর্ষাবসানের অবসান দিনে বিগত জীবনের উদ্দেশে আমাদের ঋষি পিতামহদিগের আনন্দময় মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারণ করি :—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ! ওঁ,

বায়ু মধু বহন করিতেছে। নদী সিন্ধু সকল মধুক্ষরণ করিতেছে। ওষধী বনস্পতি সকল মধুময় হউক! রাত্রি মধু হউক্, উষা মধু হউক্, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হউক্, সূর্য্য মধুমান্ হউক্।

রাত্রি যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জ্বল করে, তেমনি অদ্যকার বর্ষাবসান যে গত জীবনের স্মৃতির বেদনাকে সন্ধ্যার

ঝিল্লি-ঝঙ্কারসুপ্ত অন্ধকারের মত হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্ষের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বৎসরের আশামুকুলকে লালন করিয়া বিকশিত করিয়া তুলে। যাহা যায় তাহা যেন পূর্ণতার জন্য স্থান করিয়া যায়। যে বেদনা হৃদয়কে অধিকার করে তাহা যেন নব আনন্দকে জন্ম দিবার বেদনা হয়।

যে বিষাদ ধ্যানের পূর্ব্বাভাস, যে শান্তি মঙ্গল কর্ম্মনিষ্ঠার জননী, যে বৈরাগ্য উদার প্রেমের অবলম্বন, যে নির্ম্মল শোক তোমার নিকটে আত্মসমর্পণের মন্ত্রগুরু তাহাই আজিকার আসন্ন রজনীর অগ্রগামী হইয়া আমাদিগকে সন্ধ্যাদীপোজ্জ্বল গৃহপ্রত্যাগত শ্রান্ত বালকের মত অঞ্চলের মধ্যে আবৃত করিয়া লউক।

পৃথিবীতে সকল বস্তুই আসিতেছে এবং যাইতেছে—কিছুই স্থির নহে, সকলই চঞ্চল—বর্ষশেষের সন্ধ্যায় এই কথাই তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু যাহা আছে, যাহা চিরকাল স্থির থাকে, যাহাকে কেহই হরণ করিতে পারে না, যাহা আমাদের অন্তরের অন্তরে বিরাজমান—গত বর্ষে সেই ধ্রুবের কি কোন পরিচয় পাই নাই—জীবনে কি তাহার কোন লক্ষণ চিহ্নিত হয় নাই? সকলই কি কেবল আসিয়াছে এবং গিয়াছে? আজ স্তব্ধভাবে ধ্যান করিয়া বলিতেছি তাহা নহে—যাহা আসিয়াছে এবং যাহা গিয়াছে তাহার কোথাও যাইবার সাধ্য নাই, হে নিস্তব্ধ, তাহা তোমার মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে। যে তারা নিবিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে নিবে নাই, যে পুষ্প ঝরিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে বিকশিত—আমি যাহার লয় দেখিতেছি তোমার নিকট হইতে তাহা কোন কালেই চ্যুত হইতে পারে না। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে শান্ত হইয়া তোমার মধ্যে নিখিলের সেই স্থিরভাব অনুভব করি। বিশ্বের প্রতীয়মান চঞ্চলতাকে, অবসানকে, বিচ্ছেদকে আজ একেবারে ভুলিয়া যাই। গত বৎসর যদি তাহার উড্ডীন পক্ষপুটে আমাদের কোন প্রিয়জনকে হরণ করিয়া যায় তবে হে পরিণামের আশ্রয়, করযোড়ে সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমারই প্রতি তাহাকে সমর্পণ করিলাম। জীবনে যে তোমার ছিল মৃত্যুতেও সে তোমারি। আমি তাহার সহিত আমার বলিয়া যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলাম তাহা ক্ষণকালের—তাহা ছিন্ন হইয়াছে। আজ তোমারই মধ্যে তাহার সহিত যে সম্বন্ধ স্বীকার করিতেছি তাহার আর বিচ্ছেদ নাই। সেও তোমার ক্রোড়ে আছে আমিও তোমার ক্রোড়ে রহিয়াছি। অসীম জগদারণ্যের মধ্যে আমিও হারাই না, সেও হারায় নাই,—তোমার মধ্যে অতি নিকটে অতি নিকটতম স্থানে তাহার সাড়া পাইতেছি।

বিগত বৎসর যদি আমার কোন চিরপালিত অপূর্ণ আশাকে শাখাচ্ছিন্ন করিয়া থাকে তবে, হে পরিপূর্ণস্বরূপ, অদ্য নতমস্তকে একান্ত ধৈর্য্যের সহিত তাহাকে তোমার নিকটে সমর্পণ করিয়া ক্ষত-উদ্যমে পুনরায় বারিসেচন করিবার জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তুমি আমাকে পরাভূত হইতে দিয়ো না। একদিন তোমার অভাবনীয় কৃপাবলে আমার অসিদ্ধ সাধনগুলিকে অপূর্ব্বভাবে সম্পূর্ণ করিয়া স্বহস্তে সহসা আমার ললাটে স্থাপন

পূর্ব্বক আমাকে বিস্মিত ও চরিতার্থ করিবে এই আশাই আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম।

যে কোন ক্ষতি, যে কোন অন্যায়, যে কোন অবমাননা বিগত বৎসর আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া থাকুক, কার্য্যে যে কোন বাধা, প্রণয়ে যে কোনও প্রতিকূলতা দ্বারা আমাকে পীড়ন করিয়া থাক—তবু তাহাকে আমার মস্তকের উপরে তোমারই আশীষ হস্তস্পর্শ বলিয়া অদ্য তাহাকে প্রণাম করিতেছি। গত বৎসরের প্রথম দিন নীরব স্মিতমুখে তাহার বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে তোমার নিকট হইতে আমার জন্য কি লইয়া আসিয়াছিল সে দিন তাহা আমাকে জানায় নাই—আমাকে কি যে দান করিল আজ তাহাও আমাকে বলিয়া গেল না, মুখ আবৃত করিয়া নিঃশব্দ পদে চলিয়া গেল। দিনে রাত্রিতে আলোকে অন্ধকারে তাহার সুখ দুঃখের দূতগুলি আমার হৃদয়গুহাতলে কি সঞ্চিত করিয়া গেল সে সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রম আছে, আমি নিশ্চয় কিছুই জানি না,—একদিন তোমার আদেশে ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে যাহা দেখিব তাহার জন্য আগে হইতেই অদ্য সন্ধ্যায় বর্ষাবসানকে ভক্তির সহিত প্রণতি করিয়া কৃতজ্ঞতার বিদায় সম্ভাষণ জানাইতেছি!

এই বর্ষশেষের শুভ সন্ধ্যায় হে নাথ, তোমার ক্ষমা মস্তকে লইয়া সকলকে ক্ষমা করি, তোমার প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিয়া সকলকে প্রীতি করি, তোমার মঙ্গলভাব ধ্যান করিয়া সকলের মঙ্গল কামনা করি! আগামী বর্ষে যেন ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করি, বীর্য্যের সহিত কর্ম্ম করি, আশার সহিত প্রতীক্ষা করি, আনন্দের সহিত ত্যাগ করি এবং ভক্তির সহিত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করি!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শান্তিনিকেতনে নববর্ষ।

যে অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি, দিন এবং রাত্রি, পক্ষ এবং মাস, ঋতু এবং সম্বৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে তিনি অদ্য নববর্ষের প্রথম প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শের দ্বারা তিনি তাঁহার জ্যোতির্লোকে তাঁহার আনন্দলোকে আমাদিগকে নববর্ষের আহ্বান প্রেরণ করিলেন। তিনি এখনি কহিলেন, পুত্র, আমার এই নীলাম্বরবেষ্টিত তৃণধান্যশ্যামল ধরণীতলে তোমাকে জীবন ধারণ করিতে বর দিলাম—তুমি আনন্দিত হও, তুমি বল লাভ কর।

প্রান্তরের মধ্যে পুণ্যনিকেতনে নববর্ষের প্রথম নির্ম্মল আলোকের দ্বারা আমাদের অভিষেক হইল। আমাদের নবজীবনের অভিষেক। মানবজীবনের যে মহোচ্চ সিংহাসনে বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে বসিতে স্থান দিয়াছেন তাহা আজ ,আম্রা

নবগৌরবে অনুভব করিব। আমরা বলিব, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, এই যে অরুণরাগরক্ত নীলাকাশের তলে আমরা জাগ্রত হইলাম আমরা ধন্য! এই যে চিরপুরাতন অন্নপূর্ণা বসুন্ধরাকে আমরা দেখিতেছি আমরা ধন্য! এই যে গীতগন্ধবর্ণস্পন্দনে আন্দোলিত বিশ্বসরোবরের মাঝখানে আমাদের চিত্তশতদল জ্যোতিপরিপ্লাবিত অনন্তের দিকে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে আমরা ধন্য! অদ্যকার প্রভাতে এই যে জ্যোতির্ধারা আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে ইহার মধ্যে তোমার অমৃত আছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব ;—এই যে বৃষ্টিধৌত বিশাল পৃথিবীর বিস্তীর্ণ শ্যামলতা ইহার মধ্যে তোমার অমৃত ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব, এই যে নিশ্চল মহাকাশ আমাদের মস্তকের উপর তাহার স্থির হস্ত স্থাপন করিয়াছে তাহা তোমারই অমৃতভারে নিস্তব্ধ, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব।

এই মহিমান্বিত জগতে অদ্যকার নববর্ষ দিন আমাদের জীবনের মধ্যে যে গৌরব বহন করিয়া আনিল, এই পৃথিবীতে বাস করিবার গৌরব, এই আলোকে বিচরণ করিবার গৌরব, এই আকাশতলে আসীন হইবার গৌরব তাহা যদি পরিপূর্ণভাবে চিত্তের মধ্যে গ্রহণ করি তবে আর বিষাদ নাই, নৈরাশ্য নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই! তবে সেই ঋষিবাক্য বুঝিতে পারি

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত কেই বা প্রাণধারণ করিত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিতেন! আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তিনি আনন্দিত তাই আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত, আমার রক্ত প্রবাহিত, আমার চেতনা তরঙ্গিত। তিনি আনন্দিত তাই সূর্য্যলোকের বিরাট যজ্ঞহোমে অগ্নি-উৎস উৎসারিত ; তিনি আনন্দিত তাই পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া তৃণদল সমীরণে কম্পিত হইতেছে, তিনি আনন্দিত তাই গ্রহে নক্ষত্রে আলোকের অনন্ত উৎসব। আমার মধ্যে তিনি আনন্দিত তাই আমি আছি—তাই আমি গ্রহ তারকার সহিত লোকলোকান্তরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—তাঁহার আনন্দে আমি অমর, সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার সমান মর্য্যাদা।

তাঁহার প্রতি নিমেষের ইচ্ছাই আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের অস্তিত্ব, আজ নববর্ষের দিনে এই কথা যদি উপলব্ধি করি—আমাদের মধ্যে তাঁহার অক্ষয় আনন্দ যদি স্তব্ধ গভীরভাবে অন্তরে উপভোগ করি—তবে সংসারের কোন বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর মনে করিয়া অভিভূত হইব না—কারণ, ঘটনাবলী তাহার সুখ দুঃখ বিরহ মিলন লাভ ক্ষতি জন্ম মৃত্যু লইয়া আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে ও অপসারিত হইয়া যায়। বৃহত্তম বিপদই বা কত দিনের, মহত্তম দুঃখই বা কতখানি, দুঃসহতম বিচ্ছেদই বা আমাদের কতটুকু হরণ করে—তাঁহার আনন্দ থাকে ; দুঃখ সেই আনন্দেরই রহস্য, মৃত্যু সেই আনন্দেরই রহস্য। এই রহস্য ভেদ না করিতে পারি নাই পারিলাম—আমাদের বোধশক্তিতে এই শাশ্বত আনন্দ এত বিপরীত আকারে এত

বিবিধভাবে কেন প্রতীয়মান হইতেছে তাহা নাই জানিলাম—কিন্তু ইহা যদি নিশ্চয় জানি এক মুহূর্ত্ত সর্ব্বত্র সেই পরিপূর্ণ আনন্দ না থাকিলে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ছায়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়—যদি জানি,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তবে আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন
নিজের মধ্যে ও নিজের বাহিরে সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কোন অবস্থাতেই আর ভয় পাওয়া যায় না।

স্বার্থের জড়তা এবং পাপের আবর্ত্ত ব্রহ্মের এই নিত্যবিরাজমান আনন্দের অনুভূতি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে। তখন সহস্র রাজা আমাদের নিকট হইতে করগ্রহণে উদ্যত হয়, সহস্র প্রভু আমাদিগকে সহস্র কাজে চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান করে। তখন যাহা কিছু আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই বড় হইয়া উঠে—তখন সকল বিরহই ব্যাকুল, সকল বিপদই বিভ্রান্ত করিয়া তোলে—সকলকেই চূড়ান্ত বলিয়া ভ্রম হয়। লোভের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেই মনে হয় তাহাকে না পাইলে নয়, বাসনার বিষয় উপস্থিত হইলেই মনে হয় ইহাকে পাইলেই আমার চরম সার্থকতা। ক্ষুদ্রতার এই সকল অবিশ্রাম ক্ষোভে ভূমা আমাদের নিকটে অগোচর হইয়া থাকেন, এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদিগকে প্রতিপদে অপমানিত করিয়া যায়।

সেই জন্যই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে,

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও ;—প্রতি নিমেষের খণ্ডতা হইতে তোমার অনন্ত পরিপূর্ণতার মধ্যে আমাকে উপনীত কর ;—অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও ;—অহঙ্কারের যে অন্তরাল, বিশ্বজগৎ আমার সম্মুখে যে স্বাতন্ত্র্য লইয়া দাঁড়ায়, আমাকে এবং জগৎকে তোমার ভিতর দিয়া না দেখিবার যে অন্ধকার তাহা হইতে আমাকে মুক্ত কর ; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও ;—আমার প্রবৃত্তি আমাকে মৃত্যুদোলায় চড়াইয়া দোল দিতেছে, মুহূর্ত্তকাল অবসর দিতেছে না ; আমার মধ্যে আমার ইচ্ছাগুলাকে খর্ব্ব করিয়া আমার মধ্যে তোমার আনন্দকে প্রকাশমান কর, সেই আনন্দই অমৃতলোক।

আজিকার নববর্ষ দিনে ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা। সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য আমরা করপুট করিয়া দাঁড়াইয়াছি! বলিতেছি—আবিরাবীর্ম্মএধি! হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও! অন্তরে বাহিরে তুমি উদ্ভাসিত হইলেই, প্রবৃত্তির দাসত্ব, জগতের দৌরাত্ম্য কোথায় চলিয়া যায়—তখন তোমার মধ্যে সমস্ত দেশকালের একটি অনবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্য একটি পরিপূর্ণ সমাপ্তি দেখিয়া সুগভীর শান্তির মধ্যে আমরা নিমগ্ন ও নিস্তব্ধ হইয়া যাই। তখন, যে চেষ্টাহীন বলে সমস্ত জগৎ সহজে বিধৃত তাহা আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, যে চেষ্টাহীন সৌন্দর্য্যে নিখিল ভুবন

পরস্পর গ্রথিত তাহা আমাদের জীবনে আবির্ভূত হয়। তখন আমি যে তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি এ কথা মনে থাকে না—তোমার সমস্ত জগতের একসঙ্গে তুমিই আমাকে লইতেছ এই কথাই আমার মনে হয়।

সেই স্বপ্রকাশ যত দিন না আমাদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিবেন ততদিন যেন নিজের ভিতর হইতে তাঁহার দিকে বাহির হইবার একটা দ্বার উন্মুক্ত থাকে। সেই পথ দিয়া প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া আসিতে পারি। আমাদের জীবনের একটা দিনের সহিত আর একটা দিনের যে বন্ধন সে যেন শুধু স্বার্থের বন্ধন না হয়, জড় অভ্যাসসূত্রের বন্ধন না হয়—একটা বৎসরের সহিত আর একটা বৎসরকে যেন প্রাত্যহিক নিবেদনের দ্বারা তাঁহারই সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারি। এমন কোন সূত্রে যেন মানবজীবনের দুর্লভ মুহূর্ত্তগুলিকে না বাঁধিতে থাকি যাহা মৃত্যুর স্পর্শমাত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়! জীবনের যে বৎসরটা গেছে তাহা পূজার পদ্মের ন্যায় তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে পারি নাই—তাহার তিন শত পঁয়ষট্টি দল দিনে দিনে ছিন্ন করিয়া লইয়া পঙ্কের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছি। অদ্য বৎসরের অনুদ্‌ঘাটিত প্রথম মুকুল সূর্য্যের আলোকে মাথা তুলিয়াছে ইহাকে আমরা খণ্ডিত করিব না, সৌন্দর্য্যে, সৌগন্ধ্যে, শুভ্রতায় ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিব। তাহা কখনই অসাধ্য নহে—সে শক্তি আমাদের মধ্যে আছে—নাত্মানমবমন্যেত—নিজেকে অপমান অবজ্ঞা করিয়ো না!

ন হ্যাত্মপরিভূতস্য ভূতির্ভবতি শোভ়না।

আপনাকে যে ব্যক্তি দীন বলিয়া অপমান করে তাহার কখনই শোভন ঐশ্বর্য্য লাভ হয় না।

ধর্ম্মের যে আদর্শ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যে আদর্শে ব্রহ্মের জ্যোতি বিশুদ্ধভাবে প্রতিফলিত হয়, তাহা কল্পনাগম্য অসাধ্য নহে, তাহা রক্ষা করিবার তেজ আমাদের মধ্যে আছে ;— নিজেকে জাগ্রত রাখিবার শক্তি আমাদের আছে ;—এবং জাগ্রত থাকিলে অন্যায় অসত্য হিংসা ঈর্ষা প্রলোভন দ্বারের নিকটে আসিয়া দূরে চলিয়া যায়। আমরা ভয় ত্যাগ করিতে পারি, হীনতা পরিহার করিতে পারি, আমরা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি— এ ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের আছে। কেবল দীনতায় সেই শক্তিকে অবিশ্বাস করি বলিয়া তাহাকে ব্যবহার করিতে পারি না। সেই শক্তি আমাদিগকে কি ভূমানন্দে কি চরম সার্থকতায় লইয়া যাইতে পারে তাহা জানি না বলিয়াই আত্মার সেই শক্তিকে আমরা স্বার্থে এবং ব্যর্থ চেষ্টায় এবং পাপের আয়োজনে নিযুক্ত করি। মনে করি অর্থ লাভেই আমাদের চরম সুখ, বাসনাতৃপ্তিতেই আমাদের পরমানন্দ, ইচ্ছার বাধা মোচনেই আমাদের পরম মুক্তি। আমাদের যে শক্তি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহাকে একাগ্রধারায় ব্রহ্মের দিকে প্রবাহিত করিয়া দিলে জীবনের কর্ম্ম সহজ হয়, সুখ দুঃখ সহজ হয়, মৃত্যু সহজ হয়। সেই শক্তি আমাদিগকে বর্ষার স্রোতের মত অনায়াসেই

বহন করিয়া লইয়া যায় ; দুঃখ শোক, বিপদ আপদ, বাধা বিঘ্ন, তাহার পথের সম্মুখে শরবনের মত মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না।

পুনর্ব্বার বলিতেছি, এই শক্তি আমাদের মধ্যে আছে ; কেবল, চারিদিকে ছড়াইয়া আছে বলিয়াই তাহার উপর নিজের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া গতিলাভ করিতে পারি না। নিজেকে প্রত্যহ নিজেই বহন করিতে হয়। প্রত্যেক কাজ আমাদের স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়ে ; প্রত্যেক কাজের আশা নৈরাশ্য লাভ ক্ষতির সমস্ত ঋণ নিজেকে শেষ কড়া পর্য্যন্ত শোধ করিতে হয়। স্রোতের উপর যেমন মাঝির নৌকা থাকে এবং নৌকার উপরেই তাহার সমস্ত বোঝা থাকে তেমনি ব্রহ্মের প্রতি যাঁহার চিত্ত একাগ্রভাবে ধাবমান, তাঁহার সমস্ত সংসার এই পরিপূর্ণ ভাবের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায় এবং কোন বোঝা তাঁহার স্কন্ধকে পীড়িত করে না।

নববর্ষের প্রাতঃসূর্য্যালোকে দাঁড়াইয়া অদ্য আমাদের হৃদয়কে চারিদিক হইতে আহ্বান করি!—ভারতবর্ষের যে পৈতৃক মঙ্গল শঙ্খ গৃহের প্রান্তে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া আছে সমস্ত প্রাণের নিশ্বাস তাহাতে পরিপূর্ণ করি—সেই মধুর গম্ভীর শঙ্খধ্বনি শুনিলে আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত অহঙ্কার হইতে স্বার্থ হইতে বিলাস হইতে প্রলোভন হইতে ছুটিয়া আসিবে। আজ শতধারা একধারা হইয়া গোমুখীর মুখনিঃসৃত সমুদ্রবাহিনী গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইবে—তাহা হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রান্তরশায়ী এই নির্জ্জন তীর্থ যথার্থই হরিদ্বার তীর্থ হইয়া উঠিবে।

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, অদ্য নববর্ষের প্রভাতে তোমার জ্যোতিঃস্নাত তরুণ সূর্য্য পুরোহিত হইয়া নিঃশব্দে আমাদের আলোকের অভিষেক সম্পন্ন করিল। আমাদের ললাটে আলোক স্পর্শ করিয়াছে। আমাদের দুই চক্ষু আলোকে ধৌত হইয়াছে। আমাদের পথ আলোকে রঞ্জিত হইয়াছে। আমাদের সদ্যোজাগ্রত হৃদয় ব্রতগ্রহণের জন্য তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়াছে। যে শরীরকে অদ্য তোমার সমীরণ স্পর্শ করিল তাহাকে যেন প্রতিদিন পবিত্র রাখিয়া তোমার কর্ম্মে নিযুক্ত করি! যে মস্তকে তোমার প্রভাতকিরণ বর্ষিত হইল সে মস্তককে ভয় লজ্জা ও হীনতার অবনতি হইতে রক্ষা করিয়া তোমারই পূজায় প্রণত করি! তোমার নামগানধারা আজ প্রত্যূষে যে হৃদয়কে পুণ্যবারিতে স্নান করাইল, সে যেন আনন্দে পাপকে পরিহার করিতে পারে, আনন্দে তোমার কল্যাণকল্পে জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারে, আনন্দে দারিদ্র্যকে ভূষণ করিতে পারে, আনন্দে দুঃখকে মহীয়ান করিতে পারে, এবং আনন্দে মৃত্যুকে অমৃতরূপে বরণ করিতে পারে। আজিকার প্রভাতকে কালি যেন বিস্মৃত না হই! প্রতিদিনের প্রাতঃসূর্য্য যেন আমাদিগকে লজ্জিত না দেখে ; তাহার নির্ম্মল আলোক আমাদের নির্ম্মলতার, তাহার তেজ আমাদের তেজের সাক্ষী হইয়া যায়—এবং প্রতি সন্ধ্যাকালে আমাদের প্রত্যেক দিনটিকে নির্ম্মল অর্ঘ্যের ন্যায় তাহার রক্তিম স্বর্ণথালীতে বহন করিয়া তোমার সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপন করিতে পারে। হে পিতা, আমার মধ্যে নিয়তকাল তোমার

যে আনন্দ স্তব্ধ হইয়া আছে, যে আনন্দে তুমি আমাকে নিমেষকালও পরিত্যাগ কর নাই, যে আনন্দে তুমি আমাকে জগতে জগতে রক্ষা করিতেছ, যে আনন্দে সূর্য্যোদয় প্রতিদিনই আমার নিকটে রমণীয়, যে আনন্দে অজ্ঞাত ভুবন আমার আত্মীয়, অগণ্য নক্ষত্র আমার সুপ্তরাত্রির মণিমাল্য, যে আনন্দে জন্মমাত্রেই আমি বহুলোকের প্রিয় পরিচিত, সমস্ত অতীত মানবের মনুষ্যত্বের উত্তরাধিকারী, যে আনন্দে দুঃখ নৈরাশ্য বিপদ মৃত্যু কিছুই লেশমাত্র নিরর্থক নহে,—আমি যেন প্রবৃত্তির ক্ষোভে পাপের লজ্জায় আমার মধ্যে তোমার সেই আনন্দ-মন্দিরের দ্বার নিজের নিকটে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া পথের পঙ্কে যদৃচ্ছা লুণ্ঠিত হওয়াকেই আমার সুখ আমার স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম না করি! জগৎ তোমার জগৎ, আলোক তোমার আলোক, প্রাণ তোমার নিঃশ্বাস, এই কথা স্মরণে রাখিয়া জীবনধারণের যে পরম পবিত্র গৌরব তাহার অধিকারী হই, অস্তিত্বের যে অপার অজ্ঞেয় রহস্য তাহা বহন করিবার উপযুক্ত হই—এবং প্রতিদিন তোমাকে এই বলিয়া ধ্যান করি :—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।
বিশ্বসবিতা এই সমস্ত ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোককে যেমন প্রত্যেক নিমেষেই প্রকাশের মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন—তেমনি তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রতি নিমেষে প্রেরণ করিতেছেন—তাঁহার প্রেরিত এই জগৎ দিয়া সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি—তাঁহার প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়া সেই চেতনস্বরূপকে ধ্যান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জ্যৈষ্ঠ ১৮২৪ শক। পৃ. ২২-২৯

নববর্ষের চিন্তা।

বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিদিনই নূতন, কিন্তু তাহাকে প্রত্যহ নূতন করিয়া অনুভব করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমাদের পরমায়ু অল্পই, কিন্তু আমরা বিশ্বের চেয়েও যেন প্রাচীন। একটা সেকালের দিঘী যেমন তাহার ভাঙাঘাটে ও শৈবাল-দলে গঙ্গার চেয়ে প্রাচীন, তেমনি যে জগতে দুদিনমাত্র জন্মিয়াছি, সেই চিরদিনের জগতের চেয়ে আমরা পুরাতন। প্রকৃতি একই সূর্য্য লইয়া কোটি বৎসর প্রত্যহ তাহার প্রভাত রচনা করিয়া আসিতেছে, একই নক্ষত্রমণ্ডলী অসংখ্যযুগ ধরিয়া তাহার প্রতিরাত্রের সভাসজ্জা সম্পাদন করিতেছে, নূতনত্বের চেষ্টামাত্রকে সে অবজ্ঞা করে, সে তাহার প্রাত্যহিক কর্ম্মে এবং চিন্তায় প্রত্যহই জরাজীর্ণ হইতে থাকে, সে নিজের প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তিতে প্রত্যহই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। নূতনত্বের জন্য আমাদিগকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়,

খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, কত উদ্‌যোগ আয়োজন করিতে হয়—আমরা এতই ভয়ানক পুরাতন হইয়া পড়ি,—আমাদের স্পর্শে নবীনত্বের মধ্যে জরা সংক্রান্ত হয়।

সেইজন্য প্রকৃতিতে বর্ষারম্ভের কোন বিশেষ দিন না থাকিলেও, মানুষ একটানা ভাবে বহন করিতে চায় না—জীবনটাকে যেন নূতন নূতন পরিচ্ছদে মাঝে মাঝে নূতন করিয়া আরম্ভ করিলাম, এইরূপ কল্পনা করিতে ইচ্ছা হয়।

পৃথিবী গত বৎসরের ১লা বৈশাখ হইতে এ বৎসরের ১লা বৈশাখে সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল, ইহা তাহার পক্ষে কোন সংবাদই নহে। এখানে তাহার কোন ছেদ নাই। আমাদেরও জীবনে ১লা বৈশাখে কোন ছেদ পড়ে নাই। জীবনের ধারা কালি হইতে আজিকার মধ্যে সমানভাবেই গড়াইয়া আসিতেছে, কর্ম্মের স্রোতে আপনার চিরাভ্যস্ত পথে স্থির হইয়া দাঁড়ায় নাই, তবু ক্লান্ত মন আজিকার এই একদিনকে বিশেষ দিন নাম দিয়া প্রত্যহের এই বোঝাটাকে বহিবার জন্য নূতন বল অন্বেষণ করিতেছে।

ইহার বিশেষ কারণ আছে। অভ্যাসের বেগ আমাদের অন্ধভাবে ঠেলিয়া লইয়া যায়—প্রাত্যহিক কাজের ভারে মৃত্যুর ঢালু রাস্তার দিকে আমরা গড়াইয়া চলিয়া যাই—নিজের কর্ত্তৃত্বগৌরব অনুভব করিবার অবসর পাই না। নববর্ষের দিনে সেই অন্ধগতির মুখে একটা বাধার মত দিয়া অভ্যস্ত কর্ম্মচালিত মন নিজেকে স্বতন্ত্র জাগ্রতভাবে একবার অনুভব করিয়া লইতে চায়। সে গর্ব্বের সহিত বলে, আজ হইতে আমি নববর্ষ আরম্ভ করিলাম, আমি নূতন সালের পথে যাত্রা করিয়া চলিলাম, এই বলিয়া ২রা বৈশাখের দিনে সে পুনরায় আপনার কোচবাক্সের উপর আরামে ঘুমাইয়া পড়ে এবং চিরাভ্যাস জরাজীর্ণ গর্দ্দভের মত বিনা বল্গায় বিনা চালনায় দিবারাত্রি তাহার রথ টানিয়া মৃত্যুর দিকে চলিতে থাকে।

যে প্রাত্যহিক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আমাদের মনের উপরেও কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে, মন নববর্ষের দিনে বৈরাগ্যের ছায়াপাত করিয়া সেই কর্ম্মকে ছোট করিয়া দেখিবার চেষ্টা করে। বলে, মৃত্যুতে সকল কর্ম্মের অবসান হইবে, নববর্ষ সেই খবর দিতে আসিয়াছে। বলে, "গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে"—বলে, "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।"—বলে, এই যে ধনজনমানের জন্য বৎসর বৎসর খাটিয়া মরিতেছ, একটি বৎসর আসিবে, যে সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তোমাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিয়া দিবে। হয়ত এই-ই সেই বৎসর, কে বলিতে পারে? মন তাই উপদেশ দেয়, কর্ম্মস্তূপের দ্বারা মনের জীবনকে, কর্ম্মের গতির দ্বারা মনের গতিকে নাশ করিয়ো না।

যখন নগরের কর্ম্মশালার মধ্যে বাস করিতাম, তখন নববর্ষে সভা ডাকিয়া আমরা এই কথা চিন্তা করিয়াছি। তখন মৃত্যুর কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ করা আমাদের প্রয়োজন ছিল,—কারণ, সেখানে কর্ম্ম আমাদিগকে একেবারে চারিদিকে চাপিয়া থাকে, নিশ্বাস ফেলিতে দেয় না। মৃত্যুর ভাব সেই নিবিড় কর্ম্মকে খর্ব করিয়া সেই চারিদিকে বৃহৎ অবকাশ রচনা করিয়া দেয়—মৃত্যু সেই কর্ম্মকারাগারের মধ্যে জানলা

কাটিয়া অবরুদ্ধ অনন্তকে প্রকাশিত করে। বর্ষারম্ভের প্রভাত-আলোক হইতে বর্ণচ্ছটাবিহীন শুভ্র বৈরাগ্য-রশ্মি আকর্ষণ করিয়া আমাদের চারিদিকের যাহা কিছু ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, জীর্ণ, তাহারই ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, জীর্ণতা প্রত্যক্ষ করি, এবং তাহারই একাধিপত্য হইতে মনকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করি।

এবারে ভাগ্যক্রমে যেখানে আছি, সেখানে অভ্রভেদী কর্ম্মস্তূপের মধ্যে ছিদ্র করিয়া বর্ষারম্ভের দিনকে কেবল একদিনের অভ্যাগতের মত আমাদের ঘরের মধ্যে ডাকিয়া আনিতে হয় না। এখানে আমরাই সনাতন নববর্ষের বিপুলপ্রাসাদে অতিথিরূপে সমবেত।

উন্মুক্তদ্বার প্রাসাদ এই-যে আমাদের চারিদিকেই। বিরলতৃণ অনুর্ব্বর মাঠ কোথায় চলিয়া গেছে! তাহার অবাধ বিস্তৃত নতোন্নত ভঙ্গিমার নিশ্চল বৈচিত্র্য অনুসরণ করিতে করিতে দুই চক্ষু আকাশের পাখীর মত সুদূর দিক্‌প্রান্তের নীলাভ কুহেলিকার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া লুপ্ত করিয়া ফেলে। এই মাঠ দিগম্বর রুদ্রদেবের মত রিক্ত ;— শূন্যতাই ইহার মহৎ ঐশ্বর্য্য। মাঝে মাঝে কাঁটা-গুল্ম, খর্ব্বখেজুর ও বল্মীকস্তূপে এই মাঠের অনুর্ব্বরতার সাক্ষ্য দিতেছে, ইহার সম্পূর্ণ অনাবশ্যকতার গৌরব প্রমাণ করিতেছে। শস্য প্রভৃতি মানুষের ক্ষুদ্র কাম্যবস্তু হইতে এই প্রকাণ্ড ভূখণ্ড নিজেকে এমনি নির্ম্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে ইহার কাছে শূন্য বিস্তীর্ণ ইহাকে ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করিবার নাই। এখানে দুঃসহদীপ্তি বৈশাখ তাহার অখণ্ড রুদ্রভাবে একাকী আসিয়া দণ্ডায়মান হয় ; তাহার কোন কাজ—কোন প্রয়োজন নাই ; সে ফলে পাক ধরাইতে বা মৌমাছির মধুভাণ্ডার পূর্ণ করিতে আসে না। ঘনঘোর শ্যামল শ্রাবণ বিদ্যুচ্চকিত দিগ্‌দিগন্তরে তাহার বিপুল সমারোহ প্রসারিত করিয়া গম্ভীর মেঘগর্জ্জনে এখানে আবির্ভূত হয়—শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করিবার জন্য নহে ;—তাহার নববারিধারা গৈরিকবসনা মুনিকন্যাদের মত এই বিশাল নির্জ্জনতার মধ্যে আঁকাবাঁকা চিত্র কাটিয়া, গহ্বর খুদিয়া, বালি ও নুড়ির স্তূপ রচনা করিয়া, কলহাস্যে অকারণ খেলা খেলিয়া যায়। ঋতুপর্য্যায় এখানে ঘরের ছেলের মত আসে, কাহারো কোন কাজ করিতে নহে— নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে বিরাজ করিতে।

এই প্রয়োজনহীন বিপুল রিক্ততার মাঝখানে আমাদের স্নিগ্ধচ্ছায় আশ্রমটি। চারিদিকের এত-বড় বৃহৎ অবকাশের দ্বারা আমাদের আশ্রমশ্রী নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। শিবের সুবিশাল দারিদ্র্যের মাঝখানে অন্নপূর্ণা যেমন নিজের ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট করেন, সেইরূপ। পরস্পরকে পরস্পরের একান্ত প্রয়োজন ছিল—শ্যামলা আশ্রমলক্ষ্মী এই রক্তপাংশুমণ্ডিত শূন্যহস্ত উদাসীনকে বহুবর্ষ-তপস্যা দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং পূর্ণতা দান করিয়াছে।

এই আশ্রমের মধ্যে তরুলতা আজ নবপল্লবে বিকশিত, আম্রবন এতকাল মুকুলগন্ধে বাতাসকে পাগল করিয়া দিয়া আজ তরুণফলভারে সার্থক। আমলকীশ্রেণী

তাহার গত বৎসরের গর্ব্ভভার মোচন করিয়া নবকিসলয়ে নবযৌবন লাভ করিয়াছে। শিরীষের গাছে ফুল ধরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। জামের মঞ্জরী শাখা পরিপূর্ণ করিয়া মুখর মৌমাছির দস্যুবৃত্তিতে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে।

এখানে কর্ম্মের ক্ষুদ্রতা, কালের অনিত্যতা, জীবনের অনিশ্চয়তা, সুখদুঃখের চাঞ্চল্য—এই সমস্ত কথা আলোচনা করিবার নহে। নিজের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও দীনতার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া বিলাপ-পরিতাপ করিবার জন্য এখানে আসি নাই। এখানে নূতনতার নিস্তব্ধ সমুদ্রের মধ্যে অবগাহন করিয়া লইব। এখানে কালিও যে নূতন ছিল, আজিও সেই নূতনই রহিয়াছে, কেবল আজ প্রভাতে আমাদের চিন্তাকীটজীর্ণ জীবনযাত্রার অতি ক্ষুদ্র প্রাচীনত্বটাকে ক্ষণকালের জন্য সরাইয়া দিয়া সেই যুগযুগান্তরের অবসানহীন নবীনতার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর লইয়াছি।

আমাদের ক্লান্তজীবনে যখন নূতনত্ব খুঁজি, তখন ক্রমাগত বৈচিত্র্য এবং উত্তেজনার আশ্রয় লইয়া থাকি। সেই অবিশ্রাম চাঞ্চল্য আমাদিগকে কেবলি নবতর ক্লান্তি ও জরার দিকেই অগ্রসর করিয়া দেয়। বৈচিত্র্যের খণ্ডখণ্ড ক্ষুদ্রক্ষুদ্র মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে গ্রহণ ও বর্জ্জন করিয়া সেই আবর্জ্জনার মধ্যে অন্তঃকরণকে কবর দেওয়া হয়।

আজ চিরনূতনের রহস্য এই প্রান্তরবাসিনী প্রকৃতির কাছে শিক্ষা করিয়া লইব।

অধুনা আমাদের কাছে কর্ম্মের গৌরব অত্যন্ত বেশি। হাতের কাছে হৌক—দূরে হৌক, দিনে হৌক—দিনের অবসানে হৌক, কর্ম্ম করিতে হইবে। কি করি, কি করি—কোথায় মরিতে হইবে—কোথায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে, ইহাই অশান্ত চিত্তে আমরা খুঁজিতেছি। য়ুরোপে লাগাম-পরা অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা। কাজ, অকাজ, অকারণ কাজ, যে উপায়েই হৌক, জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া—মাতামাতি করিয়া মরিতে হইবে। এই কর্ম্মনাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা যখন এক একটা জাতিকে পাইয়া বসে, তখন পৃথিবীতে আর শান্তি থাকে না। তখন দুর্গম হিমালয় শিখরে যে লোমশ ছাগ এতকাল নিরুদ্বেগে জীবন বহন করিয়া আসিতেছে, তাহারা অকস্মাৎ শিকারীর গুলিতে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে। বিশ্বস্তচিত্ত সীল এবং পেঙ্গয়িন্ পক্ষী এতকাল জনশূন্য তূষার-মরুর মধ্যে নির্ব্বিরোধে প্রাণধারণ করিবার সুখটুকু ভোগ করিয়া আসিতেছিল,—অকলঙ্ক শুভ্রনীহার হঠাৎ সেই নিরীহ প্রাণীদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে। কোথা হইতে বণিকের কামান শিল্পনিপুণ প্রাচীন চীনের কণ্ঠের মধ্যে অহিফেনের পিণ্ড বর্ষণ করিতে থাকে,—এবং আফ্রিকায় নিভৃত আর্ত্তস্বরে প্রাণত্যাগ করে।

এখানে আশ্রমে নির্ম্মল প্রকৃতির মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিলে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে। প্রকৃতিতে কর্ম্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই কর্ম্মটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। প্রকৃতির মুখের দিকে যখনি চাই, দেখি, সে অক্লিষ্ট—অক্লান্ত যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে

সাজগোজ করিয়া বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসনগ্রহণ করিয়াছে। এই নিখিলগৃহিণীর রান্নাঘর কোথায়, ঢেঁকিশালা কোথায়, কোন ভাণ্ডারের স্তরে স্তরে ইঁহার বিচিত্র আকারের ভাণ্ড সাজানো রহিয়াছে? ইঁহার দক্ষিণ হস্তের হাতাবেড়িগুলিকে আভরণ বলিয়া ভ্রম হয়, ইঁহার কাজকে লীলার মত মনে হয়, ইঁহার চলাকে নৃত্য এবং চেষ্টাকে ঔদাসীন্যের মত জ্ঞান হয়। ঘূর্ণ্যমান চক্রগুলিকে নিম্নে গোপন করিয়া, স্থিতিকেই গতির ঊর্দ্ধে রাখিয়া, প্রকৃতি আপনাকে নিত্যকাল প্রকাশমান রাখিয়াছে—উর্ধ্বশ্বাস কর্ম্মের বেগে নিজেকে অস্পষ্ট এবং সঞ্চীয়মান কর্ম্মের স্তূপে নিজেকে আচ্ছন্ন করে নাই।

এই কর্ম্মের চতুর্দ্দিকে অবকাশ, এই চাঞ্চল্যকে ধ্রুবশান্তির দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখা,—প্রকৃতির চিরনবীনতার ইহাই রহস্য। কেবল নবীনতা নহে ইহাই তাহার বল।

ভারতবর্ষ তাহার তপ্ততাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্কধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জ্বলজ্জট বিরাট মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কর্ম্মের ক্রীতদাস নহে।

সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়—তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্মকে বড় করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্ম্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্ম্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্ম্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্যমাত্র।

বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের এই প্রাচীন স্তব্ধতা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা আমি মনে করি না। ইহাতে আমাদের শক্তিক্ষয় হইতেছে। ইহাতে প্রতিদিন আমাদের নিষ্ঠা বিচলিত, আমাদের চরিত্র ভগ্ন-বিকীর্ণ, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত এবং আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কার্য্যপ্রণালী অতি সহজ-সরল, অতি প্রশান্ত, অথচ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তাহাতে আড়ম্বর মাত্রেরই অভাব ছিল, তাহাতে শক্তির অনাবশ্যক অপব্যয় ছিল না। সতী স্ত্রী অনায়াসেই স্বামীর চিতায় আরোহণ করিত, সৈনিক সিপাহী অকাতরেই চানা চিবাইয়া লড়াই করিতে যাইত, আচার রক্ষার জন্য সকল অসুবিধা বহন করা, সমাজ রক্ষার জন্য চূড়ান্ত দুঃখ ভোগ করা এবং ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা, তখন অত্যন্ত সহজ ছিল। নিস্তব্ধতার এই ভীষণ শক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো সঞ্চিত হইয়া আছে; আমরা নিজেই ইহাকে জানি না। দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষা-চঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে, এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, এই মৃত্যুভয়হীন

আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্ম্মরক্ষার দৃঢ়ত্ব দান করিয়াছে। শান্তির মর্ম্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। বহু দুর্গতির মধ্যে বহুশতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থির শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠ শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে আপন বরাভয়হস্ত প্রসারিত করিবে, ইংরাজি কোর্ত্তা, ইংরাজের দোকানের আসবাব, ইংরাজি মাষ্টারের বাক্‌ভঙ্গিমার অবিকল নকল কোথাও থাকিবে না, কোন কাজেই লাগিবে না। আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না,—জানিতে পারিতেছি না, ইংরাজি স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পট্টতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না,—তাহা আমাদের নদীতীরে, রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ, ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী—তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবলের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্‌গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব, ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে ;—যখন ঝড়ের গর্জ্জনে অতিবিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণ-ঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ—তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন—তাহাকে অবিশ্বাস করিব না,—যাহা বিদেশের বিপুল বিলাস সামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না ; করযোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।

আজি নববর্ষে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের আর একটি ভাব আমরা হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব। তাহা ভারতবর্ষের একাকিত্ব। এই একাকিত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জ্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুরূহ। পিতামহগণ এই একাকিত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত-রামায়ণের ন্যায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

সকল দেশেই একজন অচেনা বিদেশী পথিক অপূর্ব্ব বেশভূষায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্থানীয় লোকের কৌতূহল যেন উন্মত্ত হইয়া উঠে—তাঁহাকে ঘিরিয়া, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া, আঘাত করিয়া, সন্দেহ করিয়া ব্বিব্রত করিয়া তোলে। ভারতবাসী অতি সহজে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে—তাহার দ্বারা আহত হয় না এবং তাহাকে আঘাত করে না। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান, হিয়োন্‌থ্‌সাং যেমন অনায়াসে আত্মীয়ের ন্যায় ভারত পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন, য়ুরোপে কখনো সেরূপ পারিতেন না। ধর্ম্মের ঐক্য বাহিরে পরিদৃশ্যমান নহে,—যেখানে ভাষা, আকৃতি, বেশভূষা, সমস্তই স্বতন্ত্র, সেখানে কৌতূহলের নিষ্ঠুর আক্রমণকে পদে পদে অতিক্রম করিয়া চলা অসাধ্য। কিন্তু ভারতবর্ষীয় একাকী আত্মসমাহিত—সে নিজের চারিদিকে একটি চিরস্থায়ী নির্জ্জনতা বহন করিয়া চলে—সেইজন্য কেহ তাহার একেবারে গায়ের উপর আসিয়া পড়ে না। অপরিচিত বিদেশী তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবার যথেষ্ট স্থান পায়। যাহারা সর্ব্বদাই ভিড় করিয়া, দল বাঁধিয়া, রাস্তা জুড়িয়া বসিয়া থাকে, তাহাদিগকে আঘাত না করিয়া এবং তাহাদের কাছ হইতে আঘাত না পাইয়া নূতন লোকের চলিবার সম্ভাবনা নাই। তাহাকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া, সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তবে এক-পা অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় যেখানে থাকে, সেখানে কোন বাধা রচনা করে না—তাহার স্থানের টানাটানি নাই—তাহার একাকিত্বের অবকাশ কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। গ্রীক হউক, আরব হউক, চৈন হউক, ভারতবর্ষ জঙ্গলের ন্যায় কাহাকেও আটক করে না, বনস্পতির ন্যায় নিজের তলদেশে চারিদিকে অবাধ স্থান রাখিয়া দেয়—আশ্রয় লইলে ছায়া দেয়, চলিয়া গেলে কোন কথা বলে না।

এই একাকিত্বের মহত্ত্ব যাহার চিত্ত আকর্ষণ করে না, সে ভারতবর্ষকে ঠিকমত চিনিতে পারিবে না। বহুশতাব্দী ধরিয়া প্রবল বিদেশী উন্মত্ত বরাহের ন্যায় ভারতবর্ষকে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দন্তদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফিরিয়াছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন বিস্তীর্ণ একাকিত্ব দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল—কেহই তাহার মর্ম্মস্থানে আঘাত করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ যুদ্ধ বিরোধ না করিয়াও নিজেকে নিজের মধ্যে অতি সহজে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে জানে—সেজন্য এ পর্য্যন্ত অস্ত্রধারী প্রহরীর প্রয়োজন হয় নাই। কর্ণ যেরূপ সহজ কবচ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি সেইরূপ একটি সহজ বেষ্টনের দ্বারা আবৃত—সর্ব্বপ্রকার বিরোধ বিপ্লবের মধ্যেও একটি দুর্ভেদ্য শান্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অচলা হইয়া ফিরে—তাই সে ভাঙিয়া পড়ে না, মিশিয়া যায় না, কেহ তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না—সে উন্মত্ত ভিড়ের মধ্যেও একাকী বিরাজ করে।

য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্ম্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম্ম করে একাকী। য়ুরোপের ধন-সম্পদ, আরাম-সুখ নিজের—কিন্তু তাহার দান-ধ্যান, স্কুল-কলেজ, ধর্ম্মচর্চ্চা, বাণিজ্য-ব্যবসায়, সমস্ত দল

বাঁধিয়া। আমাদের সুখ-সম্পত্তি একলার নহে—আমাদের দান-ধ্যান-অধ্যাপন, আমাদের কর্ত্তব্য একলার।

এই ভাবটাকে চেষ্টা করিয়া নষ্ট করিতে হইবে, এমন প্রতিজ্ঞা করা কিছু নহে—করিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই, হইবেও না। এমন কি, বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রকাণ্ড মূলধন একজায়গায় মস্ত করিয়া উঠাইয়া তাহার আওতায় ছোটছোট সামর্থ্যগুলিকে বলপূর্ব্বক নিষ্ফল করিয়া তোলা শ্রেয়স্কর বোধ করি না। ভারতবর্ষের তন্তুবায় যে মরিয়াছে, সে একত্র হইবার ক্রটিতে নহে—তাহার যন্ত্রের উন্নতির অভাবে। তাঁত যদি ভাল হয় এবং প্রত্যেক তন্তুবায় যদি কাজ করে, অন্ন করিয়া খায়, সন্তুষ্টচিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তবে সমাজের মধ্যে প্রকৃত দারিদ্র্যের ও ঈর্ষার বিষ জানিতে পায় না এবং ম্যাঞ্চেষ্টার তাহার জটিল কলকারখানা লইয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে পারে না। একটি শিক্ষিত জাপানী বলেন, "তোমরা বহুব্যয়সাধ্য বিদেশী কল লইয়া বড় কারবার ফাঁদিতে চেষ্টা করিও না। আমরা জার্ম্মাণী হইতে একটা বিশেষ কল আনাইয়া অবশেষে কিছুদিনেই সস্তা কাঠে তাহার সুলভ ও সরল প্রতিকৃতি করিয়া শিল্পিসম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে তাহা প্রচারিত করিয়া দিয়াছি—ইহাতে কাজের উন্নতি হইয়াছে, সকলে আহারও পাইতেছে।" এইরূপে যন্ত্রতন্ত্রকে অত্যন্ত সরল সহজ করিয়া কাজকে সকলের আয়ত্ত করা অন্নকে সকলের পক্ষে সুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

আমোদ বল, শিক্ষা বল, হিতকর্ম্ম বল, সকলকেই একান্ত জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তুলিলে, কাজেই সম্প্রদায়ের হাতে ধরা দিতে হয়। তাহাতে কর্ম্মের আয়োজন ও উত্তেজনা উত্তরোত্তর এতই বৃহৎ হইয়া উঠে যে মানুষ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর তাড়নায় কর্ম্মজীবীরা যন্ত্রের অধম হয়। বাহির হইতে সভ্যতায় বৃহৎ আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হই—তাহার তলদেশে যে নিদারুণ নরমেধযজ্ঞ অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা গোপনে থাকে। কিন্তু বিধাতার কাছে তাহা গোপন নহে—মাঝে মাঝে সামাজিক ভূমিকম্পে তাহার পরিণামের সংবাদ পাওয়া যায়। য়ুরোপে বড় দল ছোট দলকে পিষিয়া ফেলে, বড় টাকা ছোট টাকাকে উপবাসে ক্ষীণ করিয়া আনিয়া শেষকালে বটিকার মত চোখ বুজিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে।

কাজের উদ্যমকে অপরিমিত বাড়াইয়া তুলিয়া, কাজগুলাকে প্রকাণ্ড করিয়া, কাজে কাজে লড়াই বাধাইয়া দিয়া যে অশান্তি ও অসন্তোষের বিষ উন্মথিত হইয়া উঠে, আপাতত সে আলোচনা থাক। আমি কেবল ভাবিয়া দেখিতেছি, এই সকল কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলার ভিতরে, বাহিরে, চারিদিকে মানুষগুলাকে যেভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জ্জনত্বের সহজ অধিকার,—একাকিত্বের আব্রুটুকু থাকে না। না থাকে স্থানের অবকাশ, না থাকে কালের অবকাশ, না থাকে ধ্যানের অবকাশ। এইরূপে নিজের সঙ্গ নিজের কাছে অত্যন্ত অনভ্যস্ত হইয়া পড়াতে, কাজের একটু ফাঁক হইলেই মদ খাইয়া প্রমোদে মাতিয়া বলপূর্ব্বক নিজের

হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা ঘটে। নীরব থাকিবার, স্তব্ধ থাকিবার, আনন্দে থাকিবার সাধ্য আর কাহারো থাকে না।

যাহারা শ্রমজীবী, তাহাদের এই দশা। যাহারা ভোগী, তাহারা ভোগের নব নব উত্তেজনায় ক্লান্ত। নিমন্ত্রণ, খেলা, নৃত্য, ঘোড়-দৌড়, শিকার, ভ্রমণের ঝড়ের মুখে শুষ্কপত্রের মত দিনরাত্রি তাহারা নিজেকে আবর্ত্তিত করিয়া বেড়ায়। ঘূর্ণাগতির মধ্যে কেহ কখনো নিজেকে এবং জগৎকে ঠিকভাবে দেখিতে পায় না, সমস্তই অত্যন্ত ঝাপসা দেখে। যদি একমুহূর্ত্তের জন্য তাহার প্রমোদচক্র থামিয়া যায়, তবে সেই ক্ষণকালের জন্য নিজের সহিত সাক্ষাৎকার, বৃহৎ জগতের সহিত মিলনলাভ, তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

ভারতবর্ষ ভোগের নিবিড়তাকে আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া লঘু করিয়া দিয়াছে, এবং কর্ম্মের জটিলতাকেও সরল করিয়া আনিয়া মানুষে-মানুষে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহাতে ভোগে, কর্ম্মে এবং ধ্যানে প্রত্যেকেরই মনুষ্যত্বচর্চ্চার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। ব্যবসায়ী—সে-ও মন দিয়া কথকতা শোনে, ক্রিয়াকর্ম্ম করে ; শিল্পী—সে-ও নিশ্চিন্তমনে সুর করিয়া রামায়ণ পড়ে। এই অবকাশের বিস্তারে গৃহকে, মনকে, সমাজকে কলুষের ঘনবাষ্প হইতে অনেকটা পরিমাণে নির্ম্মল করিয়া রাখে—দূষিত বায়ুকে বদ্ধ করিয়া রাখে না, এবং মলিনতার আবর্জ্জনাকে একেবারে গায়ের পাশেই জমিতে দেয় না। পরস্পরের কাড়াকাড়িতে ঘেঁষাঘেঁষিতে যে রিপুর দাবানল জ্বলিয়া উঠে, ভারতবর্ষে তাহা প্রশমিত থাকে।

ভারতবর্ষের এই একাকী থাকিয়া কাজ করিবার ব্রতকে যদি আমরা প্রত্যেকে গ্রহণ করি, তবে এবারকার নববর্ষ আশিষ-বর্ষণে ও কল্যাণশস্যে পরিপূর্ণ হইবে। দল বাঁধিবার টাকা জুটাইবার ও সঙ্কল্পকে স্ফীত করিবার জন্য সুচিরকাল অপেক্ষা না করিয়া যে-যেখানে আপনার গ্রামে, প্রান্তরে, পল্লীতে, গৃহে, স্থিরশান্তচিত্তে ধৈর্য্যের সহিত—সন্তোষের সহিত পুণ্যকর্ম্ম—মঙ্গলকর্ম্ম সাধন করিতে আরম্ভ করি ; আড়ম্বরের অভাবে ক্ষুব্ধ না হইয়া, দরিদ্র আয়োজনে কুণ্ঠিত না হইয়া, দেশীয় ভাবে লজ্জিত না হইয়া, কুটীরে থাকিয়া, মাটিতে বসিয়া, উত্তরীয় পরিয়া সহজভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই ; ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মকে, কর্ম্মের সহিত শান্তিকে জড়িত করিয়া রাখি ; চাতকপক্ষীর ন্যায় বিদেশীর করতালিবর্ষণের দিকে উর্দ্ধমুখে তাকাইয়া না থাকি ; তবে ভারতবর্ষের ভিতরকার যথার্থ বলে আমরা বলী হইব। বাহির হইতে আঘাত পাইতে পারি, বল পাইতে পারি না ; নিজের বল ছাড়া বল নাই। ভারতবর্ষ যেখানে নিজবলে প্রবল, সেই স্থানটি আমরা যদি আবিষ্কার ও অধিকার করিতে পারি, তবে মুহূর্ত্তে আমাদের সমস্ত লজ্জা অপসারিত হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষ ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ, সকলকেই মর্য্যাদাদান করিয়াছে। এবং সে মর্য্যাদাকে দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারা লভ্য করে নাই। বিদেশীরা বাহির হইতে ইহা দেখিতে

পায় না। যে ব্যক্তি যে পৈত্রিক কর্ম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কর্ম্ম যাহার পক্ষে সুলভতম, তাহা পালনেই তাহার গৌরব—তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই তাহার অমর্য্যাদা। এই মর্য্যাদা মনুষ্যত্বকে ধারণ করিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়। পৃথিবীতে অবস্থার অসাম্য থাকিবেই, উচ্চ অবস্থা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে—বাকি সকলেই যদি অবস্থাপন্ন লোকের সহিত ভাগ্য তুলনা করিয়া মনে মনে অমর্য্যাদা অনুভব করে, তবে তাহারা আপন দীনতায় যথার্থই ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। বিলাতের শ্রমজীবী প্রাণপণে কাজ করে বটে, কিন্তু সেই কাজে তাহাকে মর্য্যাদার আবরণ দেয় না। সে নিজের কাছে হীন বলিয়া যথার্থই হীন হইয়া পড়ে। এইরূপে য়ুরোপের পনেরোআনা লোক দীনতায়, ঈর্ষায়, ব্যর্থ প্রয়াসে অস্থির। য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী, নিজেদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের হিসাবে আমাদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের বিচার করে—ভাবে, তাহাদের দুঃখ ও অপমান ইহাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাহা একেবারেই নাই। ভারতবর্ষে কর্ম্মবিভেদ—শ্রেণীবিভেদ সুনির্দ্দিষ্ট বলিয়াই, উচ্চশ্রেণীয়েরা নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য নিম্নশ্রেণীয়কে লাঞ্ছিত করিয়া বহিষ্কৃত করে না। ব্রাহ্মণের ছেলেরও বাগ্‌দি দাদা আছে। গণ্ডিটুকু অবিতর্কে রক্ষিত হয় বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত, মানুষে মানুষেও হৃদয়ের সম্বন্ধ বাধাহীন হইয়া উঠে—বড়দের অনাত্মীয়তার ভার ছোটদের হাড়গোড় একেবারে পিষিয়া ফেলে না। পৃথিবীতে যদি ছোট-বড়র অসাম্য অবশ্যম্ভাবীই হয়, যদি স্বভাবতই সর্ব্বত্রই সকলপ্রকার ছোটর সংখ্যাই অধিক ও বড়র সংখ্যাই স্বল্প হয়, তবে সমাজের এই অধিকাংশকেই অমর্য্যাদার লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষ যে উপায় বাহির করিয়াছে, তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

য়ুরোপে এই অমর্য্যাদার প্রভাব এতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, সেখানে একদল আধুনিক স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক হইয়াছে বলিয়াই লজ্জাবোধ করে। গর্ভধারণ করা, স্বামী-সন্তানের সেবা করা, তাহারা কুণ্ঠার বিষয় জ্ঞান করে। মানুষই বড়, কর্ম্মবিশেষ বড় নহে ; মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া যে-কর্ম্মই করা যায়, তাহাতে অপমান নাই ; দারিদ্র্য লজ্জাকর নহে, সেবা লজ্জাকর নহে, হাতের কাজ লজ্জাকর নহে,—সকল কর্ম্মে, সকল অবস্থাতেই সহজে মাথা তুলিয়া রাখা যায় ঐ ভাব য়ুরোপে স্থান পায় না। সেইজন্য সক্ষম, অক্ষম, সকলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবার জন্য সমাজে প্রভূত নিষ্ফলতা, অন্তহীন বৃথাকর্ম্ম ও আত্মঘাতী উদ্যমের সৃষ্টি করিতে থাকে। ঘর ঝাঁট দেওয়া জল আনা, বাটনা বাটা, আত্মীয়-অতিথি সকলের সেবাশেষে নিজে আহার করা, ইহা য়ুরোপের চক্ষেও অপমান, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা গৃহলক্ষ্মীর উন্নত অধিকার, ইহাতেই তাহার পুণ্য, তাহার সম্মান। বিলাতে এই সমস্ত কাজে যাহারা প্রত্যহ রত থাকে, শুনিতে পাই, তাহারা ইতরভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হয়। কারণ, কাজকে ছোট জানিয়া তাহা করিতে বাধ্য হইলে, মানুষ নিজে ছোট হয়। আমাদের লক্ষ্মীগণ যতই সেবার কর্ম্মে ব্রতী হন,—তুচ্ছ কর্ম্মসকলকে পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া সম্পন্ন করেন,—

অসামান্যতাহীন স্বামীকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করেন, ততই তাঁহারা শ্রীসৌন্দর্য্যে-পবিত্রতায়-মণ্ডিত হইয়া উঠেন—তাঁহাদের পুণ্যজ্যোতিতে চতুর্দ্দিক হইতে ইতরতা অভিভূত হইয়া পলায়ন করে।

য়ুরোপ এই কথা বলেন যে, সকল মানুষেরই সব হইবার অধিকার আছে—এই ধারণাতেই মানুষের গৌরব। কিন্তু বস্তুতই সকলের সব হইবার অধিকার নাই, এই অতি সত্য কথাটি সবিনয়ে গোড়াতেই মানিয়া লওয়া ভাল। বিনয়ের সহিত মানিয়া হইলে তাহার পরে আর কোন অগৌরব নাই। রামের বাড়ীতে শ্যামের কোন অধিকার নাই, এ কথা স্থিরনিশ্চিত বলিয়াই রামের বাড়ীতে কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারিলেও শ্যামের তাহাতে লেশমাত্র লজ্জার বিষয় থাকে না। কিন্তু শ্যামের যদি এমন পাগলামি মাথায় জোটে যে, সে মনে করে, রামের বাড়ীতে একাধিপত্য করাই তাহার উচিত—এবং সেই বৃথাচেষ্টায় সে বারংবার বিড়ম্বিত হইতে থাকে, তবেই তাহার প্রত্যহ অপমান ও দুঃখের সীমা থাকে না। আমাদের দেশে স্বস্থানের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সকলেই আপনার নিশ্চিত অধিকারটুকুর মর্য্যাদা ও শান্তি লাভ করে বলিয়াই, ছোট সুযোগ পাইলেই বড়কে খেদাইয়া যায় না, এবং বড়ও ছোটকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে খেদাইয়া রাখে না।

য়ুরোপ বলে, এই সন্তোষই, এই জিগীষার অভাবই, জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা য়ুরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ বটে, কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি। যে লোক জাহাজে আছে, তাহার পক্ষে যে বিধান, যে লোক ঘরে আছে, তাহারও পক্ষে সেই বিধান নহে। য়ুরোপ যদি বলে, সভ্যতামাত্রেই সমান এবং সেই বৈচিত্র্যহীন সভ্যতার আদর্শ কেবল য়ুরোপেই আছে, তবে তাহার সেই স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আমাদের ধনরত্নকে ভাঙা-কুলা দিয়া পথের মধ্যে বাহির করিয়া ফেলা সঙ্গত হয় না।

বস্তুত সন্তোষের বিকৃতি আছে বলিয়াই অত্যাকাঙ্ক্ষার যে বিকৃতি নাই, ও কথা কে মানিবে? সন্তোষে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলে যদি কাজে শৈথিল্য আনে, ইহা সত্য হয়, তবে অত্যাকাঙ্ক্ষার দম বাড়িয়া গেলে যে ভূরিভূরি অনাবশ্যক ও নিদারুণ অকাজের সৃষ্টি হইতে থাকে, এ কথা কেন ভুলিব? প্রথমটাতে যদি রোগে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য, সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষা দুয়েরই মাত্রা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ জন্মে।

অতএব সে আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সন্তোষ, সংযম, শান্তি, ক্ষমা, এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ। ইহাতে প্রতিযোগিতা চক্‌মকির ঠোকাঠুকিশব্দ ও স্ফুলিঙ্গবর্ষণ নাই, কিন্তু হীরকের স্নিগ্ধ নিঃশব্দ জ্যোতি আছে। সেই শব্দ ও স্ফুলিঙ্গকে এই ধ্রুবজ্যোতির চেয়ে মূল্যবান মনে করা বর্ব্বরতামাত্র। য়ুরোপীয় সভ্যতার বিদ্যালয় হইতেও যদি সে বর্ব্বরতা প্রসূত হয়, তবু তাহা বর্ব্বরতা।

আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্ম্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন, এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষাকালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্য্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্ম্মের বাসনা, জনসংঘের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে, ভয়হীন শোকহীন মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পর্বে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাহাকে "ফ্রীডাম" বলে, সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্ব্বল, ভীরু, তাহা স্পর্দ্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর,—তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্ম্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না, এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবলি অন্যকে আঘাত করে, এইজন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্ম্মে-চর্ম্মে, অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে—তাহা আত্মরক্ষার স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বে বদ্ধ করিয়া রাখে—তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্বভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্রমাত্র। এই দানবীয় "ফ্রীডাম্" কোন কালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না—কারণ আমাদের জনসাধারণ অন্যসকল দেশের চেয়ে যথার্থভাবে স্বাধীনতর ছিল। এখনো আধুনিক কালের ধিক্কারসত্ত্বেও এই "ফ্রীডাম" আমাদের সর্ব্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। না-ই হইল—এই ফ্রীডামের চেয়ে উন্নততর—বিশালতর যে মহত্ত্ব—যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি,—অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়-বড় রাজমুকুট পবিত্র হইবে।

এইখানেই নববর্ষের চিন্তা আমি সমাপ্ত করিলাম। আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কারণ, পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। আজ যে নবকিসলয়ে বনলক্ষ্মী উৎসব বস্ত্র পরিয়াছেন, এ বস্ত্রখানি আজিকার নহে—যে ঋষি কবিরা ত্রিষ্টুভচ্ছন্দে তরুণী উষার বন্দনা করিয়াছেন তাঁহারাও এই মসৃণ চিক্কণ পীতহরিৎ বসনখানিতে বনশ্রীকে অকস্মাৎ সাজিতে দেখিয়াছেন—উজ্জয়িনীর পুরোদ্যানে কালিদাসের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে এই সমীরকম্পিত কুসুমগন্ধি অঞ্চলপ্রান্তটি নবসূর্য্যকরে ঝলমল করিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীর্ণজীবন স্নান করিতে পায়। আজিকার এই নববর্ষের মধ্যে ভারতের বহুসহস্র পুরাতন বর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিলে, তবেই আমাদের দুর্ব্বলতা, আমাদের লজ্জা, আমাদের লাঞ্ছনা, আমাদের দ্বিধা দূর হইয়া যাইবে। ধার-করা ফুলে-পাতায় গাছকে সাজাইলে তাহা আজ থাকে, কাল থাকে না। সেই নূতনত্বের অচির-প্রাচীনতা ও বিনাশ কেহ নিবারণ করিতে পারে না। নববল, নবসৌন্দর্য্য, আমরা যদি

অন্যত্র হইতে ধার করিয়া লইয়া সাজিতে যাই, তবে দুই দণ্ড বাদেই তাহা কদর্য্যতার মাল্যরূপে আমাদের ললাটকে উপহসিত করিবে; ক্রমে তাহা হইতে পুষ্প-পত্র ঝরিয়া গিয়া কেবল বন্ধন-রজ্জুটুকুই থাকিয়া যাইবে। বিদেশের বেশভূষা—ভাবভঙ্গী আমাদের গাত্রে দেখিতে দেখিতে মলিন, শ্রীহীন হইয়া পড়ে—বিদেশের শিক্ষা, রীতিনীতি আমাদের মনে দেখিতে দেখিতে নির্জ্জীব ও নিষ্ফল হয়, কারণ, তাহার পশ্চাতে সুচিরকালের ইতিহাস নাই—তাহা অসংলগ্ন, অসঙ্গত, তাহার শিকড় ছিন্ন। অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব—সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে, তখনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে না, তখন সেই অম্লানগৌরব মালাখানি আশীর্ব্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয়চিত্তে সবলহৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্ব্বাক, তাহারই জয় হইবে,—আমরা—যাহারা ইংরাজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—

"মিলি মিলি যাওব সাগরলহরীসমানা"

তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্র-কন্যাগণকে কোট-ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করযোড়ে আসিয়া কহিবে—"পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।"

তিনি কহিবেন—

"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"

তিনি কহিবেন—

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্যান্ ন বিভেতি কদাচন।"

১৮২৪ শক আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র। পৃ. ৪০-৪৬, ৫৬-৬০, ৭০-৭২

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

আশ্রম-কথা।

১৩০৮ সালের ৭ই পৌষে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাদিন। বৎসরে বৎসরে সেইদিনে শান্তিনিকেতনে উৎসব হয় ও মেলা বসে। নানাস্থান হইতে লোক সমাগম হয়, বাজার বসে, যাত্রাগান হয় এবং রাত্রে উপাসনান্তে

বাজি পোড়ানো হইয়া থাকে। সেই দিনটি সকলের আনন্দের দিন।

বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসব এবং নূতন বৎসরের কার্য্যারম্ভ সেই একই দিনে পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অধ্যাপক সকলকেই সেই দিনটি স্মরণ করাইয়া দেয় যে তাঁহারা এখানে কেবল ইস্কুলে পড়েন এবং পড়ান তাই নয়, তাঁহারা মহর্ষির সাধনাশ্রমে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অধ্যয়ন-অধ্যপনার কর্ম্ম একটি বৃহৎ জীবনের সাধনার অন্তর্গত।

সকলেই জানেন মহর্ষিকে কোন্ মন্ত্র প্রথমে জাগ্রত করিয়াছিল? সে ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। এই শ্লোকটি বহন করিয়া একদা একটি ছিন্ন পত্র তাঁহার কাছে উড়িয়া আসিয়াছিল। কোন্ সময়ে? যখন বেদনায় তিনি মধ্যাহ্নের রবিরশ্মিকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখিতেছিলেন। এই মন্ত্রেই তিনি নিবোধিত হইলেন।

আশ্রমের জন্য তিনি তাঁহার এই মন্ত্রটি জীবনের ভিতর হইতে সত্য এবং উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, কাজ, কর্ম্ম, সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করিয়া দেখিবার মন্ত্র।

এবারকার উৎসব হইয়া গেল। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপক প্রাতে এবং সন্ধ্যায় উপাসনার কাজ করিয়াছিলেন। আশ্রম-বালকগণ সঙ্গীত করিয়াছিল।

বাহির হইতে স্ত্রীপুরুষ অনেকেই উৎসবের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। প্রায় কুড়িজন আশ্রমের পুরাতন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

প্রভাতে উপাসনার পরে মন্দিরে পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গীতাপাঠের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। পাঠ শেষ হইলে আশ্রমবালকদিগকে তিনি কিছু উপদেশ দেন।

৭ই পৌষে বিদ্যালয় সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবের জন্য ৮ই পৌষের দিনটি স্থির করা হইয়াছিল। পুরাতন ছাত্র এবং অধ্যাপক এবং বিদ্যালয়ের হিতৈষী বন্ধুগণ সে দিন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পুরাতন ছাত্র অনেকেই আসিয়াছিলেন, পুরাতন অধ্যাপক কেবল দুইজনমাত্র উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। প্রভাতে সকলে সপ্তপর্ণদ্রুমতলে সমবেত হইলেন। আধুনিক ছাত্রগণ ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদিগকে পুষ্পচন্দনের দ্বারা অভ্যর্থনা করিল। সকলে মিলিয়া বেদগান করিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন একটি প্রার্থনা করেন। আশ্রমের অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রাচীনতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলার পরে শ্রীযুক্ত অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী আশ্রমের আদর্শ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করেন। তাহা "ব্রহ্মবিদ্যালয়" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনার পরে

আশ্রমসঙ্গীত গান করা এবং সকলে মিলিয়া আশ্রম প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে বালকগণ ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিল এবং সন্ধ্যার পরে সঙ্গীত ও অভিনয় করিয়াছিল।

৭ই পৌষের পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। নূতন বৎসরের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে নূতন পাঠ্যপুস্তকসকল স্থির করা হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানে ছাত্রসংখ্যা ১৮৬ জন।

মাঘ ১৮৩৩ শক। পৃ ২৪১-২৪২

আশ্রম-কথা

এই আশ্রমের আরম্ভকাল হইতেই এই একটি বিষয়ে চেষ্টা হইয়াছে যে, এখানে অধ্যাপক এবং ছাত্রগণ অন্যস্থানের ন্যায় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করিবেন না,—তাঁহারা ছাত্রদের ভিতরে থাকিয়া সকল কাজেই তাঁহাদের সঙ্গে যোগ রাখিবেন, এবং যে সাধনা সমস্ত আশ্রমের অবলম্বনীয়, তাহা তাঁহারা কেবল ছাত্রদের কাছে দাবী করিবেন না, কিন্তু নিজেরা সর্ব্বাগ্রে তাহা গ্রহণ করিবেন এবং ছাত্রগণ তাঁহাদের অনুগামী হইবে। ছাত্রে এবং অধ্যাপকে এই একটি সাধনার যোগ, ভাবের যোগ এখানে স্থাপন করিবার জন্য বরাবর চেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু ইহা এখনও পর্য্যন্ত সার্থক হইয়া উঠে নাই।

অধ্যাপকগণের স্বভাবতই একটা দূরত্ব আছে—বয়সে, জ্ঞানে, সকল বিষয়েই তাঁহারা ছাত্রগণ হইতে স্বতন্ত্র। শুধু তাই নয়, তাঁহাদিগকে যখন শাসন করিতে হয়, তখন তাঁহাদের স্বাভাবিক দূরত্বকে আরও একটুখানি দীর্ঘতর করিয়া দেয়। শাসনসম্বন্ধে অনেক রকমের মতামত আছে—পাশ্চাত্যদেশেও কেহ কেহ শাসন জিনিষটাকে একেবারেই বাদ দিয়া চলিবার প্রস্তাব করেন—তাঁহারা বলেন ওটা প্রাচীন কালের একটা বর্ব্বরতার সংস্কারমাত্র ; মানুষকে যেখানে আমরা বুঝিতে পারি না বা ঠিকমত ঠিক জায়গায় ধরিতে পারি না সেখানে তাহাকে আঘাত করিয়া বসি। আবার ভিন্ন মতের লোকেরা বলেন যে, শাসন না হইলে মানুষের স্বাভাবিক বিক্ষিপ্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতা কোনমতেই যায় না—মানুষের নিজেকে নিজেই শাসন করিতে হয়, কিন্তু যখন আপনাকে শাসন করিবার বয়স নয় তখন পিতামাতার, শিক্ষকের ও সমস্ত সমাজের শাসন মানিতেই হয়। শাসন ও নিয়ম আছেই, অহাকে বাদ দিলে ফল কোনকালে ভাল হইতে পারে না।

যাহাই হউক এ সম্বন্ধে যখন মতবৈচিত্র্য আছে এবং পরীক্ষাও চলিতেছে এবং যখন দেখা যায় যে একেবারে শাসন বাদ দিয়া শিশুকে মানুষ করা কোথাও সম্ভবপর

হয় নাই, তখন শাসন যাঁহারা করিবেন, তাঁহারা সেইসঙ্গে হৃদয়ও কি করিয়া অধিকার করিবেন, সে একটা প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। পিতামাতার স্নেহ নৈসর্গিক, তাঁহারা কঠোর দণ্ড দিলেও শিশু তাঁহাদের স্নেহ সম্বন্ধে উদাসীন হয় না,—তথাপি অতিরিক্ত শাসনে অনেক সময় দেখা যায় যে পিতামাতারা ভিতরে যতই স্নেহ করুন, ছেলেকে বাগ মানাইতে পারেন না, সে তাঁহাদের আয়ত্তের বাহির হইয়া যায়। যেখানে পিতামাতা-সম্বন্ধেই এই ঘটনা ঘটে, সেখানে শুধু শাসনে শিক্ষক যে ছেলেকে আরও কত বিগ্‌ড়াইয়া দিবেন, তাহাতো বুঝিতেই পারা যাইতেছে। সুতরাং শাসন কি পরিমাণ হইলে তাহা সীমা ছাড়ায় না এবং শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের হৃদয় কি করিলে পাওয়া যায়, তাহা খুব ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার।

আশ্রমে এই সমস্যাটি সকলের চেয়ে প্রবল। ইহা দেখা গিয়াছে যে বাহির হইতে শাসন করা সহজ, কিন্তু ভিতর হইতে ছাত্রের সমস্ত হৃদয়মনকে জাগ্রত করিয়া তোলা কোনমতেই সহজ নহে। এ সম্বন্ধে লুব্ধ হইয়া কেবলি ছেলেদের মনকে বেশি করিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হইয়া বসে। স্নেহ জিনিষটা মঙ্গল, জিনিষটা দৌরাত্ম্য হইলে, যে বেচারার উপর তাহা প্রয়োগ করা হয় সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠে। সেও একটা জুলুম। তা ছাড়া হৃদয়ের দিকে বেশি করিয়া নজর দিতে গেলে, কোন্ সময়ে যে অলক্ষিতে শাসনে শৈথিল্য এবং প্রশ্রয় আসিয়া পড়ে, তাহাও জানা যায় না।

সুতরাং মানুষ তৈরি করা সম্বন্ধে বাঁধা প্রণালী নির্দ্দেশ করা চলে না। মানুষ তৈরি করা সত্যকারের মানুষের উপরই নির্ভর করে। যাহার হৃদয়মন সত্যভাবে উদ্বোধিত হইয়াছে, অন্যের হৃদয়মনকে তিনিই ঠিক মত জাগাইয়া তুলিতে পারেন। শিখা হইতেই শিখা ধরাইতে হয়। জীবন হইতেই জীবনের জন্ম হয়।

কিন্তু এ যে ভয়ানক ফরমাস। এমন শিক্ষক কে কোথায় পাইবে? সেই কারণেই তো ভাল প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য মানুষকে এতই ভাবিতে হয়। এ সম্বন্ধে কি সে রকম কোন প্রণালীই নাই?

একটি প্রণালী এই হইতে পারে যে, অন্যের সম্বন্ধে তুমি যে জিনিষটি চাও নিজে সেই জিনিষটি নিজের মধ্যে পূর্ণভাবে দেখাও। যে অভ্যাসগুলি ছাত্রদের মধ্যে বাঁধিয়া দিতে ইচ্ছা কর, নিজের মধ্যে তাহার কোন শৈথিল্য ঘটিলে চলিবে না। যদি তাহার বাক্যে ও ব্যবহারে শীলতা হোক ইহা চাও, তবে নিজের বাক্য ও ব্যবহারকে একদিনের তরেও শীলতাভ্রষ্ট হইতে দিলে চলিবে না। এমন যদি হয়, তবেই শিশুরা যেমন মায়ের মুখ হইতে ভাষা শিক্ষা করে, ছাত্রেরা সেইরূপ শিক্ষকের জীবন হইতে জীবন লাভ করিবে।

আশ্রমে পুনরায় এইরূপ একটি চেষ্টার সূত্রপাত হইতেছে। এখানে যে নিয়ম-শাসন ছাত্রদের উপরে প্রবর্ত্তিত আছে, কথা হইতেছে যে ছাত্রেরা যদি তাহা স্বেচ্ছায়

কেহ কেহ গ্রহণ করে, এবং অধ্যাপকগণও কেহ কেহ গ্রহণ করেন তবে সেই একটি কেন্দ্র তৈরি হইয়া উঠিবে, তখন এখানকার আদর্শটি সেইখানেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। একবার ঐরূপ একটি কেন্দ্র গড়িলে হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তপ্রবাহের ন্যায় ঐ আদর্শ কেন্দ্র হইতে সমস্ত আশ্রম শরীর বল এবং পরিপুষ্টি লাভ করিবে। আশ্রম তখন সত্যসত্যই সাধনায় ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে।

নূতন সেসনে সকল দিক দিয়াই নূতন উৎসাহে এবং নবোদ্যমে কর্ম্মারম্ভ হইয়াছে। নূতন পাঠ্যপুস্তকসকল এবং পাঠপ্রণালী স্থির হইয়াছে ; যে সকল পুরাতন নিয়ম ও উদ্যোগ উঠিয়া গিয়াছিল বা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল সেগুলিকে পুনরায় জাগ্রত করা গিয়াছে। পূর্ব্বে সন্নিকটস্থ গ্রামসমূহের সহিত যোগ রাখিবার একটা উদ্যোগ ছিল ; ছাত্রগণ তথায় গিয়া গ্রামের বালকগণকে শিক্ষা দিত, রোগীকে ঔষধ বিতরণ করিত এবং নানা প্রকারে গ্রামগুলির মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করিত, পুনরায় সেই কাজটি গৃহীত হইয়াছে এবং বেশ উৎসাহের সঙ্গে চলিতেছে।

৬ই মাঘে মহর্ষির মৃত্যুবাৎসরিক অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রভাতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মন্দিরে উপাসনা করেন, তাঁহার হৃদয়গ্রাহী সুন্দর উপদেশে সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষির সাধন-ক্ষেত্র সপ্তপর্ণবৃক্ষনিম্নে তাঁহার "আত্মজীবনী" হইতে কিছু পাঠ হয় ও দ্বিপ্রহরে বালকদিগের উপযোগী করিয়া শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় তাঁহার জীবনচরিতটি বলিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে পুনরায় উপাসনা হইয়াছিল।

অধ্যাপনা এবং পাঠপ্রণালী সম্বন্ধে আমরা ক্রমে ক্রমে সকল বিবরণ দিব।

স্তব্ধ উপাসনার মন্দির।

"স্তব্ধ গির্জ্জা" নামে একটি ক্ষুদ্র ধর্ম্মমন্দির লণ্ডন নগরের জনাকীর্ণ একটি অংশে দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে সঙ্গীত, উপাসনা ইত্যাদি কিছুই হয় না। পথে চলিতে চলিতে যখন যাহার খুশী সে আসিয়া ঐ স্তব্ধ মন্দিরে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম করিয়া যায়—এইজন্যই বাস্তবিক এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা। লণ্ডনে হাজার হাজার ধর্ম্মমন্দির আছে, যেখানে রবিবারে রবিবারে উপাসনা হয়, এ মন্দির সে রকমের নহে। ইহা আমাদের দেশের পান্থশালার মত—ক্লান্ত পথিক সেইখানে আসিয়া বিশ্রাম করে—তবে যে-অন্নপানের জন্য আসে তাহা আধ্যাত্মিক। এই সুন্দর বিশ্রাম-মন্দিরটির কথা প্রথমে Ladies Home Journal নামক সংবাদপত্রে (আগষ্ট মাসে) প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই পত্রিকার সম্পাদক মাননীয় উইলিয়াম হ. বার্টন যে শিল্পী এই

মন্দিরকে চিত্রে শোভিত করিয়াছিলেন তাঁহারি একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং এইজন্য সেই চিত্রকরের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে জানেন। তিনি লিখিতেছেন, "এই মন্দিরের স্থাপয়িত্রী মিসেস রাসেল গার্ণি নামিকা এক বিধবা ভদ্রমহিলা। তিনি বৈধব্যাবস্থায় ইটালি ভ্রমণ করিয়া তদ্দেশীয় কোন কোন ধর্ম্মমন্দিরের প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্রসমূহ দেখিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনে এই প্রকার কোন ধর্ম্মমন্দির দেখিয়া দুঃখ বোধ করিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে সেই সুবৃহৎ নগরের বক্ষের মধ্যে এমন কোন ধর্ম্মমন্দির কেন থাকিবে না যেখানে গান বা উপদেশ ভিন্ন মানুষ কর্ম্ম করিতে করিতে, পথে চলিতে চলিতে খুসীমত আসিয়া বিশ্রাম করিবে, বাইবেলের কথা সকল চিত্রে চক্ষে দেখিতে পাইবে এবং স্তব্ধভাবে ঈশ্বরের প্রকাশ এবং তাঁহার সত্তার উপলব্ধি করিতে পারিবে।

"এই ভাবিয়া লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাঁহার একজন স্ত্রী বন্ধুর নিকট স্বীয় চিন্তা জ্ঞাপন করিলেন, আর জিজ্ঞাসা করিলেন যে এমন কোন শিল্পী পাওয়া যাইবে কি না যিনি এইরূপ চিত্র অঙ্কন করিতে পারেন। তাঁহার সেই বন্ধু এই প্রকারের একজন শিল্পীর সহিত কিছুকাল পূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ফ্রেডারিক্ সিগুস্। তিনি খুব বিনয়ী এবং ধর্ম্মপ্রাণ চিত্রকর।

"সেই চিত্রকর সম্মত হইলেন। কিন্তু মন্দিরস্থাপনের স্থান নিরূপণের জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত কষ্ট পাইতে হইল। প্রথমে মনে হইয়াছিল যে এই প্রকারের একটি মন্দিরস্থাপনের জন্য লণ্ডনের মধ্যে অনেক স্থান পাওয়া যাইবে। একবার স্থান প্রায় নিরূপিত হইল কিন্তু পুনরায় নানা কারণে সেই স্থানে কার্য্য করা হইল না। লণ্ডনের সংবাদপত্রসমূহে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল—কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। একটি স্থান অনেক কষ্টে মিলিল। স্থানটি হাইডপার্ক নামক একটি বাগানের ভিতরে। সেই স্থানে পূর্ব্বে একটি ভগ্নপ্রায় দালান এবং সম্মুখে একটি বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ছিল। এই স্থানটিই স্থির হইল এবং একটি দলিলপত্রও লিখিত হইল। মিসেস্ গার্ণি সেই স্থানে এইরূপ একটি ধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত করিলেন যাহা দিবাভাগে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং তাহাতে কোন প্রকার কৃত্রিম প্রদীপ জ্বালান হইবে না ও কেহ তাহাকে আগুন হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাহারা দিবে না।

"দালান যখন উঠিতে লাগিল, তখন কোথায় চিত্র আঁকা হইবে তাহার নক্সা করিতেই সিগুেস্-এর কয়েক মাস কাটিয়া গেল। মিসেস্ গার্ণি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে মন্দিরটি সম্পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন না, কিন্তু তিনি দেয়ালগুলি এবং কতকগুলি চিত্র সম্পূর্ণ দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ সালে ১৮ই মার্চ্চ অনেক দিনের পরিশ্রমের পর সেই মন্দিরের বহির্ভাগ এবং অভ্যন্তরেরও প্রধান চিত্রগুলি শেষ হইল। সেই দিন মিসেস গার্ণি এবং মিষ্টার সিগুস্ সেই দালানের ভিতরে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে

কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কতকগুলি চিত্র সম্পূর্ণ দেখিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা আংশিকরূপে পূর্ণ হইয়াছে এই ভাবিয়া মিসেস্ গার্ণির হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

"শেষ জীবনে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। সেইজন্য তিনি সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতে পারিতেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে গমন করিয়া স্বীয় পরিশ্রমের সাফল্য দর্শন করিতেন, এবং সর্ব্বদাই চিঠি এবং বাক্য দ্বারা চিত্রকরকে উৎসাহিত এবং সাহায্য করিতেন। অবশেষে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস্ গার্ণি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

"দর্শকবৃন্দ মুক্ত দরজার নিকটে আসিলেই দেখিতে পাইবেন একটি প্রস্তরখণ্ডে এই কথাগুলি লিখিত আছে, 'লণ্ডন সহরের কর্ম্মব্যস্ত পথের যাত্রিগণ, ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম, নিস্তব্ধতা, এবং প্রার্থনার জন্য প্রবেশ করুন। এই মন্দিরের প্রাচীরস্থিত চিত্রগুলি মানুষের সহিত ঈশ্বরের অতীত এবং নিত্যকালের সম্বন্ধের কথা আপনাদের কাছে ব্যক্ত করুক।

মন্দিরটির মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত ঘর আছে। সেই স্থানেই বসিবার আসন প্রস্তুত আছে। তথায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে এমন কি পরস্পর গল্প করিতেও কোন নিষেধ নাই। এই ঘরের দেয়ালে কতকগুলি চিত্র আছে। সমস্ত চিত্রের মধ্যস্থলে খৃষ্টের মেষপালকরূপ মূর্ত্তি। খৃষ্ট একটি মেষশাবককে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন— দুই তিনটি মেষ তাঁহার পায়ের তলায় সোহাগ জানাইতেছে। খৃষ্টানশাস্ত্রে ভগবান পাপীর পরিত্রাতা। খৃষ্ট বলিয়াছেন 'একজন মেষপালকের যদি একশত মেষের মধ্যে নিরানব্বইটা থাকে আর একটি হারাইয়া যায়, তবে কি সে নিরানব্বইটাকে ফেলিয়া একটার অন্বেষণে ছোটে না?' ভগবান সেই যে হারাইয়া গেছে, যে দূরে পড়িয়াছে, তাহারি ভগবান। খৃষ্টের ঐ একটি মেষকে কোলে লইয়া আদর করিবার মূর্ত্তিটি কি করুণাপরিপূর্ণ! ঐ ছবিটি দেখিলে কি সান্ত্বনা মনে জাগে!"

রবিবারে রবিবারে ধর্ম্মমন্দিরে যে উপাসনা হয়, তাহা নিতান্তই একদিনের। এই মন্দিরটি কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মকে মিলাইয়া রাখিয়াছে, কাজ করিতে করিতে একবার গিয়া প্রবেশ এবং পুনরায় কাজে গমন—এই ভাবটি বড়ই চিত্তাকর্ষক।

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মধ্যাহ্ন।

নিশি দিয়ে গেছে স্নিগ্ধ আঁধারে
বিশ্রাম উপহার,
তারকাখচিত অঞ্চলে ঢাকা
মোহন স্বপন তার।

উষা দিয়ে গেছে আশাবিকশিত
নবজাগ্রত প্রাণ,
মন্দ মারুত হৃদয়-তন্ত্রে
বাজায়ে গিয়েছে গান।
হে মধ্যাহ্ন, প্রখর দীপ্ত
এই বর দেহ আজ—
শ্রান্তিবিহীন শক্তির সাথে
তুলে লই শিরে কাজ!

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস।

ফাল্গুন ১৮৩৩ শক। পৃ. ২৬৫-২৬৭

আশ্রম-কথা।

এবার আশ্রমের প্রধান খবর পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রম হইতে দীর্ঘকালের জন্য বিদায়গ্রহণ। ৪ঠা ফাল্গুন তিনি আশ্রম হইতে বিদায় লইয়াছেন।

বিদ্যালয়ের জন্মকাল হইতে এতদিন পর্য্যন্ত তিনি প্রায় সকল সময়ই আশ্রমে বাস করিয়াছেন। বোধ হয় দুতিন মাসের বেশি কখনই অনুপস্থিত থাকেন নাই। সমস্ত আশ্রমের সকল মানুষ, সকল চিন্তা, সকল কর্ম্ম তাঁহার সঙ্গে এমনি একান্তভাবে জড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে তাঁহার সহিত সুদীর্ঘকালের বিচ্ছেদ এখানকার পক্ষে নিদারুণ।

তথাপি আশ্রমবাসী সকলেরই মধ্যে তাঁহার যাত্রায় এই একটি আনন্দ আছে যে তিনি আমাদেরই সকলেরই হইয়া যাত্রা করিতেছেন—না, সেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র করিয়া দেখা—কারণ এই যাত্রায় তিনি নানাদেশ হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিবেন তাহা তিনি সমস্ত মানবজাতিরই অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডারে রসভাণ্ডারে দান করিয়াই যাইবেন; তিনি কবি, তিনি মনীষী—তিনি যাহা পাইবেন তাহা সকলেরই পাওয়া।

নদীকে অনেক সময় মানুষ আপনার প্রয়োজন সাধনের জন্য বাঁশ দিয়া ঘিরিয়া লয়—তাহার জলকে নানাপ্রকারে আবিল-মলিন করিয়া তোলে; ভুলিয়া যায় যে নদী প্রয়োজন মিটাইলেও সে কোন ঘাটেই বাঁধা নয়—সে বৃহৎ সভ্যতার ধাত্রীমাতা, সমস্ত দেশের সে নাড়ী; অথচ তাহাও তাহার শেষ পরিচয় নয়,—তাহার শেষ পরিচয় তাহার আশ্চর্য্য অশ্রান্ত গতিবেগে এবং কলধ্বনিমুখর সঙ্গীতে। আমরাও সেইরূপ কবিকে প্রয়োজনের বেড়া দিয়া লইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম বড় জোর যে, এই আশ্রমে বসিয়া তিনি দেশহিতকর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু সেই কি তাঁহার শেষ পরিচয়? না—কারণ

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল রূপ, সকল রস, সকল জ্ঞান, সকল কর্ম্ম, সকল সৃষ্টিলীলার সঙ্গে যোগযুক্ত করিয়া তাঁহাকে দেখাই তাঁহার শেষ পরিচয়—তিনি দেশবিশেষেও আবদ্ধ নন।

তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বে তিনি নানা উপলক্ষ্যে আমাদিগকে কেবলি বলিয়াছেন যে, তিনি সেই সমস্ত বিশ্বের একটি হাওয়া আমাদের এই আশ্রমের মধ্যে বহাইতে চান। আমরা এই একটুখানি জায়গার মধ্যে আছি, এবং পঠনপাঠন করিতেছি, এ সংস্কারটাকে দূর করিয়া ইহাই আমাদের দ্বারা সর্ব্বদা অনুভব করাইতে চান যে আমরা বিশ্বে আছি,—যেখানে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে একটা চিত্তশক্তি অহরহ অদ্ভুত সৃজনকাজে নিযুক্ত হইয়া আছে। সেই বিচিত্র জ্ঞান কর্ম্ম প্রেমের সৃজনের বিরাট ক্ষেত্রে আমরা আছি, সেইখানে কাজ করিতেছি, সেইখানে ভাবিতেছি, সেইখানে জ্ঞানলাভ করিতেছি—এই চেতনাটা যাহাতে বড় হয়—কেবল কতকগুলি বাহিরের শুষ্ক বিধিবিধান মানিয়া চলিবার অভ্যাস যাহাতে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া না বসে, তদ্বিষয়ে তিনি যাইবার পূর্ব্বে বারম্বার আমাদিগকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন।

তিনি যাইবার পূর্ব্বে দুএকটি নূতন প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। যেমন একটি, ছাত্র-অধ্যাপক সম্মিলনী। তাহার আভাস আমরা গত মাসের আশ্রম-কথায় তত্ত্ববোধিনীর পাঠকবর্গকে দিয়াছি। ছাত্রদের কাজেকর্ম্মে, দিনরাত্রি চালনাটাই যেন বড় হইয়া না উঠে, সাধনাটাই বড় হয়, এইজন্য যথাসম্ভব সকল বিষয়ে তাহাদিগকে অধ্যাপকগণের সহযোগী সহকর্ম্মী করিবার নিমিত্ত তিনি এই সম্মিলনীটি স্থাপন করিয়াছেন। ইহার দুইটা অধিবেশন হইয়াও গিয়াছে এবং কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও ব্যবস্থার নিমিত্ত ইহার অন্তর্গত একটি প্রতিনিধিসভাও স্থাপিত হইয়াছে।

এ প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ নূতন বটে, কিন্তু যদি ইহাকে আমরা ঠিকমত চালনা করিতে পারি—অর্থাৎ এইদিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখি যে কি করিলে ছাত্রদের সকল শক্তি চেতনায় পূর্ণ হয়, অভ্যাসে নহে, কি করিলে আশ্রমের সঙ্গে তাহাদের সকল সম্বন্ধ ভিতরকার সত্য সম্বন্ধ হইয়া উঠে, বাহিরের নহে, তবে বোধ হয় এ প্রতিষ্ঠানটি ক্রমেই বল পাইবে এবং ক্রমে সমস্ত বিদ্যালয়ের সকল কর্ম্ম যাহা এখন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে তাহা এইখানেই অখণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিবে।

এ সম্বন্ধে সংবাদদাতা কয়েকদিন পূর্ব্বে কবির নিকট হইতে যে পত্রটি পাইয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া গেল। তিনি লিখিতেছেন "আমি মানুষের শক্তির উপরেই সমস্ত শ্রদ্ধা রাখি—আমি জানি একবার মানুষের ঠিক মর্ম্মস্থানটি স্পর্শ করতে পারলেই অসাধ্য সাধন করা যায়। সেইখানেই সোনার কাঠি ছোঁয়াতে হবে, সেইখানকার ঘুম ভাঙাতে হবে, বিশ্বের সঙ্গে সেই জায়গাকার যোগের পথটাকে কেবলি প্রশস্ত করে তুলতে হবে। তোমরা মানুষের মনোলোকটা ছেলেদের কাছে সুপরিচিত করে দাও, এই লোকটা যে একটা সত্যলোক এইটে তারা এখন থেকে বুঝতে শিখুক। আমাদের

দেশে এই জায়গায় ভয়ানক জড়ত্ব এসেছে—আমরা সম্পূর্ণ মনের সঙ্গে আইডিয়াকে বিশ্বাস করিনে। তাই সকল ভাবই আমাদের কাছে পুতুল হয়ে ওঠে। ওটাও আমাদের একটা পৌত্তলিকতার মধ্যে দাঁড়িয়েছে—আমাদের প্যাট্রিয়টিজম্‌ও তাই। শিশুকাল থেকে প্রকৃতি এবং মানুষের সঙ্গে আমাদের সংস্রব ঘনিষ্ঠভাবে সত্য হয়নি বলে আমরা অন্য দেশের ভাবের জিনিষগুলোকে নিজের জীবনের সঙ্গে সত্যভাবে যুক্ত করে নিতে পারিনে, সমস্তই কেবল বাহ্য পৌত্তলিকতায় এসে পৌঁছায়—কিছুতেই জোর পাইনে—মাটির খেলনা বারবার কেবল ভেঙে ভেঙে যায়।"

ঠিক এই কথাগুলিই বিদায়ের দিনেও সকল অধ্যাপকগণকেও তিনি বলিয়াছিলেন। তিনি ছেলেবেলায় যে জেসুইট্ পাদ্রীদের কলেজে পড়িয়াছিলেন, যেখানে বড় বড় পণ্ডিতরা ছোট ক্লাসে শিক্ষাদানের ভার ধর্ম্মব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিয়া ভগবানের আদেশপালনের ন্যায় তাহা সম্পন্ন করিতেন, সেই উদাহরণটি দিলেন এবং বলিলেন যে সেই বড় একটি সাধনার মধ্যে যদি সমস্ত কাজকর্ম্মগুলি অনুষ্ঠিত হয় তবেই আমাদের মধ্যেও আইন বড় না হইয়া আইডিয়া বড় হইয়া উঠিবে। নহিলে শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা যতই পাকা হোক, আসল জিনিষটারই অভাব ঘটিবে। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা ধর্ম্মব্রতের মত, ঈশ্বরের বিধানপালনের মত করিয়া কর্ম্ম করিব, ততদিন আমাদের নিয়ম আনন্দরূপ ধারণ করিবে না, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের শ্রীর আবির্ভাব হইবে না।

আশ্রমে প্রাতঃসন্ধ্যায় জাগরণকালে ও রাত্রে শয়নের পরে বিশ্রামকালে কয়েকটি গায়ক বালকদিগকে লইয়া একটি বৈতালিকদল তিনি তৈয়ার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহারা ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া ঘুম ভাঙাইবে এবং ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া কর্ম্মশেষ করিয়া বিশ্রামে যাইবে। ইহাও একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হইয়াছে।

এই ফাল্গুন মাসে আর দুইটি অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে—দুইজন মহাপুরুষের উৎসব—ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের। ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতে যথোপযুক্ত আয়োজন করা হয় নাই—অথচ এই উৎসবগুলি এ আশ্রমের একটি বিশেষ জিনিস। ইহার উদ্দেশ্য মহাপুরুষের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি কি, কেবল সেই সংবাদমাত্র দেওয়া নহে ; ইহার উদ্দেশ্য উৎসবের দিনে নানা উপায়ে মহাপুরুষের চিত্তের সঙ্গে সাধনার সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপনের চেষ্টা। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না হইলে এ কাজটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

বুদ্ধ-উৎসব মন্দ হয় নাই—সায়ংকালে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় মুক্ত প্রান্তরে উপাসনা হইয়াছিল এবং তাহা সকলেরই খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

স্বর্গীয় সুহৃদকুমার সেনগুপ্ত।

গত ২৯-এ পৌষে আমরা আমাদের একজন অত্যন্ত প্রিয় আশ্রমবন্ধুকে নিদারুণভাবে হারাইয়াছি। সুহৃদকুমার সেনগুপ্ত মাঘোৎসবে যোগদান করিবার জন্য অপরাহ্ণের রেলগাড়িতে কলিকাতায় যাইতেছিলেন, বর্দ্ধমানে এক্‌স্‌প্রেস ধরিয়া কলিকাতায় শীঘ্র পৌঁছিবার আশায় চলন্ত গাড়ী হইতে নামিতে গিয়া রেলের তলায় পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। যে দেবতা মৃত্যুরূপে আমাদের প্রিয়জনকে আপন বক্ষে গ্রহণ করেন, আশ্রমবাসীদের সেই দেবতাকে অত্যন্ত গভীরভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা আজিও সেই দৃষ্টি লাভ করিতে পারি নাই বলিয়া কেবল দারুণ আঘাতমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। সুহৃদকুমার আমাদের অন্তরের যে কতখানি অধিকার করিয়াছিল তাঁহার এই নিদারুণ মৃত্যুর পরেই তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারিয়াছি। এই শোক যে তাঁহার স্নেহময়ী জননী ও স্নেহময় গুরুজনবর্গ কিরূপে সহ্য করিতেছেন তাহা জানি না।

ভগবান আমাদের পরলোকগত আশ্রমবন্ধুর আত্মাকে পরম শান্তিদান করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত জননী, পরিজনবর্গ ও বন্ধুগণের হৃদয়ে গভীর সান্ত্বনা প্রদান করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

নিম্নে একটি আশ্রম-বালক-কর্ত্তৃক লিখিত সুহৃদের জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

শ্রীঃ—

সুহৃদের জীবন আলোচনা করিলে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে একটি সরলতা ও ব্যাকুলতার মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহাকে কত সময় আমরা উপহাস করিয়াছি। সে ব্রহ্মসঙ্গীত করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। আমরা তাহার সেই ব্যাকুলতাকে কৃত্রিমতা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। আমরা বলিয়াছি "সুহৃদ, কেবল গানের সময় ভাবে মাতোয়ারা হইলে চলিবে না।" সুহৃদ উত্তর করিয়াছে "ঠিক বলিয়াছ ভাই—কেবল গানই গাই দৃঢ় চরিত্র হইল না।" অন্যের পরিহাসে তাহাকে কোনদিনই আমরা লেশমাত্র ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ হইতে দেখি নাই। তাহাকে দোষ দিব কি, সে যে আপনিই সমস্ত দোষ কবুল করিয়া লইত! কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিয়া বেশীদিন সে চুপ করিয়া থাকিতেই পারিত না। বিবাদ হইলে অন্যপক্ষের যতই অপরাধ থাক, সে নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ লইয়া ক্ষমা চাহিত। তাহাকে কেহ কোনদিন গম্ভীর হইতে দেখে নাই। সকল সময়েই সে প্রফুল্ল ও হাসিখুসী। প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যেই সে ছিল। "সে ছিল" বলিলে ভুল বলা হয়, বলা উচিত সে অগ্রণীরূপে থাকিত। সরলতা ও উৎসাহ তাহার এতই প্রচুর এবং এতই সহজ ছিল।

সুহৃদের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব ছিল এবং ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতাও ছিল। সেই

কারণেই তাহার হৃদয় অত সরল, অত মধুর ছিল। তাহার বড় অপরাধ তো আমরা কেহ দেখি নাই—কিন্তু সামান্য অপরাধকেও সে কত বড় করিয়া দেখিত এবং তাহার জন্য কি তীব্র অনুতাপ অন্তরে অনুভব করিত। পাথরের উপরে ধূলা বালি জমিলে তাহা তো তাহাকে বাজে না, কিন্তু ফুলের উপর কি কোন মলিন আবর্জ্জনা সহ্য হয়! তাহার ঈশ্বরভক্তি, তাহার শিশুর মত অকপট প্রাণ, তাহার নির্ম্মল স্বভাব এইজন্যই সামান্য এতটুকু দোষে সে কত বেদনা পাইত।

সে একদিন আমাকে বলিয়াছিল—"ভাই, সূর্য্য উঠিতে না উঠিতে উপাসনায় গিয়া বসিতাম, সূর্য্যোদয় দেখিয়া উপাসনায় বেশ মন জমিত, কিন্তু এখন সারা উপাসনার সময়টা বাজে কুচিন্তা আসে। গান গাহিলে পূর্ব্বে তবু একটু সরস হইতাম, কিন্তু এখন তাও নয়। এখন অবধি বেড়াইয়া চেড়াইয়া উপাসনা করিব, চক্ষু বুজিয়া ভণ্ডের মত থাকা আর ভাল নয়।"

তাহার সেদিনকার কথার ভিতর এমন একটি ব্যাকুলতা ছিল, যে তাহাকে না দেখিলে সে যে কত অকৃত্রিম তাহা কেহই বুঝিবে না ; বানানো কথা সে বলিতেই পারিত না। ভগবান তাহাকে বুদ্ধিবৃত্তি কল্পনাবৃত্তি দিয়াছিলেন শুধু ঐ একান্ত ব্যাকুলভাব, সরল একনিষ্ঠতা।

আমি জানি কোন কোন আশ্রমবাসী তাহাকে ভণ্ড বলিয়া উপহাস করিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এক চিঠি লিখিয়াছিল। "আমি যে ভণ্ড ও দুর্ব্বল ইহা তোমরা জান, আমাকে ক্ষমা করিও।" তাহার পত্রের ভিতর এই ছত্রটি লিখিত ছিল।

আরেকটি দিনের কথা মনে আছে। একবার আমাদের ইংরাজীর অধ্যাপক মহাশয় কলিকাতায় যাওয়াতে অন্য একজন অধ্যাপক মহাশয় ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণী ও তন্নিম্ন শ্রেণী একত্র করিয়া পড়াইবার প্রস্তাব করেন। ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর বালকেরা কেহ কেহ অভিমানপূর্ব্বক ক্লাসে গমন করে নাই, সুহৃদকুমারও লজ্জায় ক্লাসে যাইতে বিলম্ব করিয়াছিল ; কিন্তু কিছু সময় পরে আমি তাহাকে একটু বুঝাইয়া বলিলে সে আস্তে আস্তে বলিল "ঠিক বলিয়াছ ভাই, আর দলে ভিড়িব না।" শুধু এই বলা নয়—সে সকলের আগে অধ্যাপক মহাশয়ের নিকটে গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

তাহার শরীর অপটু ছিল—তথাপি ব্রতপালনের মত করিয়া কঠিনভাবে জীবনযাপনের জন্য তাহার ব্যগ্রতা দেখা যাইত। সে অনেক আরাম হইতে বঞ্চিত থাকিত, অনেক কঠোর নিয়ম ইচ্ছাপূর্ব্বক পালন করিত। একজন পণ্ডিত বা মস্ত লোক হইবে সে উচ্চাভিলাষ তাহার ছিল না, সে কেবল চাহিয়াছিল নির্ম্মল হইয়া ভগবানের কাছে আপনাকে নিবেদন করিতে—সেই একটি সহজ সরল ভক্তির মাধুর্য্যে তাহার হৃদয় পূর্ণ ছিল।

২৭/২৮শে পৌষ পর্য্যন্ত জ্বরে ভুগিয়া সে সারিয়া উঠিল। তাহার বিশ্বাস ছিল

যে ১লা মাঘ প্রাতঃকালেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উৎসবের উদ্বোধন করিবেন—সেই জন্য সে তাড়াতাড়ি করিয়া ২৯শে পৌষ সংক্রান্তির দিনে দুপুরের গাড়ীতে রওনা হইল। তাহার কি ব্যাকুলতা! সমস্ত উৎসবটি সে আগাগোড়া থাকিবে, সকলের সঙ্গে ভগবানের নাম করিবে এই তাহার ইচ্ছা। দুপুরের গাড়ীটা অনেক রাত্রে গিয়া পৌঁছায়—সে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় পৌঁছিবার জন্য বর্দ্ধমানে একস্‌প্রেস্‌ ধরিতে গিয়া চলন্ত গাড়ী হইতে নামিতে গিয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

তাহার একটি ক্ষুদ্র দৈনিকলিপি ছিল। তাহার মধ্যে একদিন জন্মদিন উপলক্ষে সে লিখিয়াছে "আমি আজ আঠার বৎসর সমাপ্ত করিয়া ১৯ বৎসরে পদার্পণ করিলাম। পিতা, ১৮ বৎসর পূর্ব্বে এই রকমই একদিন সুন্দর প্রভাতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পিতা, তখন আমি কত সুন্দর ছিলাম ও কি পবিত্র ছিলাম, কিন্তু আজ আমার সারা গায়ে ধূলা লাগিয়াছে। হে ভগবান্‌, আমাকে নির্ম্মল কর।"

আর একদিনকার দৈনিকলিপিতে লিখিয়াছে—"বৎসরের মধ্যে ৩৫০ দিন সুস্থ থাকি আর ১৫ দিন হয়ত অসুস্থ থাকি। আমরা এমনই অধম যে কেবলই সেই ১৫ দিনের কথাই আমরা মনে করি। আর ৩৫০ দিন যে সুস্থ ছিলাম, সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিই না। আমাদের এত দাবী কিসের?"

ভগবান তাহার ব্যাকুল আত্মাকে স্বক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। তাহার জীবনের যে একটি আশ্চর্য্য সরল বিশ্বাসী ব্যাকুল ও স্নিগ্ধ মূর্ত্তি আমরা দেখিয়াছি তাহাই এই আশ্রমে চিরদিন স্মৃতির সামগ্রী হইয়া রহিল। পবিত্রতা যে কত সুন্দর, নম্রতা যে কত মধুর, তাহা আমরা জানিলাম। ভগবানের চরণে আমাদের প্রার্থনা এই যে তিনি আমাদিগকে সেইরকম অকৃত্রিম একটি ভক্তি, নিষ্ঠা দিন—আমাদের চরিত্রকে নির্ম্মল করুন।

আশ্রমবালক।

অগ্নিকাণ্ড

২২শে মাঘ রাত্রে আমরা আহার শেষ করিয়া আসিয়া দেখি, দক্ষিণদিকের আকাশ দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে; বুঝিলাম কোথাও আগুন লাগিয়াছে—মনে হইল অত্যন্ত নিকটে বুঝি বা আমাদের অদূরবর্ত্তী ভুবনডাঙা গ্রামে। আমাদের কয়েকজন অধ্যাপকের নায়কতায় আমরা ৩৫জন ছাত্র আগুন নিভাইবার কাজে বাহির হইলাম। কিছুদূর যাইতেই বুঝা গেল আগুন বোলপুর বাজারে লাগিয়াছে।

সেখানে গিয়া দেখি, এক ছুতারের ঘরে ও তাহার পশ্চাতের বাড়িতে আগুন ধরিয়াছে, ছুতারের বাড়িতে একঘর তক্তা বোঝাই করা এবং তাহার পিছনের বাড়িতে দুই গোলা ধান। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। চারিদিকে বিস্তর লোক জমিয়াছে কিন্তু আগুন নিভাইবার জন্য কেহ কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছে না। যাঁহাদের বাড়ি

কাছাকাছি তাঁহারা নিজ নিজ চালের উপর চার পাঁচ কলস জল লইয়া বসিয়াছিলেন। আমরা তাহাদের কাছে কলসি চাহিলাম, তাঁহারা বলিলেন, কলসি বাহির করিয়া দিলে নষ্ট হইয়া যাইবে, আর তাহা ঘরে লইতে পারিব না অতএব দিব না। তখন আমরা উপায় না দেখিয়া তামাকের দোকান হইতে জোর করিয়া কয়েকটি টিন লইয়া পাতকুয়া হইতে জল তুলিতে গেলাম। অনেকেই ঘরের পাতকুয়া হইতে জল তুলিতে বারণ করিলেন। তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে অতিরিক্ত পরিমাণে জল তুলিলে জল ঘোলা হইয়া যাইবে। আমরা তখন নিকটের পুকুর হইতে ও রাস্তার ধারের একটি পাতকুয়া হইতে জল তুলিবার ব্যবস্থা করিলাম। আমাদের কয়েকজন জল টানিবার ও অবশিষ্ট কয়েকজন আগুন নিভাইবার ও জিনিসপত্র সরাইবার ভার লইলাম, কেবল নিকটস্থ বাঁধগোড়া স্কুলের তিনজন ছাত্র ও স্থানীয় দুইজন ভদ্রলোক আমাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন। এছাড়া কয়েকজন কাবুলিওয়ালা প্রাণপণ যত্নে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। অনেক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ঐ অগ্নিময় বাড়ির সম্মুখে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। কয়েকজন ভদ্রলোক কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিলেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ পরে "চল চল নিমন্ত্রণ খাই গিয়া" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, আর যে কয়েকজন লোক ঘুরিতেছিলেন তাঁহাদিগকে আমরা সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেই তাহারা সরিয়া পড়িলেন। অদূরে তখন যাত্রাগান চলিতেছিল, বোধকরি অগ্নিকাণ্ড কোলাহলে শ্রোতাদের কিছু বিঘ্ন হইতেছিল কিন্তু সঙ্গীত ও ঢোলকের বাদ্য সমতালে চলিতেছিল। সেই সময় দারোগাবাবু কয়েকজন চৌকিদার লইয়া উপস্থিত হইলেন। চৌকিদারের শাসনে যখন পাড়া প্রতিবেশীরা আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল তখন আগুন নিভিয়া গিয়াছিল। আমরা কাজ শেষ করিয়া যখন আশ্রমে ফিরিলাম তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, যাত্রা আরম্ভে ভুবনডাঙার কাছে আসিয়া যখন দেখা গেল আগুন বোলপুরেই লাগিয়াছে তখন একবার মনে করিয়াছিলাম সেখানে লোকের অভাব নাই, আর আমরা তো সংখ্যায় অতি অল্প, আমাদের দ্বারা বিশেষ কি কাজ হইবে? কিন্তু লোক থাকিয়াও যে লোক না থাকা কাহাকে বলে তাহা এবার আমরা দেখিলাম, এবং ইহাও দেখিলাম বিদেশী কাবুলিওয়ালা বিপন্নকে উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে আর পাড়া প্রতিবেশীর সাড়া নাই। এবং সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য কলসি ব্যবহার করিলে তাহা নষ্ট হইবে এই চিন্তায় প্রতিবেশীর ঘর জ্বলিয়া যাইতে দিতে দ্বিধাবোধ হইল না। অথচ ইহাতে সন্দেহ নাই যে যদি যথাসময়ে আগুন না নিভান হইত তবে বোলপুর বাজারে অল্পই ঘর রক্ষা পাইত। যাহারা পরের ঘর এমন উদাসীনভাবে পুড়িতে দেখিতে পারে তাহারা নিজের ঘরে নিরাপদবাসের কি যোগ্য?

আশ্রমবাসী

চৈত্র ১৮৩৩ শক। পৃ. ২৯১-২৯৪

সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে আমাদের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় নানা কারণে আশ্রম হইতে বিদায় লইয়াছেন। তিনি সাত বৎসরেরও উপর এই আশ্রমের সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ও উদার প্রকৃতি, গভীর পাণ্ডিত্য, ছাত্রদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্ন তাঁহাকে ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেরি গভীর শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করাতে আশ্রমবাসী মাত্রেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি যেখানেই থাকুন আশ্রমের সহিত তাঁহার যোগ কদাপি বিচ্ছিন্ন হইবার নহে, ইহা আমরা নিশ্চয়ই জানি।

জনৈক আশ্রমবাসী

চৈত্র ১৮৩৩ শক। পৃ. ২৯১-২৯৪

আশ্রম-কথা

গত বৎসর পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের নানা সংবাদ আমরা তত্ত্ববোধিনীর পাঠকপাঠিকাগণকে দিয়াছি।

অধ্যয়ন-অধ্যাপনা সম্বন্ধে আমরা অল্পই লিখিয়াছি। এ বৎসর সেই ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবার চেষ্টা করিব।

আশ্রমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিতরূপে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি :—

আশ্রমে প্রদত্ত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর "শান্তিনিকেতন" উপদেশাবলী, তাঁহার গদ্য গ্রন্থাবলীর "শিক্ষা" খণ্ডে "শিক্ষাসমস্যা" নামক প্রবন্ধ, গতমাসে একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলনীতে পঠিত তাঁহার রচিত "ধর্ম্মশিক্ষা" নামক প্রবন্ধ, সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত "গুরুদক্ষিণা" নামক গল্প ও রবীন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক লিখিত ঐ গ্রন্থের ভূমিকা, এবং শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ব্রহ্মবিদ্যালয়" নামক আশ্রমের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস।

আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিশেষত্ব কি, অনেকেই জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমরা ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়াইয়া থাকি : সুতরাং সহজেই মনে হইতে পারে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, আমরাও সেই সকল বিষয়ই শিক্ষা দিই। এবং হয়ত দুই একটা বিষয়, যেমন বিজ্ঞান প্রভৃতি অতিরিক্ত শিক্ষা দিয়া থাকি।

বিষয় একই বটে, কিন্তু শিক্ষার সময়, শিক্ষার প্রণালী পদ্ধতি, সমস্তই স্বতন্ত্র। আমরা দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত ইস্কুল ঘরের মধ্যে ত্রিশ বা চল্লিশটি ছাত্রকে এক এক শ্রেণীতে আবদ্ধ করিয়া শিখাইবার পক্ষপাতী নহি। আমরা বলি অধ্যাপক প্রত্যেক ছাত্রকে বিশেষভাবে জানিবেন। তাহার মানসপ্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিশেষ

সুযোগ তাঁহার থাকা ধর্ম্মনৈতিক কর্ত্তব্য। তারপর মুক্ত আকাশ, মুক্ত আলো-বাতাস শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিকাশের পক্ষে তুল্য প্রয়োজন। সমস্ত দিনই পঠনপাঠনের আবহাওয়ার মধ্যে ছাত্র বাস করিলে, পড়াটা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে মিলিয়া যাইতে পারে। সেইজন্য দিনের এক সময়ে না হইয়া, সকালে বিকালে পড়ার ব্যবস্থা হওয়া ভাল। প্রচলিত বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই সকল জায়গায় আমাদের অনৈক্য আছে।

কিন্তু সময়, স্থান ও ক্লাসের গঠন সম্বন্ধে এই সকল পার্থক্য আমাদেরি স্বকীয় মনে করিবার কোন হেতু নাই। দুইবার পড়াইবার ব্যবস্থা না থাক, আমেরিকায় ৯টা হইতে বারটা পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে অনেক ইস্কুলেই পড়ানো হইয়া থাকে। ফ্রান্সেও অনেক বোর্ডিংস্কুলে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

ছাত্রদের মানসপ্রকৃতি অধ্যাপকের তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য এ মতটিও নূতন নহে। ইউরোপ আমেরিকায় এ কার্য্য সর্ব্বত্রই গৃহীত হইয়াছে। আমেরিকার শিক্ষকমণ্ডলী একবার শিশুপ্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাদের পরীক্ষার ফলগুলি বাহির করিয়াছিলেন—তাহার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করিতেছি :—

"ইহা দেখা গিয়াছে যে অনেকগুলি শিশু যাহাদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া মনে করা হয়, তাহারা নাসায় কিম্বা Pharynx-এ কোন বাধা থাকিবার জন্য কাণে কম শোনে বলিয়া বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখাইতে পারে নাই। ডাক্তার তাহাদিগকে চিকিৎসা করার পর তাহারা পাঠে আশ্চর্য্য উন্নতিলাভ করিয়াছে। শিশু নিজেই পূর্ব্বে কোন রোগে ভুগিয়া থাকিলে বা পিতামাতা হইতে কোন রোগের বীজ তাহার মধ্যে আসিয়া থাকিলে, সেই রোগ বা রোগের ভাব তাহার বুদ্ধিকে আক্রমণ করিবেই। এ সকল বিষয় না জানিয়া কোন ছেলেকে নির্ব্বোধ বলিয়া তাড়না করা মূঢ়তা। অনেক সময় এ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিলে রোগের প্রভাব সম্পূর্ণতঃ না হোক, অংশতঃ দূর হইতে পারে।

"শিশুরা ক্রমাগত আপনাদের শক্তিকে খাটাইতে ভালবাসে, তাহারা যাহা দেখে তাহাই অনুকরণ করে; তাহাদের সেই শক্তি যেখানে নিরুদ্ধ সেখানে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও হ্রাস পাইয়া থাকে।

"মন যখন শ্রান্ত শরীরও তখন শ্রান্ত হয়, তখন বাঁধাধরা শারীরিক শ্রম করানোও ঠিক নয়—সকল বাঁধাবাঁধি হইতে ছাত্রকে অব্যাহতি দিলেই ভাল ফল পাওয়া যায়।

"কোন কোন শিশু চোখ দিয়া বেশি শেখে, কেহ কাণ দিয়া বেশি শেখে—সুতরাং ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষের তারতম্য বিচার করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত।" ইত্যাদি।

সুতরাং একথা সমস্ত সভ্যদেশে সর্ব্ববাদিসম্মত যে ছাত্রকে না জানিয়া না

চিনিয়া তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। তাহাকে বিশেষভাবে শরীর, মন, অভ্যাস সংস্কার সকল দিক দিয়াই জানিয়া লইতে হইবে। ইংলণ্ডে একটা প্রবাদ বচন আছে যে A teacher must learn to watch the child as the sailor watches the weather.

তারপর মুক্ত আলো-বাতাসের মধ্যে খোলা জায়গায় পড়া যে প্রশস্ত একথা আজকাল ইউরোপে শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা সকলেই প্রায় বলেন। এরূপ বিদ্যালয়ও সে দেশে বিস্তর আছে। সাধারণতঃ University সহরগুলিই অত্যন্ত রমণীয়—ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজকে নগর না বলিয়া স্বচ্ছন্দে গ্রাম বলা যাইতে পারে। যাহা হৌক পঠনের সময়, স্থান ও ক্লাসের গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে এই সকল কথা আমাদের সকলেরি আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আমাদের আরেকটি স্বাতন্ত্র্য এই যে, আমরা বাংলা ভাষার চর্চ্চার দিকে একটু বেশি মনোযোগ দিই। আমরা মনে করি যে নিজের ভাষার ভিতর দিয়াই ছাত্রদের বোধশক্তি, কল্পনাশক্তি, প্রকাশক্ষমতা ঠিকমত উদ্বোধিত হইতে পারে। সুতরাং আমরা বাংলাসাহিত্যও ভাল করিয়া পড়াইবার চেষ্টা করি।

যন্ত্রের শিক্ষায় একটা সুবিধা আছে এই যে, সেখানে সকল মানুষই এক ছাঁচে গড়িয়া উঠে—সবাই I am বলিবে I is বলিবে না, ধাতুরূপ ঠিক মুখস্থ বলিবে, ২ এর সঙ্গে ২ যোগ করিলে ৪ হয় বলিবে। মানুষের চিত্তশক্তিকে জাগাইবার চেষ্টা করিলে যান্ত্রিক প্রণালীর উপর ষোল আনা আস্থা রাখা চলে না।

কিন্তু আমাদের দেশে নাকি মানুষকে যন্ত্র করিয়া দেখিতে বেশি আরাম বোধ হয়, তাহাকে স্বাধীন চিত্তরূপে দেখিতে ভয় হয়। কল্পনা, অনুভূতি, বুদ্ধি ঠিকমত বিকশিত না হইলে অনেক সময় অকালপক্কতার সৃষ্টি হয়, ইহাই আমাদের আশঙ্কা।

জগতের ধর্ম্মাচার্য্যগণ যে সত্য মানুষকে দিয়াছেন, মানুষ আপনার বোধশক্তির ন্যূনতাবশতঃ তাহাতে বিকার ঘটাইয়াছে। কিন্তু সেজন্য কি ধর্ম্মাচার্য্যগণের নীরব থাকাই বিধেয় হইত? চিত্তের শিক্ষা দিতে গেলে যদি অকালপক্কতা ঘটে, তবে তাহা ব্যক্তিবিশেষের গ্রহণ করিবার শক্তির অভাববশতঃ, সেজন্য এইরূপ শিক্ষার চেষ্টা নিন্দনীয় হইতে পারে না।

আমাদের বিশ্বাস, যে বাংলা ভাষায় আমাদের ছাত্রগণ সর্ব্বদা বলিতে, লিখিতে, ভাবিতে অভ্যস্ত বলিয়া, বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া অধিকাংশ বিষয় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া এবং উচ্চ সাহিত্যের সহিত তাহাদিগকে বিশেষভাবে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত সামান্য ক্ষীণতম পরিমাণেও একটা মানস-উদ্বোধন হয়।

বলা বাহুল্য এ বিশেষত্বও বিশেষত্ব নহে, কারণ এ দুর্ভাগ্য দেশ ব্যতীত অন্যত্র সর্ব্বত্রই মাতৃভাষার চর্চ্চাই সকলের অপেক্ষা অধিক করিয়াই হয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাগজে পড়িয়াছিলাম যে ইংলণ্ডের Public schools সকল পরিদর্শনার্থ একটা শিক্ষা কমিশন বসিয়াছিল। কমিশনের সভ্যগণ সকলেই খুব পণ্ডিত ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে পাঠের প্রতি একটা স্বাভাবিক আন্তরিক অনুরাগ, বা পঠন ব্যাপারে একটা উৎসাহ প্রায়ই দেখা যায় নাই এবং তাহার কারণ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন দুইটি ; ১ম, "স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি অত্যন্ত নীরস ও নিরানন্দজনক— ২য়—পড়া ব্যাপারটা যে একটা বৃহৎ মানসলোকে প্রবেশ করাইবার উপলক্ষ্য মাত্র এই কথাটা ছাত্রদের মনের মধ্যে মুদ্রিত হয় নাই।" "They learned to distinguish nouns from verbs, how to parse etc, but could not understand the good of it, and had no interest in it."

ইংলণ্ডের ইস্কুলে মাতৃভাষার চর্চ্চা এত অল্প হয়, যে সেখানে অধিকাংশ লোক দাঁড়াইয়া দুকথা বলিতে পারে না, ঘামিয়া, মাথা চুলকাইয়া অনেক কষ্টে দুটা কথা বাহির করে। তাহাদেরি যদি এই অবস্থা তো আমরা আছি কোথায়!

ফ্রান্সে এ বিপদ নাই। অল্প বয়স হইতে ফরাসী ভাষায় ফরাসী বালক সুন্দর রচনা করিতে শিক্ষা করে। তাহাকে Corncille, Racine, Moliere, Victor Hugo, Fenelon, La Bruyvre, প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যিকের নাটক, কাব্য, গদ্যপ্রবন্ধ পড়ানো হয়, সমালোচনা করিয়া রসগ্রহণ করানো হয়। "When a French boy leaves school, his mind is stored with thc gems of his literature, and the critical spirit of his nation thoroughly imbued." ফরাসী বালক যখন বিদ্যালয় ত্যাগ করে, তখন তাহার সাহিত্যের রত্নরাজিতে তাহার মনের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে, সে তাহার জাতির অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া যায়।

আমেরিকাতেও ইংরাজী ভাষা ইংলণ্ড অপেক্ষা অধিক শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া শোনা যায়। ইংরাজেরাই বলেন "There is more English teaching in the most scientific or industrial school in America then in the majority of secondary or public schools in England."

পাঠকের মনে এখানে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বাংলার দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া হইলে হয়ত ইংরাজী ভাষার দিকে তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় না। ছাত্রদের বাংলা রচনায় যত উৎসাহ ইংরাজী রচনায় কি তত উৎসাহ দেখা যায়? না। কারণ, এরূপ প্রশ্নই অসঙ্গত। নিজের ভাষায় ছাড়া আমরা আমাদের চিত্তবৃত্তির স্বাধীন প্রকাশ অন্য কোন ভাষায় করিতেই পারি না। ইউরোপে কোন বহু ভাষাবিদ্ মহাজ্ঞানীও নিজের ভাষাব্যতীত অন্যভাষায় কথা কহিতে বা লিখিতে পারেন না এবং সে জন্য আমাদের দেশের ইংরাজী শিক্ষাভিমানী লোকের ন্যায় লজ্জিত হন না। বাংলা রচনায় আমরা যে পরিমাণ স্ফূর্ত্তি বোধ করিব ইংরাজী রচনায় সেই রকম স্ফূর্ত্তি পাইব, ইহা স্বাভাবিক নহে।

কিন্তু তাই বলিয়া ইংরাজী ভাষার দিকে মনোযোগ দেওয়া হয় না, এ আশঙ্কা অমূলক। কারণ ইংলণ্ডে যেমন ফ্রেঞ্চ শেখে, বা ফ্রান্সে যেমন ইংরাজী শেখে, আমাদের ইংরাজী শেখা সে রকম সখের শেখা নয়। ইংরাজী ভাষা ভালরূপে না শিখিয়া আমাদের উপায় নাই। ইংরাজী ভাষায় বিশ্বের সকল সম্পদকে জড়ো করিয়াছে। তারপর সমস্ত মনুষ্যসমাজ আমাদের ভাষা পড়িবে না, সুতরাং ইংরাজীর ভিতর দিয়া সকল জগৎকে আমাদের বক্তব্য জানাইতেই হইবে। ইংরাজীকে যেমন তেমন করিয়া শেখা আমাদের অবস্থায় চলে না।

প্রায় দশ এগার বৎসর কাল হইল ফ্রান্সে ইংরাজী ভাষা Direct method অর্থাৎ কথাবার্ত্তার স্বাভাবিক প্রণালীর ভিতর দিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইয়াছে। এখন এমন হইয়াছে যে ফ্রান্সে ইংরাজী ক্লাসে ফরাসী ভাষায় কথা কহাই নিষিদ্ধ। ক্লাসঘরের চতুর্দ্দিকে ইংরাজীতে বিজ্ঞাপন, ছড়া প্রভৃতি নানা রকম লেখা লট্‌কাইয়া দেওয়া হয়। গোড়ায় কথা বলিয়া বলিয়া শিখাইয়া তারপর ইংরাজী পুস্তক যখন ধরানো হয় তখন ভাষার ভিতর দিয়া দুই ভাষার ব্যাকরণের স্বাতন্ত্র্য বুঝাইবার সুবিধা হয়।

জর্ম্মাণী এ সম্বন্ধে পথপ্রদর্শক। আজকাল বিদেশীভাষা এই প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই প্রায় প্রচলিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়েও এই Direct method-এ শিক্ষা দিবার জন্য, ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা, ইংরাজী সোপান প্রভৃতি পুস্তক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যতদূর সম্ভব মুখে মুখে শিখাইয়া লইয়া পরে পুস্তক হাতে দেওয়া বিদ্যালয়ের অভিপ্রেত ছিল। বারান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর দিবার ইচ্ছা রহিল। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধেও আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীঃ

প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ।

[আশ্রমের ছাত্রগণ এখানকার কীটপতঙ্গ গাছপালা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয় যাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে, আমরা এ বৎসর হইতে মধ্যে মধ্যে সেই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফল তাহাদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিব। ইংলণ্ডে Nature-study বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে একটি প্রধান বিষয়। শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিলাতী অনেক কাগজে বালকদিগের সঙ্কলিত প্রাকৃতিক সংবাদ প্রতিমাসে বাহির হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এ বিষয়টি কোথাও শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া জানি না, এবং এরূপ পর্য্যবেক্ষণের স্পৃহারও আমাদের দেশের লোকের মধ্যে

একান্ত অভাব। সুতরাং আমরা আশা করি যে এ অংশটি পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করিবে।]

শ্রী অঃ।

(১) গুটিপোকা ও প্রজাপতি।

ডিম ও তাহার সংস্থান।

আমাদের আশ্রমে যে তসরের গুটিপোকা দেখিয়াছি তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। ইহাদের ডিমগুলি গোল পেয়ারার বিচির ন্যায়, মাঝখানে একটি লাল রেখা চলিয়া গিয়াছে। এইগুলি পাতায় লাগান থাকে, তজ্জন্য গুটিপোকা বাহির হইয়াই খাইতে পায়। ইহাদের সাধারণতঃ আমরা শালগাছেই দেখিয়াছি। ইহারা অন্য গাছেও থাকে। শরতের প্রারম্ভেই ডিমগুলি ফুটিতে আরম্ভ করে। তখন গুটিপোকাকে দেখিতে ঠিক শুঁয়োপোকার মত।

গুটি বাঁধিবার পূর্ব্বে পোকার আকৃতি ও জীবন।

এই পোকা শালের কচি পাতা খায় তজ্জন্য ইহাদিগকে পাতার গোড়ায় ও অতি উচ্চে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের শরীরের বর্ণ প্রথমে অল্প হরিতাভ থাকে ও পরে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে শুভ্র হইয়া যায়। ইহাদের শরীরে গোল গোল চক্রাকার মাংসসমষ্টি আছে। প্রত্যেক চক্রের উপরিভাগে দুইটি সোনালী রঙের ফোঁটা আছে। মধ্যবর্ত্তী জায়গাটি অল্প নীচু। এই স্থানেই দুই একটি রোম থাকে। অন্য কোথাও রোম নাই। প্রত্যেক চক্রের দুই পার্শ্বে দুইটি নীল রঙের ফোঁটা। শুভ্র শরীরে এই ফোঁটাগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। সাধারণতঃ ইহাদের দশটি করিয়া চক্র থাকে। ইহাদের প্রত্যেক দিকে আটটি করিয়া সব শুদ্ধ ষোলটি পা থাকে। তাহাদের মধ্যে সম্মুখের আটটি পা শরু ও তাহার অগ্রভাগে নখের মত একটি জিনিষ আছে। ইহা দ্বারাই ইহারা পাত ধরিয়া খায়। ইহার পরে মধ্যে অল্প ফাঁক, তাহার পর পশ্চাৎ দিকে আবার আটটি পা। এই পশ্চাতের পদদ্বারা শাখা চাপিয়া ধরিয়া ইহারা সঙ্কুচিত হইয়া যায় ও চক্রগুলিকে ছোট করিয়া আনে। পরে পাগুলিকে অল্প ঢিলা করে ও পুনরায় শরীরটাকে প্রসারিত করে ও এইরূপে ইহারা এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের মুখটি লাল রঙের ও তাহার সহিত অল্প কালো মিশ্রিত। মুখের মধ্যে চোখ দুইটি ঠিক দুটি ফোঁটার মত দেখায়। মুখের ভিতরে ছোট দুইটি লাল রঙের দাঁত আছে। তাহারই সাহায্যে ইহারা পাতা কাটিয়া কাটিয়া খায়।

গুটি বাঁধার ব্যাপার।

তাহার পর ইহাদের গুটি বাঁধার কথা। গুটি বাঁধিবার সময়ে ইহারা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় ও গুটি বাঁধিবার মত নির্জ্জন স্থান খুঁজিতে থাকে। পরে এক জায়গায় চারিদিকের পাতাগুলি নিজের মুখের রসের দ্বারা আটকাইয়া লইয়া একটি ছোটখাট পাতার ঘরের মত তৈয়ারী করে ও তাহার মধ্যে গুটি বাঁধিতে আরম্ভ করে। গুটি বাঁধিবার

পূর্ব্বে ইহারা বমি করিতে থাকে। ইহাদের মুখ হইতে একপ্রকার লাল আঠার ন্যায় রস নির্গত হয় এবং তাহাই ইহারা একটি শাখায় লাগাইতে থাকে। সেই রস শুকাইয়া গিয়া শক্ত কাঠির মত হইয়া যায় ও শাখার সহিত শক্ত হইয়া লাগিয়া থাকে। তখন তাহারই উপরে ইহারা গুটি বাঁধিতে থাকে। গুটি বাঁধিবার সময় ইহারা কিছু খায় না। পরে একপ্রকার রস বাহির করিয়া পাতায় লাগাইয়া গোল করিয়া গুটি বাঁধিতে আরম্ভ করে। এই রস শুকাইয়া তসর হয়।

গুটির অভ্যন্তরে পোকার অবস্থা।

গুটি তৈরী হইলে ইহারা সঙ্কুচিত হইয়া ইহার ভিতর ঢুকিয়া যায়, এবং মুখটি বন্ধ করিয়া দেয়। প্রথম কয়েকদিন ইহারা পূর্ব্বোক্ত সঙ্কুচিত আকারে থাকে, পরে অন্য আকার প্রাপ্ত হয়। পোকাটি পূর্ব্বের খোলস পরিত্যাগ করিয়া একটি ছোট লাল রকমের পোকা হইয়া যায়। ইহার সম্মুখ দিকটা সরু ও পিছন দিকটা বিস্তৃত থাকে। তখন কেবলমাত্র ইহার সরু দিকটা নাড়িতে থাকে ও অন্য দিকটা জড়ের ন্যায় স্থির থাকে। এই সময় ইহাকে জড় পোকা কহে। এই সময়েই গুটিপোকার যাহারা চাষ করে তাহারা ইহাকে গরম জলে ফেলিয়া মারিয়া ফেলে এবং গুটি কাটিয়া তসর সংগ্রহ করে।

প্রজাপতি।

সপ্তাহ কাল পরে ইহারা গুটি কাটিয়া প্রজাপতিরূপে বাহির হইয়া পড়ে। গুটি কাটিয়া যে প্রজাপতি বাহির হয় তাহাদের প্রত্যেক ডানাতে দুই দুইটি করিয়া চারিটি স্বচ্ছ বোতামের মত গোল দাগ হয় এবং শরীর একপ্রকার গুঁড়া জিনিষে আবৃত থাকে। প্রজাপতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, স্ত্রী ও পুরুষ। পুরুষেরা আকারে স্ত্রী অপেক্ষা ছোট এবং গায়ের গুঁড়ার রং অল্প সবুজ ; কিন্তু স্ত্রীরা খুব বড় হয় এবং ইহাদের শরীরের গুঁড়ার রং হলদে হয়। সেইজন্য ইহাদিগকে হল্‌দে এবং পুরুষদিগকে অল্প সবুজ দেখায়। স্ত্রী প্রজাপতিরা বৃক্ষশাখার অগ্রভাগের কচি পাতায় ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার সহিত একপ্রকার আঠা বাহির করে এবং সেই আঠার জন্য ডিমগুলি পাতায় লাগিয়া যায়। ইহা হইতেই পোকা বাহির হয়।

বংশু।

(২) অন্য এক শ্রেণীর প্রজাপতির জন্ম-ইতিহাস।

আমাদের প্রান্তরে আমরা এক প্রকার শুঁয়োপোকা দেখিয়াছি, তাহারা সচরাচর যে সকল শুঁয়োপোকা দেখা যায় তাহাদের মত একেবারেই নহে। ইহাদের শরীরের বর্ণ অনেকটা খয়েরের মত, দৈর্ঘ্যে ইহারা দেড় ইঞ্চির বেশী নয় পাশেও বেশী নয়। ইহাদের দেহে যে সকল কাঁটা থাকে তাহা সাধারণত যে শুঁয়োপোকা দৃষ্ট হয় তাহাদের কাঁটার মত অত পাশাপাশি ঘ্যাঁসা নয়, ও বিষাক্তও নয়, কাঁটাগুলির অগ্রভাগও তেমন

তীক্ষ্ণ নয়। ইহারা মাঠে মাঠে ছোট ছোট কচি কচি ঘাস খাইয়া জীবনধারণ করে। প্রজাপতি হইবার পূর্ব্বে ইহাদের দেহের খয়েরি রঙ অনেকটা পরিমাণ মলিন হইয়া আসে, বিশেষত বুকের কাছের ছোট ছোট পাগুলি শাদা হইয়া যায়, নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা অনেকটা কমিয়া আসে। তখন ইহারা লম্বা এবং উঁচু ঘাস কিম্বা মাঠে যে সকল বুনো খর্ব্বাকৃতি খেজুর গাছ আছে তাহার পাতা অথবা উঁচু মাটির ঢেলা প্রভৃতি আশ্রয় করে ও তাহাতে নিজের শরীরকে সংলগ্ন করিয়া মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলিয়া পড়ে ও সেই অবস্থায় ক্রমাগত নিজের শরীরকে সঙ্কুচিত করিতে থাকে। সেই সঙ্কোচনের ফলে সাত আট ঘণ্টার মধ্যেই ভিতরে ভিতরে ইহার শরীরে আর একটি নূতন আকার নূতন চর্ম্মসহ গঠিত হয়, এবং যখন তাহা সম্পূর্ণরূপে হইয়া যায় তখন বাহিরের খয়েরী রঙের চর্ম্ম বা আবরণ সাপের খোলসের মত উঠিয়া যায়। ইহার নূতন গাত্রাবরণটি শুভ্র এবং মধ্যে মধ্যে সাদার উপরে নানাবর্ণের চিত্র আঁকা। গাত্রাবরণটি পোকাটিকে এমনি আবৃত করিয়া রাখে যে তাহাকে আর তখন দেখাই যায় না। এইরূপে যখন শুঁয়োপোকাটি থলিয়ার মধ্যে ভিন্ন গঠনে অবস্থিতি করে তখন হইতেই তাহাতে প্রজাপতি তৈরী হইবার কার্য্য আরম্ভ হয় ; থলিয়ার মধ্যে যে পোকাটা আছে তাহা বুঝিতে পরিশ্রমের কোন প্রয়োজনই হয় না ; কারণ থলিয়া স্পর্শ করিলেই পোকাটা নড়াচড়া করিতে থাকে। তখন আমরা ঐ শুভ্র গাত্রাবরণের মধ্যে কালো কালো দাগ দেখিতে পাই। সাত আট দিনের মধ্যেই আবরণের মুখ ভেদ করিয়া প্রজাপতি বাহির হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পক্ষ ভিজা থাকে পরে রৌদ্রালোক প্রাপ্ত হইয়া বল পায়, ও উড়িয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে। এই প্রজাপতির পক্ষদ্বয় লাল ও কালো কালো সূক্ষ্ম ফোঁটায় সুন্দরভাবে চিত্রিত, লেজের অংশ শাদায় লালে মিশান, বক্ষ ও মস্তক সমুদয়ই ঘন কালো ও তাহার মাঝে মাঝে শাদা শাদা কয়েকটি ফোঁটার রেখা আছে। প্রধানত গ্রীষ্মের সময় ইহাদের জন্ম হয়, বর্ত্তমান সময় আশ্রমের শালগাছের ফুলে ও ঝাউগাছগুলিতে এই প্রজাপতি খুব দেখা যায়, মাঠে মাঠে বাসের মাথায় মাথায় অনেক শুঁয়োপোকা ও তাহার গুটিও দেখা যাইতেছে।

সুধাকান্ত।

(৩) বোল্‌তা।

মৌমাছির যেমন রাণী থাকে বোল্‌তাদেরও সেই রকম রাণী থাকে। সমস্ত শীত ঋতু তাহারা ঘরের চালের খড়ের মধ্যে অথবা অন্য কোন গোপন স্থানে ঘুমাইয়া থাকে। তাহার পর যখন বসন্তকাল আসে তখন তাহারা ঘুম হইতে জাগিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যদি বাসা বাঁধিবার বেশ একটি সুবিধামত স্থান পায় তবে তাহারা সেইখানে বাসা বাঁধিতে থাকে। প্রায়ই বাসাটা কোন একটা গাছে বাঁধে না হয় লোকালয়ে আসিয়া কোন দেওয়ালের কোণে ঝুলন্ত দড়িতে বাঁধে।

তাহাদের বাসানির্ম্মাণের উপকরণ কেবলমাত্র মাটি। তাহারা মুখ হইতে একপ্রকার আঁঠা বাহির করিয়া মাটিকে সিক্ত করিয়া লয় এবং তখন তাহা কোথাও লাগাইলেই খুব মজবুতভাবে আঁটিয়া যায়, আর খসিয়া পড়ে না।

সাধারণতঃ বোল্‌তার বাসা কেবলমাত্র কতকগুলি কোঠার সমষ্টি, কিন্তু একজাতীয় বোল্‌তার রাণীরা কোঠাগুলিরও আবার একটি বহিরাবরণ করে। তাহারা প্রথমে উপরে খানিকটা ছাদ প্রস্তুত করে। তাহার পরে ডিম রাখিবার জন্য ছোট ছোট কোঠা নির্ম্মাণ করিতে থাকে। কোঠাগুলি একটু বড় হইলেই তাহারা তাহাতে ডিম রাখে। কোঠাগুলি নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ছাদটি বাড়াইতে থাকে এবং ক্রমশঃ তাহা গোলাকার করিতে থাকে। একটি ছোট কলসিকে উল্টাইলে তাহার যেমন আকৃতি হয় এই জাতীয় বোল্‌তার বাসার বহিরাবরণটাও ঠিক ঐরূপ দেখিতে।

যাহা হৌক কিছুদিন পর বোল্‌তার ডিমগুলি ক্রমশঃ ফুটিতে থাকে এবং তাহা হইতে শ্রমজীবী বোল্‌তা বাহির হয়। তাহারা রাণীকে তখন হইতে বাসা-নির্ম্মাণে সাহায্য করে।

বোল্‌তাগুলির ছয়টি পা এবং সম্মুখভাগে দুইটি দাঁড়া থাকে। নানাজাতীয় বোল্‌তা নানারকম রঙের হয়। কেহ দেখিতে হল্‌দে রঙের ও কাহারও শরীরের অধিকাংশ স্থানই হল্‌দে কেবল পিছনের খানিকটা-স্থান লাল রঙের।

প্রদ্যোত

প্রস্তুত হইবার শিক্ষা।

এমিয়েল তাঁহার জার্ণেলে এক স্থানে লিখিয়াছেন যে কোন বিষয়ে প্রস্তুত হইতে জানাটা একটা মূল্যবান্ জিনিষ, তাহাতে অনেক বিবেচনা, দৃঢ় সংকল্প এবং বিচার শক্তির প্রয়োজন আছে। তার মানে তিনি বলেন যে প্রস্তুত হইতে গেলেই কোথাও না কোথাও গ্রন্থি ছেদন করিতে হয়। কারণ সকল গ্রন্থিই একই সময়ে উন্মোচন করা যায় না ; কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা বাহুল্য তাহা ভাল করিয়া পরখ করিয়া দেখিতে হয় এবং সেই আসলটিকে বেশ করিয়া ধরিয়া অন্যান্য জটিলতার বন্ধনকে ছাড়াইয়া যাইতে হয়।

এমিয়েলের এই কথাটি বেশ করিয়া দেখিবার মত কথা। আমাদের প্রস্তুত হওয়াটাই সকলের চেয়ে কঠিন কাজ ; আমরা সঙ্কল্প অনেক করি কিন্তু কাজে প্রবৃত্ত হইতে গেলেই দেখি নানা বাধা আসিয়া পড়ে। ইহার একমাত্র কারণ আমাদের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা করিবার শক্তির অভাব। আমার ঘরের জিনিষগুলি যদি আমি অগোছাল করিয়া ছড়াইয়া রাখি, তবে আবশ্যক হইলে কোন দ্রব্যই আমি খুঁজিয়া পাই না—এক ঘণ্টা ধরিয়া সামান্য একটা কলম হয় ত খুঁজিতেই কাটিয়া যায়, মন বিরক্ত হয় কাজ অসমাপ্ত থাকে। যদি সমস্ত পরিপাটীভাবে সাজানো থাকে তবে

যখন যাহা প্রয়োজন তাহা আমার হাতের কাছে থাকে—সমস্ত জিনিষের উপর আমার কর্ত্তৃত্বের ও দখলের একটা আনন্দ আমি লাভ করি।

বাহিরের জিনিসের উপর এইরূপ কর্ত্তৃত্বের ন্যায় নিজের মনের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার উপর কর্ত্তৃত্ব একটি ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা বিধান হইতেই জন্মে। আমার প্রবৃত্তি আমার ইচ্ছা যখন আমার প্রভু হয় তখন আমি তাহাদিগকে খুসীমত খাটাইতে পারি না—রাস আল্গা ঘোড়ার মত তাহারা বিভ্রান্ত হয়, কত বিপথে ঘুরিয়া মরে। পদে পদে তখন তাহাদের কাছে আমার লজ্জা, আমার অপমান, আমার ভয়। কিন্তু যখনি তাহাদের ব্যবস্থিত করি, তখন তাহারা আমার দখলে। তখন তাহাদের সঙ্গে আমার ব্যবহার একেবারে সহজ ও সরল—আমি জানি কোথায় আমার কোন্ ইচ্ছাকে দমন করিতে হইবে, কোন্ ইচ্ছাকে প্রকাশ করিতে হইবে। এখানেও সেই ব্যবস্থাই স্বাধীনতার নিদান হয়।

বুদ্ধির ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা-শক্তির কাজ আছে। অসংযত উচ্ছৃঙ্খল বুদ্ধি কোন দিন কোন বড় জিনিস সৃষ্টি করিতে পারে না। চিন্তার অনুভূতির সমস্তেরই একটি সুবিহিত শৃঙ্খলা আছে, যাহারা সেই শৃঙ্খলাকে পায় না, তাহাদের চিত্ত-শক্তি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে।

যাহা হউক এই ব্যবস্থা করিবার শক্তিটিকে যদি আমরা অর্জ্জন করিতে পারি এবং সকল জায়গায় ইহাকে প্রয়োগ করিতে পারি, তবেই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা প্রস্তুত আমরা জাগ্রত হইবার আশা রাখিতে পারি। কারণ তখন তো আমার বাহিরে মনে কোথাও কোন জড়তা কোন গোলযোগ ঘটিবার কারণ নাই। সমস্তই যে আমার দখলে—মুঠার মধ্যে। সর্ব্বমাত্মবশং সুখং সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্। যাহা কিছু আত্মবশ তাহাতেই আনন্দ, যাহা কিছু পরবশ তাহাতেই দুঃখ। সুতরাং তখন কোন্ সময়ে আমাকে কি করিতে হইবে, চট্‌করিয়া তাহা স্থির করিতে পারি এবং স্থির হইবামাত্র কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি।

এমিয়েল বলিয়াছেন যে প্রস্তুত হইতে গেলে নানা বাহুল্য হইতে আসল জিনিষটাকে বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলাবিধানের শক্তিটি ঠিক মত না পাইলে তাহা চিনিয়া লইবার কোন উপায় নাই। গোলমালে সবই যদি ছড়াইয়া থাকে তবে প্রতি পদক্ষেপেই সব বাধে—তখন কি যে করিব, কোনদিক দিয়া যে আরম্ভ করিতে হইবে তাহা ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। সেই জন্য কি বাহিরের বিষয়ে, কি মনের প্রবৃত্তিতে, কি যুক্তির বিষয়ে—সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলাকে আনিতে হইবে—তাহাই আমাদের সাধনা। তখন আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইতে শিখিব—কোমর বাঁধিয়া থাকিব—যাহা যখন আসিবে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে আর কোথাও বাধা পাইব না।

লব।

কবিতাগুচ্ছ।

(১) আশ্বাস।

ওগো হবে না বৃথা আসা এ হেথা
এই ভবের মেলায়
শুধু এ পুরে যাবনা ঘুরে
ব্যর্থ ছেলেখেলায়!
গিয়েছে বটে দিবস কেটে
শূন্যপথ কেবল হেঁটে—
অলস ঢেউয়ে ভাসিয়ে শুধু
অকেজো যত ভেলায়!
তবু কি হায় এ চোখে মোর
লাগে নি অপরূপের ঘোর?
নয়নে আসি জাগে নি হাসি
সকালে সাঁঝবেলায়?
যখন সুখ দুখের মাঝে
রয়েছি বাঁধা ব্যর্থ কাজে ;
তুমি কি মোরে রাখ নি ক্রোড়ে?
ফেলে কি গেছ ধূলায়?

মুকুল।

(২) সন্ধ্যা।

সঘন কালো চিকুর মেলি
নীরব দুটি চরণ ফেলি,
সন্ধ্যারাণী এলরে ওই এল!
করুণ তার পরশখানি
নিলরে হরি' সকল গ্লানি
আকাশ ভরি অমৃত বরষিল!
নীলাম্বর-বসন আড়ে
নিশার দীপ চন্দ্রমারে
যতনে সে যে জ্বালিয়ে নিয়ে আসে
অমনি তার কুঞ্জ ভরি'
অযুত ফুল উঠে শিহরি
তারকারূপে চরণে তার হাসে!
দ্যুলোক সুখ ভূলোকে লাগে

বসন্তের কানন জাগে
কোকিল রবে, চূতমুকুল গন্ধে
কর্ম্মভারে ক্লান্ত প্রাণ
অমৃত রসে করিয়া স্নান
মুগ্ধ চোখে সন্ধ্যা অভিনন্দে!

সুধাকান্ত

বৈশাখ ১৮৩৪ শক। পৃ. ২১-২৬

আশ্রমকথা।

গতবারে আমরা বলিয়াছি যে আমরা ইংরাজী ভাষা গোড়ায় কথাবার্ত্তার স্বাভাবিক প্রণালী অর্থাৎ Direct method অবলম্বনে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি।

ইউরোপীয় ভাষাসমূহে লিখিত ভাষা কথিত ভাষা হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যেমন কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইংরাজী ভাষায় Thou hast, he hath প্রভৃতি পদ কথিত ভাষায় প্রচলিত ছিল, এখন নাই—এখন কেবল লিখিত ভাষায় সাহিত্যে এ সকল পদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

কথিত ভাষায় অনাবশ্যক কথায় বাহুল্য থাকে না বলিয়া ভাষাশিক্ষার সুবিধা হয়—যেমন আকাশকে কথায় Sky বলিলেই চলে কিন্তু সাহিত্যে Heaven Firmament প্রভৃতি নানা শব্দ দ্বারা আকাশ বলা যায়। গল্প আছে যে একদা এক জর্ম্মাণকে তাঁহার ইংরাজ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জনৈক মহিলা কেমন আছেন, সে কপালে হাত দিয়া বলিয়াছিল, she was rapt ইংরাজ প্রশ্নকর্ত্তা তাহাকে কপালে হাত দিতে দেখিয়া ভাবিলেন যে স্ত্রীলোকটির মাথায় আঘাত লাগিয়াছে—শেষটা অনেক কথাবার্ত্তার পর বুঝিলেন যে জর্ম্মাণ বলিতে চাহিয়াছিল যে সেই মহিলাটি উন্মনা হইয়া গিয়াছেন কারণ শেক্‌সপীয়রে আছে "how our partners rapt" rapt মানে transported।

যিনি যাই বলুন বিদেশীর পক্ষে ইংরাজী ভাষা শেখা বিষম কষ্টকর ব্যাপার। ভাষা জিনিষটাই নিছক যুক্তিযুক্ত rational জিনিষ নয়। up দিয়া lock up, wrap up, pack up সবই বলি, অথচ pack up এর কথায় কথায় অর্থ করিতে গেলে ঠিক উল্টটা অর্থ হয়—খুলিয়া ফেলা বুঝায়। Sharp বিশেষণটা ছুরী বা অস্ত্রাদিতে ব্যবহার করে, আবার প্রভেদ উত্তর প্রভৃতি কথায় বিশেষণরূপেও ব্যবহার করে, যেমন sharp distinction, sharp answer—সুতরাং কোন কথারই বেশ সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকে কোথায়? I could not help being late—সে জায়গায় help মানে avoid—অথচ আর কোন জায়গায় তা নয়। এ এক মস্ত ন্যাটা। ইংরাজী ভাষাটা যদি কেবল বিশুদ্ধ ব্যাকরণের নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত তাহা হইলে আমরা বিদেশীরা যাহা

লিখিতাম তাহাই ইংরাজী হইত—অথচ ছোট কথায় ছোট বাক্যরচনায় যে ব্যাকরণ শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ইংরাজী হয় না, সেটা ইংরাজেরাই ভাল বুঝিতে পারেন।

Ahn Ollendorff প্রভৃতি ভাষায় যোগরূঢ় (idiometic) প্রয়োগ বাদ দিয়া কেবল কতকগুলি কাটাছাঁটা বিভিন্ন বাক্য সাজাইয়া ভাষা শিখাইবার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাকরণের প্রণালীতে ভাষা শিক্ষার যে দোষ এ প্রণালীতেও সেই দোষ দূর হয় না, যথার্থ ভাষার সঙ্গে পরিচয় হয় না—বিচ্ছিন্ন বাক্যগুলি পড়িয়া ভাষার কাঠামোটার (Structure) কিছুটা জ্ঞান জন্মে মাত্র।

শিক্ষাবিজ্ঞানশাস্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিক্ষার নানা অভিজ্ঞতা ভাল করিয়া আলোচনা না করিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আমরা কখনো শুধু Direct method কখনো Ahn Ollendorff এর ন্যায় Sentence cramming-এর method কখনো বা পুরানো ব্যাকরণ ও প্রচুর exercise শিখাইবার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি এবং কোনটাতেই ভাল ফল পাই নাই। শুধু কতাবার্ত্তায় ইংরাজী শব্দ ও পদ ছাত্ররা অতি অল্পই আয়ত্ত করে, কারণ প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর থাকিয়া যায় এবং প্রশ্নও ক্রমে একঘেয়ে হইয়া উঠে। ইংরাজী-সোপানের প্রশ্নোত্তর প্রণালীর মধ্যে এই দোষটি আছে। তারপর যদিবা প্রশ্নকে নানা বিচিত্রতা দেওয়া যায়—তখন সময় এত অধিক লাগে যে পাঠোন্নতি অতি অল্পই হয়। আধ ঘণ্টা বা ৪৫ মিনিট কথাবার্ত্তা কহিল তারপর সমস্ত দিনে এবং চারিদিকের পরিবেষ্টনের মধ্যে কোথাও ইংরাজী কথাবার্ত্তা শুনিল না ইহাতে ইংরাজী শিক্ষা স্বাভাবিক উপায়ে হইতেই পারে না।

ইংরাজী-সোপানে অবশ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু এই সমস্ত প্রণালীগুলিরই একটা সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন—গোড়ায় Language Drill ও কথাবার্ত্তা রাখিয়া পরে Ollendorff প্রণালীর মত ছোট ছোট শব্দ যোজনা করিয়া সহজ বাক্যের সঙ্গে পরিচয় সাধন ও সহজ বাক্যরচনার চেষ্টা ও সেই একই সঙ্গে প্রশ্নোত্তর করানো এ সমস্তই রাখিয়াছেন। এমন কি তিনি ব্যাকরণকেও একেবারে বাদ দেন নাই। যদিও ব্যাকরণ শিক্ষার বিরুদ্ধে আজকাল কোন কোন শিক্ষাসম্প্রদায়ের ঘোরতর আপত্তি। তাঁহারা বলেন যে ব্যাকরণ শিখিয়া কোন দিন ভাষা শিক্ষা হয় না—ব্যাকরণ অনেকটা নাম ও সংজ্ঞা সম্বলিত formal জিনিস—ভাষার মধ্য দিয়াই যখন ব্যাকরণ শেখা যায় তখন আলাদা করিয়া ব্যাকরণ শিখাইবার প্রয়োজন কি ? ছাত্র নিজেই ভাষার মধ্য দিয়া ব্যাকরণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়া লইবে।

কিন্তু এ সকল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত কেহই ব্যাকরণকে বাদ দিয়া চলিতে পারেন নাই। যে জিনিসটা নানা বৎসর ধরিয়া তৈরি হইয়া আসিয়াছে একজন শিশু যে তাহাকে ক্লাসে বসিয়া বসিয়া সৃষ্টি করিবে এরূপ কল্পনাই হাস্যাস্পদ। আজকাল formal ব্যাকরণের দিন চলিয়া গিয়াছে—আগে সংজ্ঞা ও নিয়ম তারপর তার প্রয়োগ এভাবে আধুনিক ব্যাকরণ রচিত হয় না। ভাষার প্রয়োগ ও সেই সঙ্গে

সঙ্গে তাহার নিয়ম আলোচনা এই দিক দিয়াই ব্যাকরণ আলোচিত হয়—যে প্রণালীকে ইংরাজীতে বলে induction method—সুতরাং ভাষার কাঠামোটা বুঝাইবার জন্য যেটুকু ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় তাহা গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। I am, he is কেন হয় বলিয়া দিলে কোন ক্ষতি নাই—বরং ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার নিয়ম বলিয়া দিলে ভাষা জিনিসটা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত হইয়া যাইতে পারে।

তথাপি Ollendorff প্রণালী এবং তার সঙ্গে ব্যাকরণের অল্প একটু যোজনা হইলেও আমাদের ইংরাজী সোপান প্রভৃতির প্রণালীতে একটা দোষ থাকিয়া গিয়াছিল এই যে ছেলেরা শুধু কানে শুনিয়া শিখিত চোখে দেখিত না,—ইহাতে আমাদের বিদ্যালয়ে বানান ও পড়া বহুকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকিয়াছিল। আরও একটি ত্রুটি ছিল এই যে গোড়ায় ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহাইলেও, ইংরাজী বাক্যরচনা অভ্যাস করাইবার সময় আগে বাংলায় বলিয়া তার পর তাহার ইংরাজী করানো হইত—অথচ দুই ভাষার ভাবানুবর্ত্তিতা association একেবারে উল্টাপাল্টা সুতরাং ছাত্রেরা এই দুই ভাষার প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইত। তখন হয় বাংলাকে ইংরাজীর মত করিয়া বিকৃত করিয়া লইতে হয় নয় বাংলাকে বর্জ্জন করিয়া ইংরাজীকেই একমাত্র করিয়া আশ্রয় করিতে হয়। I have a book আমার একটি বই আছে—ছাত্র my a book is my a book has বলিবেই কারণ তাহার মাথায় বাংলার associationটা পূরাপূরি জাগ্রত হইয়া আছে।

এই অভাব দূর করিবার জন্য আমাদিগকে সোপানের সঙ্গে সঙ্গে রিডার লইতে হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে লিখিত ভাষার সঙ্গে গোড়ায় পরিচয় সাধনের যে সকল অসুবিধা সে সমস্তই ভোগ করিতে হইতেছে। কথিত ভাষায় if it were প্রভৃতি দু একটা জায়গা ছাড়া Subjunctive mood এর তেমন ব্যবহার নাই কিন্তু লিখিত-ভাষায় বিস্তর আছে। লিখিতভাষায় একই সময়ে সমস্ত tenceগুলি আসিয়া পড়ে। কেবল পড়া ছাড়া এবং খানিকটা বানানের সহায়তা ছাড়া রিডারে আর কোন সুবিধা পাওয়া যায় না।

আমার বিশ্বাস যে সোপানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু যেরূপ "ইংরাজী পাঠ" তৈরি করিয়াছিলেন তাহাকেই যদি বানানের ক্রমানুসারে সাজাইয়া লইয়া লেখা যায় এবং ক্রমে ক্রমে সরল হইতে জটিল বাক্য তাহার মধ্যে আনিয়া ফেলা যায় তবে ভাষাশিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর সঙ্গে একটা সঙ্গতি রক্ষা করা যায়। নহিলে কেবল মুখস্থকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং ভাষা প্রয়োগের কোন চর্চ্চারই অবকাশ থাকে না।

আশ্রম সম্পর্কে নানা সংবাদের মধ্যে এবার নববর্ষের দিনে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর হঠাৎ আগমন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহার শরীর অসুস্থ, তথাপি তিনি নববর্ষে আশ্রমে আসিয়া বর্ষারম্ভের উৎসবটি নিজে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। রুদ্রকে

অনেকে দয়াময় বলিয়া কোমল করিয়া লইতে চান—কিন্তু যথার্থ মনুষ্যত্বের সাধনা জীবনের সকল দুঃখ বিপদ আঘাত ক্ষতির মধ্যে, রুদ্রের সকল ভীষণতার মধ্যে তাঁহার দক্ষিণ মুখকে দর্শন করা—রুদ্রকে তাঁহার রুদ্রত্বের মধ্যে না দেখিতে যাওয়া ভীরুতামাত্র এবং সে ভীরুতাকে তিনি নিজে কোন দিনই প্রশ্রয় দেন না।

১৩ই বৈশাখ হইতে ২৯এ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত গ্রীষ্মাবকাশের জন্য ছুটি দেওয়া হয়। ১০ই বৈশাখ আশ্রমে রাজা ও রাণী নাট্য সংক্ষিপ্ত করিয়া অভিনয় করা হয়। অভিনয় মন্দ হয় নাই। ১১ই প্রাতঃকালে বুধবারে মন্দিরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু উপাসনা ও বিদায়কালীন উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে বিশ্ব-প্রকৃতিতে কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম একেবারে গাঁথা হইয়া আছে—কিন্তু মানুষের কাজের মধ্যে কোথাও সেই পরিপূর্ণ অবকাশটিকে দেখিতে পাওয়া যায় না—সেইজন্যই তাহার ক্লান্তি আসে, তাহাকে মধ্যে মধ্যে ছুটি লইতে হয়। কিন্তু ইহাতে মানুষের কোন গৌরব নাই—ইহাতে বরং এই প্রমাণ হয় যে মানুষ আপনার কাজের মধ্যে এখনও বড় একটি আনন্দের সঞ্চার করিতে পারিতেছে না যাহাতে কাজের ভিতর হইতেই সে আপনার কাজের মূল্য পায়—তাহার খাটুনিই তাহাকে ছুটি দেয়। আমাদের আশ্রমের কিন্তু তাহাই উদ্দেশ্য—সেইজন্য যেখানে ধর্ম্মসাধনার স্থান, সেইখানে শিক্ষার ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষা যে এতটা বড় আনন্দের মধ্যে ও শান্তির মধ্যে স্থান পাইতে পারে এ ধারণাটা কোথাও নাই—অন্যত্র তাই শিক্ষাদানে এবং শিক্ষাগ্রহণে একটা নিরানন্দময় দীনতা আছে—কিন্তু এখানে শিক্ষাকে জীবনের ভিতরকার জিনিস করিয়া তোলা হইতেছে এখানকার শিক্ষকগণ নিজের জীবনের সঙ্গে ছাত্রের জীবনকে মিলাইয়া লইতেছেন ;—যতই এই কাজটি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে ততই এ বিদ্যালয় প্রাণ পাইতেছে। এখানে তাই জীবনের সাধনা যত বড় হইয়া উঠিবে ততই শিক্ষা সুন্দর ও সার্থক হইবে, তখন ছুটির প্রয়োজন হইবে না কারণ তখন কর্ম্মের ভিতর হইতেই কর্ম্মের যেটি লভ্য আনন্দ তাহা প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

শ্রীঅঃ

বিষাক্ত গাছ ও জীব।

অনেকেই জানেন যে যেমন কাঁকড়াবিছা প্রভৃতি বিষাক্ত জন্তু আছে সেইরূপ নানাপ্রকারের বিষাক্ত উদ্ভিদও আছে। প্রত্যেক জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যেই কতকগুলি উদ্ভিদ ন্যূনাধিক পরিমাণে বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করে। অধিক পরিমাণে তাহাদের গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে নিরাপদ নহে, অথচ অল্পমাত্রায় গ্রহণ করিলে তাহারাই আবার অপকার না করিয়া মানুষের উপকার করিয়া থাকে।

সকলেই জানেন যে বিছুটি গায়ে লাগিলে কিরূপ যন্ত্রণা হয়। সাধারণ বিছুটির

পাতা যে সব সুঁয়া দ্বারা আবৃত, তাহা বেশ দৃঢ়, কিন্তু ভঙ্গুর ও ফাঁপা ; চর্ম্মে প্রবেশ করিলে এগুলি ভাঙ্গিয়া যায় এবং ইহার ভিতর হইতে বিষাক্ত রস নির্গত হয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে সহজেই দেখা যায় যে এই সুঁয়াগুলির অভ্যন্তরদেশ জীবাণু (Protoplasu) দ্বারা পূর্ণ ; ইহা চট্‌চটে এবং স্বচ্ছ বস্তু এবং সর্ব্বদাই স্রোতের ন্যায় চলাফেরা করিতেছে। এই সুঁয়াগুলিকে কোষ (Cell) বলা যাইতে পারে। এই কোষের যে অংশটুকু জীবাণু দ্বারা পূর্ণ নহে তাহা পরিষ্কার তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ এবং ইহাই বিষ। অধিক পরিমাণে বিছুটির সুঁয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছিল যে ইহার অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থটি ফার্ম্মিক্ এ্যাসিড্ (পিপীলিকা হইতে উৎপন্ন এ্যাসিড্)। পিপীলিকা কামড়াইলে এই পদার্থটি আমাদিগকে যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু পরে পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে ইহাতে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে এক বিশেষ প্রকারের বিষ আছে। ইহা শ্বেতবর্ণ এবং অনেকটা সাপের বিষের ন্যায়।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ-জাত বিছুটির বিষ শীতপ্রধান দেশের বিছুটির বিষ অপেক্ষা অনেক তীব্র। যবদ্বীপে একপ্রকার বিছুটি দেখা যায়, ইহার নাম Urtica Stimulans ইহার পাতা ছেঁচিলে একপ্রকার দূষিত বায়বীয় পদার্থ বহির্গত হয় এবং ইহা চক্ষু ও মুখকে আক্রমণ করে। হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিলে হাত ফুলিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং তাহাতে তিন চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভুগিতে হয়। এমনকি কখনো কখনো পরিণামে মৃত্যুও হইতে পারে। ভারতবর্ষ-জাত Lapora Crenulata নামক বিছুটির বিষও এই প্রকার তীব্র। এই প্রকার আরও অন্যজাতীয় গাছ আছে।

পদ্ম এবং অন্যান্য ফুলের গন্ধে মাঝে মাঝে মানুষ দূর হইতেই মোহাক্রান্তের ন্যায় হয়। ইহার গন্ধ কখন কখন এমন অনিষ্ট করিতে পারে যে ইহাতে অত্যন্ত মাথা ধরে, এমন কি অজ্ঞান হইয়া পড়িতে হয়।

কিন্তু জন্তুদের বিষদাঁত এবং হুল ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহাতে আরও বেশীরকম বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা তাহারা যে কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করে তাহা নহে ; নিজেদের শিকারকে অসাড় করিয়া ফেলিতেও সমর্থ হয়। সাধারণ পোকাতে যে ফার্ম্মিক এ্যাসিড্ আছে তাহারও মধ্যে এইরূপ অসাড় করিবার মত এক প্রকার বিষ আছে।

জেলি ফিস্ নামক মাছকে সাধারণতঃ সমুদ্রের বিছুটি বলে। কারণ তাহাদের দেহে অতি ক্ষুদ্র বিষাক্ত সুঁয়া আছে। ইহার দ্বারা তাহারা তাহাদের শিকারকে অসাড় করিয়া ফেলে। সামুদ্রিক এ্যানিমোন্-এর দেহেও এইরূপ ষ্টার ফিস্ ইত্যাদি আরও অনেক মাছ আছে যাহাদের বিষ খুব তীব্র।

পোকার মধ্যেও আমরা মৌমাছি, বোল্‌তা এবং পিপীলিকাতে হুল দেখিতে পাই। গুটিপোকার দেহে বিষাক্ত সুঁয়া আছে। মাকড়সার বিষাক্ত গ্রন্থি-বিশিষ্ট নখ আছে। আমরা বিষাক্ত মাছের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সরীসৃপের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েক প্রকারের সর্পই বিষাক্ত ; ইহাদের বিষদাঁত আছে। কেবলমাত্র একপ্রকারের গিরগিটির

মুখে বিষ-গ্রন্থি আছে। ইহার নাম হেলোডার্ম এবং ইহা আমেরিকাতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের বিষদাঁত নাই।

এরূপ অনেক পোকা আছে যাহাদের বিষ নাই কিন্তু মানুষকে কামড়াইলে কি হুল ফুটাইলে খুব যন্ত্রণা হয়। এমন কি খুব ঘা হয়। প্রায়ই তাহারা এক জীব হইতে অন্য জীবের দেহে অতি ক্ষুদ্র ব্যাধির বীজাণু ঢুকাইয়া দেয়। যেমন মশা ইত্যাদি। ইহাদের দ্বারাই ম্যালেরিয়া পৈত্তিকজ্বর, প্লেগ ইত্যাদি ব্যাধি এক দেহ হইতে অন্যদেহে নীত হইয়া থাকে।

শ্রীতরুণকুমার রায়।

প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ।

কাঠবিড়ালী।

এই আশ্রমে কাঠবিড়ালী একটি বিশেষ দেখিবার জিনিস। ইহারা সাধারণতঃ শাল, আম, দেবদারু বকুল প্রভৃতি বড় বড় ডালপাতাযুক্ত গাছে এবং ঘরের চালে খড়ের মধ্যে বাস করে। ইহারা গাছে দুই প্রকারের বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিয়া থাকে। এক শ্রেণীর বাসা গাছের কোটরের মধ্যে এবং আর এক শ্রেণীর বাসা পাখীর মত ডাল-পালা দিয়া গাছের উপরে ইহারা নির্ম্মাণ করে।

কাঠবিড়ালীদের পিঠে লম্বালম্বিভাবে কয়েকটি কালো দাগ আছে। ইহাদের শরীরের তুলনায় লেজটি খুব বড়। এই লেজই ইহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাদের শরীরের ও লেজের লোম খুব কোমল। দৌড়াইবার বা লাফাইবার সময় ইহারা লেজ খাড়া করে। লেজের লোমগুলি অল্প খাড়া থাকে। যখন ইহারা স্ফীত বা রাগান্বিত হয় তখন ইহাদের লেজের গোড়ারদিককার লোম অপেক্ষাকৃত খাড়া হইয়া উঠে।

যে সমস্ত গাছে কাঠবিড়ালীরা বাস করে সেই গাছের রংএর সঙ্গে তাহাদের খুব মিল আছে; তাহারা যখন ভয় পায় তখন নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য এমনভাবে গাছের সহিত লাগিয়া থাকে যে সহজে চোখে পড়ে না।

কাঠবিড়ালীরা এক গাছ হইতে অন্য গাছে লাফ দিতে খুব পটু। ইহাদের পিছনের পা সম্মুখের পা অপেক্ষা বড়। ইহাতে তাহাদের গাছে উঠিতে খুব সুবিধা হয়।

ছানাগুলি যখন একটু ছোট থাকে তখন তাহাদের মাতারা তাহাদিগকে আহার আনিয়া দেয়। পরে ছানারা বড় হইলে আস্তে আস্তে খাইতে শেখে।

কাঠবিড়ালীর প্রধান খাদ্য শস্য, পিপীলিকার ন্যায় ছোট পোকা এবং ফলমূল। ইহাদের দাঁত খুব তীক্ষ্ণ। এই জন্য ইহারা অনায়াসেই নারিকেলের ছোবড়া ছাড়াইয়া তাহার ভিতরের অংশ খাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহারা গাছের কোটরে বাস করে। এই কোটর দাঁত দিয়া গাছ কাটিয়া ইহারা প্রস্তুত করে। ইহারা খাইবার সময় পিছনের

পা দুটির উপর ভর দিয়া বসিয়া সম্মুখের পা দুটি দ্বারা আহার্য্য বস্তু খায়।

কাঠবিড়ালীরা খুব কলহ-প্রিয়। ইহারা যখন রাগে তখন শত্রুর পিছনে পাছে পাছে তাড়া করিয়া বেড়াইয়া এক এক সময়ে মারামারি করিতে করিতে ইহারা গাছ হইতে পড়িয়াও যায়।

কাঠবিড়ালীদের পুষিলে বেশ পোষ মানে। একবার পোষমানাইলে আর সঙ্গ ছাড়িতে চায় না।

ইহারা যখন ডাকে তখন অনেক সময় পাখীর ডাক বলিয়া ভ্রম হয়।

প্রদ্যোত।

কবিতা।

ব্যর্থদিন।

তোমায় ভুলিয়া থেকে পদে পদে আমি,
এত ব্যথা পাই প্রাণে হে পরাণস্বামী।
শুষ্ক হৃদে ডাকি আমি শুষ্ক কণ্ঠস্বরে
তখনি স্নেহের রস ঢাল মোর পরে।
আমি যদি নাহি চাই ফিরে যাই প্রভু,
তুমি ত হৃদয় দ্বারে দাঁড়াইয়া তবু
ছোট কথা নিয়ে থাকি, করি ধুলাখেলা
তবুও আমারে তুমি কর না ত হেলা।
পেয়েছি দিবস নিশি আশিষ তোমার
কি দিয়েছি তাই ভাবি কোন্ উপহার!
পারি নাই তোমা পরে রাখিতে বিশ্বাস,
তবুও গোপনে মনে দিতেছ আশ্বাস।
এত যে অজস্র দয়া প্রভু মোর পরে—
চেনা কেন নাহি দাও নিমেষের তরে?
এ পাপ বহিয়া বুকে খেলি আর কত,
দিন যে চলিয়া যায় বেলা হয় গত।

যীশু

জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৪ শক। পৃ. ৪৭-৫০

আশ্রম কথা।

আমরা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যে আলোচনা করিতেছি তাহাকে পর্য্যাপ্ত মনে করা ঠিক হইবে না, কারণ আমরা এ সম্বন্ধে অত্যন্ত মোটামুটি একটা ধারণা দিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে গতবারে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে সারিয়াছি। এবারে ইতিহাস শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বোধহয় অনেকে জানেন যে ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে ইতিহাস সম্বন্ধীয় পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদের হাতে দিতে অনেক শিক্ষকের আপত্তি আছে। তাহার প্রধান কারণ হর্বার্ট স্পেন্‌সার যাহা বলিয়াছেন যে, সে পাঠ্যপুস্তকগুলি "The mere tissues of names and dates and dead unmeaning events"—কেবল কতগুলি নাম আর তারিখ আর মৃত নিরর্থক ঘটনার জোড়াতাড়া। ইহা ছাড়া আর একটা বড় কারণ এই যে, পাঠ্যপুস্তক-লেখককে আবশ্যক অনাবশ্যক সকল ঘটনাই বিবৃত করিতে হয়, সে সম্বন্ধে কোন বাছ্‌বিচার থাকে না। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল ইতিহাসের পুস্তক একটা ঘটনার পঞ্জিকার আকার ধারণ করে। অল্পবয়স্ক ছেলেদের তাহা পড়িয়া কল্পনাবৃত্তির কোন স্ফুরণই হয় না, অতীত কালকে তাহারা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পায় না। আর ইতিহাসের ঘটনাগুলির মধ্যে যে মানব-সমাজের উন্নতি অবনতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম সকল কাজ করিতেছে, ঐ তালিকাপাঠে বয়স্ক ছাত্রগণও তাহার কোন পরিচয় প্রাপ্ত হয় না।

প্রসিদ্ধ শিক্ষা বিজ্ঞানবিৎ সার জশুয়া ফিচ্ (Sir Joshua Fitch) ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লিখিতেছেন : "So unsatisfactory is the intellectual result of much of the labour spent on teaching history to children, that many authorities of great weight advocate the omission of the subject from the course of school instruction altogether"—। অবশ্য এই দ্বাদশ বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং এখন আর কেহই ইতিহাস শিক্ষা একেবারে উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করে না। কিন্তু ফিচের লেখা হইতে বুঝা যায় যে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করানোর কত বড় কুফল প্রকাশ পাওয়াতে এক সময়ে ইংলণ্ডের শিক্ষার প্রধান অধিনায়কবর্গ ইতিহাস শিক্ষাটাই একেবারে উলটাইয়া দিবার জন্য উৎসাহী হইয়াছিলেন।

তারপর ইংলণ্ডে যেন একসময়ে ল্যাটিন গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীনভাষা যাহাতে উঠিয়া না যায় তজ্জন্য classical association ক্লাসিক ভাষারক্ষার সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, তদ্রূপ ইতিহাস শিক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য historical association ঐতিহাসিক সমিতিও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কেম্ব্রিজ হইতে অক্সফোর্ড হইতে ইটন্ হইতে হ্যারো হইতে নানা শিক্ষকগণ একত্র হইয়া ইতিহাস শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে

আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল জ্ঞাপন করেন এবং এই কয় বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা ইতিহাস শিক্ষার পাঠ্যসূচী (Syllabus) একেবারে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। সে সমস্ত পরিবর্ত্তন সংক্ষেপে বলিতে গেলেও পুঁথি হয়। মোটামুটি এই বলি যে নীচের ক্লাসে তাঁহারা সকলেই মুখে মুখে ইতিহাস গল্প করিয়া বলিবার পক্ষপাতী। ছবি, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ, ম্যাপ প্রভৃতি সেই মৌখিক গল্পের স্ফুটনে সাহায্য করিয়া থাকে। তারপর প্রধান প্রধান ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে, যেখানে বড় বড় ঘটনা অভিনীত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে বালক বালিকাগণকে ভ্রমণ করাইয়া ইতিহাসকে সজীব ও প্রত্যক্ষ করাইবার চেষ্টাও ইহারা গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ ভ্রমণ সম্ভবপর না হইলেও ইংলণ্ডের যে কোন জায়গায় ইংলণ্ডের ইতিহাসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনা বুঝাইবার মত মালমসলা পাওয়া যায়। যেমন ধর অক্সফোর্ডে, রোমান শাসনকাল বুঝাইবার জন্য রোমান রাস্তার অবশেষ একটুখানি আছে, নর্ম্মান কাল বুঝাইবার জন্য Iffley নামক সন্নিকটস্থ গ্রামে একটা প্রাচীন নর্ম্মাণ গির্জ্জা আছে, ইংলণ্ডীয় রেনেসাঁসের কালে অষ্টম হেনরির সময়ে তো ক্রাইষ্ট চার্চ্চ প্রভৃতি কলেজই অক্সফোর্ডে স্থাপিত হইয়াছে—অষ্টম হেনরি যেখানে বসিয়া ডিনার খাইয়াছিলেন, সেই ডিনার হল অদ্যাপি বিদ্যমান। এইরূপে এত উপকরণ যে কোন য়ুনিভার্সিটি সহর বা পুরাতন স্থানে পাওয়া যায় যে ইতিহাসের স্থানিক ঔৎসুক্য জাগ্রত করা কিছুমাত্র কষ্টকর হয় না। তারপর আজকাল ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাট্য এবং ঐতিহাসিক বীরদের জীবনচরিত এত রাশি রাশি বাহির হইয়াছে যে যেমন যেমন যে যে কালের ইতিহাসের গল্প ছাত্ররা, শুনিতেছে, অমনি তাহাদের হাতে সেই সেই কালের কোন উপন্যাস বা নাট্য বা কোন বীরের জীবনচরিত দেওয়া হইতেছে এবং এইরূপে ইতিহাস একেবারে তাহাদের তরুণ মনে গাঁথা হইয়া যাইতেছে। নীচের ক্লাসে সর্ব্বত্রই ইতিহাস শিক্ষার এতগুলি সুপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে।

এইসঙ্গে আমার আর একটু বলা কর্ত্তব্য যে একেবারে সেই গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার-শুদ্ধ ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলাও আজকালকার ইতিহাস শিক্ষার সুপ্রণালী বলিয়া বিবেচিত হয় না। নীচের দিকে যে প্রণালী অধুনা অবলম্বিত হয় তাহার নাম Concentric method অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে ক্রমে পরিধির দিকে ব্যাপ্ত হইবার প্রণালী। প্রথমে বড় বড় পর্ব্বের একটা মোটা সাধারণ পরিচয় দাও, তারপর সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ডালপালার বিস্তার কর। High roads to history প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক এই প্রণালীতে লিখিত হইয়া বাহির হইয়াছে। এই উপায়ে, এমন কি ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়াইতে পড়াইতে সমস্ত ইউরোপের ইতিহাস সেখানকার শিক্ষকগণ জানাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

নীচের ক্লাসে ইতিহাসের অধ্যাপনায় আধুনিক এই সকল প্রণালীর সঙ্গে আমরাও যথাসাধ্য যোগ রাখিয়া চলিবার চেষ্টা এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে করিয়া থাকি।

অস্‌কার ব্রাউনিং শিক্ষাবিভাগে অধিনায়কতার কালে ভাল অধ্যাপনার যে একটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা এই যে, শিক্ষক প্রত্যেক বক্তৃতাটি প্রস্তুত করিয়া আসিয়া ক্লাসে যখন প্রদান করিবেন তখন ছাত্ররা তাহার নোট লইবে এবং পরে সেই নোট অবলম্বনে বক্তৃতার সারাংশ সুন্দররূপে লিখিয়া তাঁহার দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইবে। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে নীচের ক্লাসগুলিতে বরাবর আমরাও সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছি। তবে ম্যাজিক লণ্ঠন, ছবি, ম্যাপ প্রভৃতি উপকরণের সাহায্য আমরা কোথায় পাইব, এবং ঐতিহাসিক কাহিনী ও নাট্য প্রভৃতি পড়ানো ও অভিনয় করানোও আমাদের পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? সেরূপ শিশুসাহিত্য এদেশে কোথায়? ইতিহাসকে তাহার ক্ষেত্রে পড়াইবার সুযোগও আমাদের নাই। আমরা কেবল গল্প করিয়া করিয়া ইতিহাসে ছাত্রদের মনে একটা ঔৎসুক্য জন্মাইবার চেষ্টা করি এবং ছাত্রদের দ্বারা প্রত্যেকটি পাঠ লেখাইয়া তাহাদের স্মরণে সেই কাহিনীগুলি মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করি মাত্র। যে ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা অধিক সেখানে লেখানোও অনেক সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় "The historical teacher needs literary culture and some power of narrative and description"—ঐতিহাসিক শিক্ষকের সাহিত্যজ্ঞান এবং বর্ণনার ক্ষমতা দুইই থাকা চাই—যে সকল শিক্ষকের তাহা আছে তাঁহারাই এ প্রণালীতে কৃতকার্য্য হন, যাঁহাদের নাই তাঁহারা কোন সুবিধাই করিয়া উঠিতে পারেন না।

ইংলণ্ডে গত ছয় বৎসর হইতে widening of the history syllabus—ইতিহাস শিক্ষাসূচীর প্রসারকল্পে শিক্ষকসম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন ও চেষ্টা চলিয়াছে এবং তাহার ফলে অনেক জায়গায় আজকাল শুধু ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়া হয় না, সমস্ত জগতের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে ছাত্রদিগকে বলিবার চেষ্টা হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয়েও কয়েক বৎসর হইতে সেইরূপ একটা চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস অবশ্য নীচে হইতে উপরের ক্লাস পর্য্যন্ত ঐ ক্রমশঃ ব্যাপ্তিশীল প্রণালীতে পঠিত হয়, তদ্ব্যতীত ঈজিপ্ট ব্যাবিলন গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস, মুসলমানগণের ইতিহাস এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস (ব্যাপক প্রণালীতে) এখানে পড়ানো হইয়া থাকে।

তবে কেবল গল্প করিয়া বলিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন প্রণালীই আমরা অবলম্বন করিতে পারি নাই। বাংলায় ইতিহাসের অধ্যাপনা হয় বলিয়া ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরাজীতে লিখিত নানা পুস্তক ছাত্রদিগের দ্বারা পড়াইয়া লওয়াও চলে না। এ সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের যথেষ্ট উন্নতি করিবার আছে। তবে পাঠ্যপুস্তক বিভীষিকা হইতে ছাত্রদিগকে পরিত্রাণ করা হইয়াছে ইহা একটা সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। High roads series এর মত উত্তম পাঠ্যপুস্তক লিখিত হইলে পাঠ্যপুস্তক গ্রহণে কোন আপত্তি থাকিত না। বোধ হয় কিয়ৎকালের মধ্যেই কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক এখানে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। তবে গল্প বলার আনুষঙ্গিক যে সকল শিক্ষার উপায়

ইয়োরোপে উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলি না গ্রহণ করিলে ইতিহাস শিক্ষা কখনই ফলপ্রদ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নয়।

নীচের ক্লাসের ইতিহাস অধ্যাপনা সম্বন্ধে আজ এই পর্য্যন্ত। বারান্তরে উচ্চক্লাসের ইতিহাস অধ্যাপনা সম্বন্ধে সে দেশে কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ।

(১)

গুটিপোকা ও প্রজাপতি।

আমরা এত ভিন্ন ভিন্ন জাতের গুটিপোকা আবিষ্কার করিতেছি যে তাহাদের নামকরণ করা মুস্কিল। পতঙ্গতত্ত্বের পুস্তকে নিশ্চয় তাহাদের নাম আছে কিন্তু আমরা সে সব কিছুই জানি না বলিয়া যে গাছে যে গুটিপোকা দেখি সেই গাছের নামে নামকরণ করিব। আজ যে নূতন এক শ্রেণীর গুটিপোকার কথা বলিতে যাইতেছি সে সন্ধ্যে ফুলের গাছে থাকে এবং তাহার পাতা খাইয়া জীবনধারণ করে। সুতরাং ইহাকে সন্ধ্যেগাছের গুটিপোকা বলিব। সাধারণ গুটিপোকার শরীরের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই—ইহাদেরও দেহে সেই রকম গোল গোল চক্রাকৃতি মাংসসমষ্টি দেখা যায়। কেবল ইহাদের পশ্চাদ্ভাগের চক্রটিতে একটি ছোট লেজের মত থাকে। ইহাদের শরীরের আয়তন সওয়া ইঞ্চির বেশি নয়। ইহাদের গলার কাছে ছয়টি সূক্ষ্ম পা আছে তাহা অনেকটা চেলা বিছার পায়ের মত। ইহাদের পা এত সূক্ষ্ম যে গণনা করা শক্ত—তথাপি সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৬টি পা গণিয়াছি। ইহাদের দেহের বর্ণ শৈশবে হরিতাভ থাকে কিন্তু জীবনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের বর্ণ কেবলি বদলাইতে থাকে। হরিতাভ বর্ণের পর গাঢ় সবুজবর্ণ হইতে দেখিয়াছি। তার পর কিছু কাল পরে রক্তবর্ণ হইতে দেখিয়াছি। সে একেবারে শেষ অবস্থায়। তখন ইহারা আহারবিহার বন্ধ করিয়া শুষ্ক তৃণের সন্ধান করিতে থাকে, এবং তাহার সংস্থান হইলে নিজের মুখ হইতে এক প্রকার আঁঠা বাহির করিয়া নিজের আশেপাশের ঘাস ও তৃণসমূহকে জোড়া দিয়া বাঁধিতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই এইরূপ একটি চমৎকার আবরণ প্রস্তুত হইয়া যায়। আবরণটি একেবারে নিশ্ছিদ্র হইয়া যায়। বোধ হয় ইহা নির্ম্মাণ করিবার প্রধান কারণ ঝড়বৃষ্টি ও ইহাদের শত্রু পিপীলিকা প্রভৃতি পতঙ্গদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া। আবরণের ভিতর আবার সাপের খোলসের মত রক্তবর্ণ চর্ম্মকে ইহারা পরিত্যাগ করে এবং তখন ইহাদের বর্ণ দুগ্ধের মত শুভ্র দেখিতে হয়। ইহার লেজও থাকে না এবং পা গুলির অস্তিত্বও যেন প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। ইহার পর পোকাটি সঙ্কুচিত হইতে হইতে অনেকটা নারকেল কুলের বীচির আকার ধারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে দেহের শ্বেত চর্ম্মটিও তাহার আবরণের স্বরূপ হইতে থাকে। তখন আবার রং বদলায়। চর্ম্মের বর্ণ শ্বেত হইতে বাদামি রঙে

পরিণত হয়। পোকাটিকে তখন আর দেখা যায় না, কেবল উপরের চর্ম্মাবরণটা দেখা যায়। তাহা তখন মাছের আঁশের মত দৃঢ় হয়, পিপীলিকা কি অন্যান্য শত্রু সহজে তাহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। চর্ম্মাবরণের উপরে দুই পাশে চারিটি চারিটি করিয়া আটটি কালো কালো ফোঁটার দাগ হয়, একেবারে পশ্চাতে একটি ছোট কালো রঙের কাঁটা দেখা যায়। তখন এই আবরণের মধ্যে পোকাটি দিনে দিনে প্রজাপতির আকার পাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। এগার দিন পর্য্যন্ত এই ভাবে থাকিয়া চর্ম্মাবরণটি খুব কালো আর নরম হইয়া যায়, এত নরম হয় যে হাত দিয়া ধরিতে অসুবিধা হয়। তার পর একদিন তাহার মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্রকায় প্রজাপতি বাহির হয়।

প্রজাপতি।

এই প্রজাপতিটি নূতন ধরণের। ইহার আকার ও আয়তন অনেকটা বড় ডাঁস মাছির মত। ইহাদের মাথা ও মুখের অংশের আকার ক্ষুদ্র এবং অনেকটা শিশু ইঁদুরছানার মুখের মত। অন্য প্রজাপতি হইতে ইহাদের প্রভেদ এই যে ইহারা লেজবিশিষ্ট। লক্কা পায়রা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তাহার পুচ্ছ কেমন সুন্দর। ইহাদের পুচ্ছ ঠিক সেই রকম, ছড়ান—অনেকটা মেয়েদের পদ্ম খোঁপার মত গোল ও মনোহর। আবরণ হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ ইহারা স্বীয় পদ চতুষ্টয়কে ঘন ঘন স্পন্দিত করিতে থাকে, সেই স্পন্দনের ফলে ইহাদের সঙ্কুচিত পক্ষগুলি প্রশস্ত হইয়া যায়। তখনই ইহারা উড়িয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে।

সুধাকান্ত।

(২)
মাকড়সা।

মাকড়সা যে কি রকমের কীট তাহা কেহই অবিদিত নহেন। ইহারা আমাদের দেশে, ঘরে, গাছে, গর্ত্তে, দেওয়াল প্রভৃতি স্থানে জাল বুনিয়া বাস করে।

ইহাদের জাল বুনিবার কৌশল অতি আশ্চর্য্য। এক প্রকার রস দিয়াই ইহারা জাল বোনে। এইরস কোথা হইতে আসে তাহা বলা উচিত। জাল নির্ম্মাতা মাকড়সাদের পেটের নীচে, গরুর বাঁটের ন্যায় প্রায় পাঁচ ছয়টি করিয়া বাঁট থাকে। তাহা হইতেই এই রস বাহির হইয়া থাকে ও তাহাই শুকাইয়া সূতায় পরিণত হয়।

ধর যদি তাহারা দুই গাছের মাঝখানে জাল বুনিতে চায়, তবে ইহারা যে গাছে আছে সেই গাছের কোন একস্থানে সেই রস জড়াইয়া অবিরত সূতা ছাড়িতে থাকে।

তাহার পর সেই সূতা অপর গাছে লাগিয়া যায়। তাহার পর ত জাল-বিস্তার অতি সহজ হইয়া যায়—সেই নির্ম্মাতা সূতা দিয়া আবার পূর্ব্ব গাছটিতে যায়, ও সেই সূতাটি দোহারা করিয়া বুনিয়া ফেলে। এই রকম বার বার যাতায়াত করিয়া জালের খুঁটিগুলি তৈয়ারী করে। এস্থলে এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে—যে রস ত তরল, তাহা সূতার মত হয় কেমন করিয়া? ব্যাপারটা এই যে ঐ অতি সূক্ষ্ম সূত্রাকার রসই বাতাসে শুকাইয়া অল্প সময় মধ্যেই সূতায় পরিণত হয়।

আমরা সচরাচর যে মাকড়সার জালের সূতা দেখি, উহা একটি সূতা নহে—অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূতার সমষ্টি মাত্র। মাকড়সাদের জাল বুনিবার প্রণালী বড়ই চমৎকার। একটু মন দিয়া দেখিলে অবাক হইতে হয়। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা, কি এক ঘণ্টার মধ্যেই সে সমস্ত জালটি বুনিয়া ফেলে।

জালটি হইয়া গেলে, মাকড়সা জালের মধ্যে বসিয়া থাকে। কারণ সে জালের সাহায্যেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। জাল না বুনিতে পারিলে ইহাকে অনাহারে মারা পড়িতে হয়। ইহাদের জালে কোন কীট পড়িলে, উহা আটকাইয়া যাইবামাত্র জালটি নড়িতে থাকে। আবার কোন কোন মাকড়সা জালের মধ্যস্থান হইতে একটি মোটা সূতা মুখে করিয়া কোন স্থানে লুকাইয়া থাকে—ও কোন দ্রব্য পড়িলে সেই সূতাটিতে টান দেয়, যদি তাহা কোন কীট হয়, তবে পুনরায় জালটি নড়িতে থাকে—ও তখন মাকড়সাটি শিকার জানিতে পারিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হয়—ও তাহাকে ধরিয়া মুখ দিয়া তাহার শরীরের ভিতর একপ্রকার বিষ প্রবেশ করাইয়া দেয়। পোকাটি সেই বিষে কিছুক্ষণ মধ্যেই মরিয়া যায়। মরিয়া গেলে মাকড়সাটি তাহাকে ক্রমাগত সেই রস দিয়া জড়াইতে থাকে। অবশেষে জড়াইয়া তাহাকে রাখিয়া দেয়। সময় মত তাহাকে ভক্ষণ করে। কিন্তু যদি পোকাটি অপেক্ষাকৃত বড় হয়, তবে ক্রমাগত জাল দিয়া তাহাকে জড়াইতে থাকে, অবশেষে পোকাটি নিস্তেজ হইয়া পড়িলে—তাহার শরীরে বিষ প্রবেশ করাইয়া মারিয়া ফেলে। এবং পোকাটি যদি বিশেষ বড় হয় (যথা বোলতা ভিমরুল) তবে তাড়াতাড়ি জাল কাটিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, না দিলে সেই পোকা জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মাকড়সারা ঘরে, গাছে, গর্ত্তে প্রভৃতি নানাস্থানে বাস করে।

যাহারা গর্ত্তে বাস করে, তাহারা গর্ত্তেই ডিম পাড়ে ; ও ডিম হইতে ছানা বাহির হইবার কিছুদিন পরে মাকড়সাটি মারা যায়, এই শ্রেণীর মাকড়সারা গর্ত্তের মুখে একটি জাল রচনা করে, ও কোন কীট তাহাতে পড়িলে ধরিয়া খায়। ইহাদের একটি সুবিধা আছে—কোন বহিঃশত্রু আক্রমণ করিলে, তাড়াতাড়ি তাহারা গর্ত্তের ভিতর ঢুকিয়া যাইতে পারে। এই জাতীয় আর এক প্রকার মাকড়সা আছে, তাহারা মাটির নীচে থাকে, তাহাদের বাসার সম্মুখে একটি করিয়া ঢাকনি থাকে। ইহারা দিনে বাহির হয় না, কারণ তাহাদের অনেক শত্রু আছে, রাত্রিকালে বাহির হইয়া আহার অন্বেষণ করে।

ভিন্ন জাতির মাকড়সা ভিন্ন ভিন্ন রকমে ডিম পাড়ে, কেহ কেহ একটি আবরণ করিয়া তাহার ভিতর তাহার ডিম পাড়ে। কোন কোন মাকড়সা এই ডিম্বাবরণ নিজের সঙ্গেই রাখে, কোন জায়গায় পাড়ে না। যে মাকড়সারা ডিমের থলিটি মুখে করিয়া বেড়ায় তাহারা জাল রচনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে না। সম্মুখে কোন কীট দেখিলে তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া খায়, আর কোন কোন মাকড়সা এক জায়গায় ডিম পাড়িয়া তাহা পূর্ব্বকথিত রস দিয়া চাপা দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যেক মাকড়সাই পাখীদের মত ডিমে তা দিতে থাকে, এইরূপ তা দিতে দিতে কোন কোন ডিম পনের ষোল দিনে, ও কোন কোন ডিম কুড়ি একুশ দিনে ফোটে। যে দিন ডিম ফোটে, সেই দিন তাহা দেখিতে ভারি মজা! নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন হু হু করিয়া জল বাহির হয়, তেমনি ডিমের কোন অংশে ছিদ্র হইলে অজস্র অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকড়সা বাহির হইতে থাকে। মাকড়সাগুলি বাহির হইয়া যে যেদিকে পারে চলিয়া যায়, ও অবশেষে নিজের জীবনধারণের জন্য ব্যবস্থা করে। এমন অনেক মাকড়সা আছে যাহারা ব্যাঘ্রের মত আক্রমণ করিয়া কীটাদি ধরিয়া খায়। শুনিয়াছি এক জাতীয় মাকড়সা পাখী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব জন্তুও ধরিয়া খায়। তাহাদের গাত্রে খুব লোম আছে, ও দেখিতে বৃহৎ। কোন কোন মাকড়সা এক একটি বাসার ভিতর প্রায় ২৯/৩০টি ডিম পাড়ে। এইরূপ প্রায় ৪/৫টি বাসা পরস্পর ঝুলাইয়া রাখে। এই বাসাগুলির আবরণ সাধারণতঃ সবুজ।

এক জাতীয় মাকড়সা জলের উপর বাস করে, অর্থাৎ পদ্মপাতা, শেওলা প্রভৃতি তাহাদের আশ্রয়। জলে বেড়াইবার জন্য ইহারা কাট কুটা দিয়া একটি নৌকা তৈয়ারী করে, ও তাহাতে চড়িয়া জলচর ছোট ছোট কীটাদি ধরিয়া খায়।

প্রবোধ

আষাঢ় ১৮৩৪ শক। পৃ. ৭২-৭৫

আশ্রম-কথা।

জ্যৈষ্ঠের শেষে গ্রীষ্মাবকাশের পরে আশ্রম খুলিয়াছে।

এবার আশ্রমের প্রধান সংবাদ—দুইজন অধ্যাপক এবং কয়েকটি ছাত্র বিদেশ যাত্রার উপলক্ষ্যে আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালিমোহন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় এই দুইজন অধ্যাপকই সুদীর্ঘকাল যাবৎ আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন ; এবার কিছুকালের মত ইঁহারা আশ্রম হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চলিলেন।

শ্রীমান্ নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, শ্রীমান্ সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা, ও শ্রীমান্

চণ্ডীচরণ সিংহ আশ্রমের এই তিনজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্রও এবার শিক্ষার্থী হইয়া আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীমান্ নারায়ণ কাশীনাথ বিশেষভাবে শিক্ষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালী সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আসিবেন এবং ভবিষ্যতে আশ্রমে আসিয়া কর্ম্ম করিবেন। এই নিমিত্ত আশ্রম হইতেই তিনি প্রেরিত হইলেন।

আশ্রম হইতে ইঁহাদের এই যাত্রা শুভ যাত্রা হৌক, সফল যাত্রা হৌক, সকল আশ্রমবাসী এই প্রার্থনা করিতেছেন। ইঁহারা বিদেশ হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিবেন, তাহাতে আশ্রমেরই ভাবের প্রসার হইবে, কর্ম্মে নূতন প্রেরণা ও শক্তি জাগিবে, আশ্রমের প্রাণশক্তি ইঁহাদের প্রাণের দ্বারা প্রবল হইয়া উঠিবে। আশ্রম সর্ব্বোচ্চ সত্যকে স্বীকার করিবার এবং বরণ করিবার জন্যই সৃষ্ট ; সুতরাং নানা দেশের নানা সত্যকে মানিয়া লইতে ইহার বাধা কোথায়? এখানে যে যজ্ঞের আয়োজনটি করা হইয়াছে, তাহা কেমন করিয়া সার্থক হইবে যদি নানা দেশ হইতে নব নব অর্ঘ্য বহন করিয়া ব্রহ্মচারিগণ এখানে সমাগত না হন? আশ্রমকে আমরা কোন সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা দ্বারা বদ্ধ করিয়া দেখিতে চাই না, যদিও ইহাও সত্য যে ইহার যেটি নিত্যরূপ সেটি এদেশীয়। সেই জন্যই কোন আশঙ্কা নাই যে বিদেশের শিক্ষা এবং সাধনা যথার্থ আশ্রম-ভাবের এবং আশ্রম-আদর্শের বিরোধী হইবে। এখানে যে ঈশ্বরনিষ্ঠ ভক্ত সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহারই আদর্শ সর্ব্বোচ্চে চিরদিন বিরাজ করিবে, ইহা আমরা নিশ্চয় জানি।

সুতরাং পূর্ণ অন্তঃকরণে বিদায়ের প্রীতি সম্ভাষণ জানাই—যাঁহারা যাত্রা করিলেন তাঁহাদিগকে। তাঁহাদের যাত্রাকালে আশ্রম এই মন্ত্রপাঠ করিতেছেন :—যথাপঃ প্রবত যান্তি, যথা মাসা অর্হজরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাত আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। জল সকল যেমন নিম্ন দেশে গমন করে মাস সকল যেমন সম্বৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুন—স্বাহা। নব নব শিক্ষা লাভ করিয়া আসুন! নব নব দেশের বার্ত্তা বহন করিয়া আসুন!

শ্রীঃ—

প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ।

(১)

কাঠ্‌ঠোক্‌রা।

কাঠ্‌ঠোক্‌রা বঙ্গদেশে সুপরিচিত পক্ষী। কাঠ্‌ঠোক্‌রা তিন চারিপ্রকারের দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ধূসরবর্ণের কাঠ্‌ঠোক্‌রার সম্বন্ধে যেটুকু পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিয়াছি, সেটুকু লিখিতেছি।

আকৃতি।

ইহাদের গায়ের রং ধূসর এবং পায়ের রং হলদে। ঋজু, ছুঁচল, এবং বেশ লম্বা ইহাদের চঞ্চু। চঞ্চু হরিদ্রাবর্ণ এবং ঈষৎ রক্তাভাযুক্ত। ইহাদের পায়ের সম্মুখভাগে দুইটা আঙুল ও পশ্চাৎভাগে একটি আঙুল। পশ্চাতের আঙুলটি এত ছোট যে দেখা যায় না, সে প্রায় ঢাকা পড়িয়া যায়। ইহাদের জিহ্বার গঠন ভারি আশ্চর্য্য—লম্বা এবং তাহার অগ্রভাগটি গিরগিটির জিভের মত খরখরে। ইচ্ছা করিলে জিহ্বাকে ইহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত ছুঁড়িয়া মারিতে পারে। এই খরখরে জিহ্বাগ্রভাগ যে গোড়াতেই দেখা যায়, তাহা নহে। কাঠ্‌ঠোক্‌রার শাবকের মধ্যে ইহা লক্ষ্য করা যায় না।

ইহাদের পুচ্ছ লম্বা নহে, কিন্তু অত্যন্ত শক্ত এবং রংটা শরীরের রংয়ের ন্যায়। ইহারা যখন নীচু হইয়া বাসা নির্ম্মাণ করে, তখন ইহাদের পুচ্ছই গাছের গায়ে ঠেকাইয়া রাখিলেই তাহা নির্ভরদণ্ডের ন্যায় কাজ করে। ইহারা দিব্য অবলীলাক্রমে শাখা হইতে শাখান্তরে চড়িতে পারে, অন্য পাখিদের মত ইহাদিগকে লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতে হয় না। মাটিতে নামিতে ইহাদিগকে প্রায়ই দেখা যায় না।

বাসা নির্ম্মাণ।

বসন্ত ঋতুর শেষভাগে ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করিতে থাকে। আম কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের শুষ্কডালে ইহারা বাসা বাঁধিয়া থাকে। পা দিয়া শক্ত করিয়া ডাল ধরিয়া নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কঠিন পুচ্ছটিকে ইহারা ডালের সঙ্গে ঠেকাইয়া রাখে এবং তাহার উপর ভর করিয়া নীচের দিকে মাথা রাখিয়া সোজাভাবে চঞ্চু দ্বারা গর্ত্ত খুঁড়িতে থাকে। এইরূপে তাহারা ডালের শক্ত আবরণটিকে ভেদ করিয়া ফেলে এবং যেই ভিতরকার শাঁস পায় অমনি শাঁসের বরাবর নীচের দিকে গর্ত্ত খুঁড়িয়া যাইতে থাকে। প্রায় এক বিঘৎ গর্ত্ত খুঁড়িয়া ফেলে। এবং সেই গর্ত্তে কোন আবরণ বা আচ্ছাদন না দিয়াই তাহাতে ডিম পাড়ে।

ডিম।

গ্রীষ্মের প্রথমেই ইহারা ডিম পাড়ে। সাপের ডিমের ন্যায় ইহারা এক সঙ্গে চারিটি ডিম পাড়ে। গ্রীষ্মের শেষে এই ডিমগুলি ফুটিয়া ছানা বাহির হয়।

খাদ্য।

ইহারা সাধারণতঃ যে পোকামাকড়গুলি গাছের মধ্যে থাকে সেইগুলিই খায় এবং মাঝে মাঝে ঠোকরাণ কাঠের গুঁড়াও খাইয়া থাকে।

ইহাদের ধ্বনি কিন্তু মধুর নয়, বরং তাহার উল্‌টা। ইহাদের ধ্বনি শুনিয়া কবিত্বের উদ্রেক হওয়া শক্ত। সে জন্য আশা করি এই পাখীটিকে কেহ অমর্য্যাদা করিবেন না। কারণ ইহারা গাছের অনেক পোকাকে নষ্ট করিয়া প্রভূত উপকার সাধন করিয়া থাকে।

বংশু।

আকন্দগাছের গুটিপোকা ও প্রজাপতি।

আমরা আকন্দ গাছে এক নূতন ধরণের গুটিপোকা দেখিয়াছি। ইহারা অন্যান্য গুটিপোকা (যথা সন্ধ্যে গাছের গুটিপোকা ইত্যাদি) হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাদের অন্য কোন গাছের বা লতার পাতা খাইতে দেখি নাই, আকন্দ গাছের পাতা ও ছোট ছোট ফুলই ইহাদের একমাত্র খাদ্য। ইহাদের বর্ণ আকন্দ ফুলের মত। অবশ্য তাহার মধ্যেও অনেক বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণী আছে যাহাদের বর্ণ আকন্দ গাছের ডাঁটার মত। তবে তাহার মধ্যে আবার অনেক রকম রঙের কারিকরি আছে। এই দুই শ্রেণীর পোকা এক বৃক্ষেই দেখিয়াছি, ইহাদের গুটির আকার যদিও এক রকমের, তথাপি বর্ণের মধ্যে এই পার্থক্য আছে বলিয়া সেই পার্থক্যের যথার্থ কারণ কি তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। কারণ আমরা যে সকল গুটি বৃক্ষের ডাঁটায় বা পাতায় সংলগ্ন অবস্থায় দেখিয়াছি, তৎসমুদয়ই অবিকল আকন্দের ডাঁটার বর্ণ, আবার যে কয়েকটি পোকা আমাদের গ্লাসকেসের মধ্যে গুটি নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা প্রথমে শুভ্র ও পরে বাদামি রঙের হইয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্য সকলেই অবগত আছেন যে অধিকাংশ ইতর কীট ও পতঙ্গ, যথা ফড়িং ইত্যাদি, পাখী ও অন্যান্য জীব হইতে আত্মরক্ষার জন্য অনেক সময় রং বদলায়। অনেক সময় অনেক জীব তদপেক্ষা বৃহত্তম জীবের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিভিন্ন বর্ণ ধরে, সময় সময় সেই শত্রুর বর্ণ কেহবা অবিকল অনুকরণ করে। আবার অনেক সময় এমনও দেখিয়াছি যে অনেক কীট যে গাছে থাকে সেই গাছের বা পাতার বর্ণটিকে অনুকরণ করে। উদাহরণস্বরূপ সন্ধ্যে ফুলের গুটিপোকা ও তসরের গুটিপোকার নাম করা যাইতে পারে। আমরা সেজন্য স্পষ্ট বলিতে পারিলাম না যে এই দুই শ্রেণীর পোকার গুটির বর্ণব্যতিক্রম তাহাদের শ্রেণী বিভাগের জন্য হয় অথবা স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য হয়। ইহাদের দেহে লাল, পীত, খয়েরি রঙের অনেকগুলি বেষ্টন বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে সাজান রহিয়াছে। ইহাদের পশ্চাৎভাগের চক্রটির উপরে দুইটি করিয়া কাঁটা থাকে। পুনরায় তদুর্দ্ধে প্রায় পিঠের কাছে আরো দুইটি লালা কাঁটা থাকে। এবং মাথার উপরেও দুইটি কাঁটা আছে, মোট সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টি কাঁটা থাকে। এই কাঁটা বিশেষ তীব্র বা শক্ত নয়। অনেকটা প্রজাপতির শুঁড়ের মত। ইহাদের পা সর্ব্বসমেত দশটি। গুটি প্রস্তুত করিবার সময় ৭/৮ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে ইহারা নীরব ও নিঝুম হইয়া থাকে, পরে ক্রমে তাহাদের দেহের বর্ণ মলিন হইয়া আসে। তখন পোকাটি মেঠো শুঁয়োপোকার মত নিজের পশ্চাদ্ভাগ একটি ডালে বা পাতায় সংলগ্ন করিয়া মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলিয়া পড়ে ও ক্রমাগত নিজের শরীর বেশ সঙ্কুচিত করিতে থাকে। সেই সঙ্কোচনের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে পোকাটির চর্ম্মাবরণটি ধীরে ধীরে খসিয়া পড়ে। তখন পোকাটির শরীর অত্যন্ত নরম ও শুভ্র হইয়া যায়। ক্রমে তাহাই একটি আবরণস্বরূপ প্রস্তুত হয়। সাতদিনের পরে আবরণটি লাল হইয়া থাকে, কারণ তখন তন্মধ্যে পোকাটির আকার-অবয়ব সম্পূর্ণ

প্রজাপতির মত হইয়া যায়। শেষে অষ্টম দিনের দিন ঐ প্রজাপতি আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসে,—তখন আবরণ শাদা সাপের খোলসের মত হইয়া যায়। প্রজাপতিটি অন্যান্য কয়েক শ্রেণীর প্রজাপতি অপেক্ষা ঈষৎ বড়। ইহাদের বর্ণ হলদে ও লালে মিশান, বক্ষ কালো কিন্তু তাহাতে কয়েকটা শাদা ফোঁটা থাকায় তাহাকে আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের শুঁড় অন্য প্রজাপতি অপেক্ষা অনেক লম্বা। ইহারাও অন্যান্য প্রজাপতির মত গুটি হইতে বাহির হইয়া ঘনঘন স্পন্দিত হইতে থাকে,—সেই স্পন্দনের ফলে,—শরীরের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জড়সড় ভাব লোপ পায়, তখন ইহারা ফুলে ফুলে গাছে গাছে উড়িয়া বেড়ায়।

সুধাকান্ত।

শ্রাবণ ১৮৩৪। পৃ. ১০১-১০২

প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ।

মধুমালতীর প্রজাপতি

(১)

মধুমালতীর গায়ে আমরা একপ্রকার পোকা দেখিয়াছি, ইহাদের বর্ণ শৈশবে ঝাউগাছের গোড়ার রঙের মত কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে ঈষৎ পীতাভ হইয়া যায়। ইহাদের দেহের উপরিভাগ (অর্থাৎ পিঠের দিক) নিম্নাংশ (অর্থাৎ পেটের তলের দিক) হইতে অনেক পালিস, কারণ পেটের তলে ও দুইপাশে খুব সূক্ষ্ম রোম আছে। সেই রোমগুলি সহজে দেখা যায় না, কিন্তু একটু নজর দিলে ধরা পড়ে। ইহাদের পা সর্ব্ব শুদ্ধ যোলটি ; কেন্ন প্রভৃতি পোকার পা যেমন পরস্পর পাশাপাশি সুশৃঙ্খলভাবে সাজান থাকে, ইহাদের পা তেমন করিয়া সাজান থাকে না। ইহাদের পিছনের পা দুইটি রোহিত মৎস্যের লেজের ন্যায় দ্বিখণ্ডিত। এই পায়ের কিছু উর্দ্ধে পর পর চারি জোড়া পা আছে, এগুলি পিছনের পায়ের মত নহে। এই চারি জোড়ার শেষের জোড়াটি অত্যন্ত ছোট, এই এক জোড়া পা ইহাদের বক্ষের কাছে থাকে। এই ছোট পায়ের কিছু উর্দ্ধে গলার কাছে দুই পাশে তিনটি করিয়া ছয়টি পা আছে, এই ছয়টি পা চেলা বিছের সম্মুখের পায়ের মত। এই ছয় পায়ের সাহায্যে পত্রভক্ষণের সময় ইহাদের অনেক সুবিধা হয়, ভিমরুলের মাতার মত বর্ণে এবং আকারে এই পোকার মাথার সহিত বিশেষ কোন প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না, যেটুকু প্রভেদ আছে তাহা সহজে ধরা যায় না, ইহাদের পিছনের পায়ের উপরের মাংস কিছু উঁচু। ইহারা দৈর্ঘ্যে আড়াই ইঞ্চি হয় ; সময় সময় এতদপেক্ষাও দীর্ঘকায় দেখিয়াছি। রক্তপিপাসু জোঁক যেরকম ভঙ্গীতে স্বীয় শিকার ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসে ইহাদের চলনভঙ্গী ও ক্ষিপ্রতা বোধ করি তাহার চেয়ে কোন অংশ ন্যূন নহে। এইত গেল ইহাদের আকার, আয়তন, অবয়ব ও চলন-ভঙ্গীর কথা, এখন ইহাদের খাদ্য সম্বন্ধে বলিব।

খাদ্য ও তাহার সময়।

ইহাদের খাদ্য মধুমালতীর কচি সরু ডাঁটা ও নরম পাতা। পাতা অপেক্ষা কচি ডাঁটাই ইহারা বেশীর ভাগ ভক্ষণ করিয়া থাকে। মধুমালতীর পাতা এবং ডাঁটা ভিন্ন অন্য কোন উদ্ভিদের পাতা বা ডাঁটা ইহাদিগকে খাইতে দেখি নাই, খাইতে দিয়াও কৃতকার্য্য হই নাই। দিনের বেলায় ইহারা আরামে নিদ্রা যায়। ইহারা যখন নিদ্রা যায় তখন লতার গায় এমনভাবে আঁটিয়া থাকে যে সহজে তাহা হইতে ছাড়াইয়া লওয়া কঠিন। তাছাড়া লতার গায় যখন ইহারা লাগিয়া থাকে তখন ইহাদিগকে লতার শুষ্ক অংশ হইতে সহজে বাছিয়া বাহির করাও শক্ত, কারণ লতার যে জায়গায় ইহারা সংলগ্ন থাকে, বোধ হয় যেন সে অংশটি শুকাইয়া গিয়াছে।

ইহাদের এই যে আত্মরক্ষার উপায়টি ইহা নেহাত মন্দ নয়,—পাখী এবং অন্যান্য শত্রুর হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই ঈশ্বর ইহাদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন। সারা দিন নিদ্রার পর রাত্রিতে ইহারা ভক্ষণকার্য্যে মন দেয়, ও স্বল্প সময়ের মধ্যেই মধুমালতীর অনেক পাতা এবং ডাঁটা খাইয়া শেষ করিয়া ফেলে।

গুটি ও তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল।

ইহাদিগকে বর্ষারম্ভে গুটি নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছি। ইহাদের গুটির নির্ম্মাণ-কৌশল ভারি চমৎকার। গুটি নির্ম্মাণ করিবার সময়ের একদিন পূর্ব্ব হইতে ইহারা আহার এবং চলাফেরা বন্ধ করিয়া নিঝুম ভাবে বসিয়া থাকে। দ্বিতীয় দিনে কয়েকটি পাতাকে স্বীয় মুখের লালার সাহায্যে সাজাইয়া পরস্পর সংবদ্ধ করে ও একটি ছোট ঘরের মতন তৈরী করে। পরে ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে ঘরের সমুদয় ছিদ্র বা ফাঁক বন্ধ করিয়া দেয়। এইখানেই যে কারিকরি শেষ হইল তাহা নয়। ঐ পত্রাবরণের মধ্যে পোকাটি স্বীয় মুখের লালার সাহায্যে চমৎকার একটি জাল প্রস্তুত করে ও সেই জালের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া থাকে। এই অবস্থায় একদিবস থাকিয়া সাপের মত খোলস পরিত্যাগ করে। তখন হইতে ধীরে ধীরে পোকাটি গুটি হইতে থাকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পোকাটি তন্মধ্যে চমৎকার একটি গুটি হইয়া যায়, এই গুটির বর্ণ লালি, আকার সন্ধ্যা ফুলের গুটিপোকার গুটির মত, তবে দৈর্ঘ্যে একটু বড়।

প্রজাপতি।

এই গুটির মধ্যে ১২ দিনের দিন পোকাটি সম্পূর্ণ প্রজাপতি আকার প্রাপ্ত হয়, ও সেই দিন সহসা আবরণটি ফাটিয়া গিয়া তন্মধ্য হইতে একটি প্রজাপতি বাহির হয়। এই সময় প্রজাপতিটিকে দেখিতে একটা ডানা-কাটা পাখীর বাচ্ছার মত। অবশ্য অতবড় নয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রজাপতিটির পাখনা এবং সকল অবয়ব সম্পূর্ণ বাড়িয়া যায় তখন আর তাহাকে প্রজাপতি নয় বলিয়া মনে হয় না। এই প্রজাপতির বর্ণ কাল ছাইয়ের মত, পেটের তল এবং পিঠ এবং বক্ষদেশ কটা। ইহাদের ছয়টি পা

আছে, পাগুলির গায় করাতের কাঁটার মত ছোট ছোট তীক্ষ্ণ কাঁটা আছে। ইহাদের চোখের বর্ণ কটা, পাখনার গড়ন চ্যাংমাছের ডানার মত—তাহাতে অনেক গুঁড়া আছে। ইহারা সাধারণত রাত্রিতে উড়িয়া বেড়ায়, দিনের বেলায় জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে।

সুধাকান্ত।

তসরের গুটিপোকার প্রজাপতি।

(২) সমালোচনা

বিগত বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বংশু তসরের "গুটিপোকা ও প্রজাপতি" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

প্রজাপতির পুরুষ ও স্ত্রীজাতি নির্ণয় সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "পুরুষেরা আকারে স্ত্রী অপেক্ষা ছোট এবং গায়ের গুঁড়ার রং অল্প সবুজ ; কিন্তু স্ত্রীরা খুব বড় হয়। ইহাদের শরীরের গুঁড়ার রং হলদে হয়। সেইজন্য ইহাদিগকে হলদে এবং পুরুষদিগকে অল্প সবুজ দেখা যায়।"

প্রজাপতির স্ত্রী, পুরুষ নির্ণয় সম্বন্ধে বিভিন্নতার যে কয়েকটি লক্ষণ লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া লোকে সহজে স্ত্রী ও পুরুষ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ সকল পুরুষ প্রজাপতিই যে একই আয়তনের হইবে এমন কোন কথা নাই, কোনটি বা ছোট কোনটি বা বড় হয়। কাজেই যদি দৈবক্রমে দুই পুরুষ প্রজাপতি এক জায়গায় সমবেত হয় এবং সেখানে যদি উক্ত প্রবন্ধ পাঠকদের মধ্যে কেহ উপস্থিত থাকেন তবে তিনি নিশ্চয়ই দুইটার মধ্যে যে প্রজাপতিটি বড় তাহাকে স্ত্রী প্রজাপতি বলিয়া ঠাওরাইবেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলিয়াছেন যে, পুরুষ প্রজাপতির গায়ের গুঁড়ার রং অল্প সবুজ হয়। এবং স্ত্রী প্রজাপতির গুঁড়ার রং ঈষৎ হলদে, ইহাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

তসরের গুটিপোকার প্রজাপতির মধ্যে যাহার বর্ণ শালফলের বর্ণের মত এবং আয়তনে বৃহৎ তাহাই স্ত্রী প্রজাপতি। পুরুষ প্রজাপতির আয়তন ছোট এবং বর্ণ সম্পূর্ণ গাঢ় বাদামী। পুরুষ প্রজাপতির পক্ষদ্বয়, যাহা উপরের দিকে স্থাপিত তাহার গড়ন স্ত্রী প্রজাপতির উপরের পক্ষদ্বয়ের গড়ন হইতে একটু লম্বা। তারপর পুরুষ প্রজাপতির চোখের কাছের দুইটি শৃঙ্গ অবিকল কচি তেঁতুল পাতার মত। স্ত্রী প্রজাপতির যদিও দুইটি শৃঙ্গ আছে তথাপি তাহা পুরুষ প্রজাপতির শৃঙ্গ হইতে প্রস্থে অনেক ছোট। স্ত্রী প্রজাপতির পেট পুরুষ প্রজাপতির পেট অপেক্ষা অনেক মোটা। এবং ইহাদের পেটের তলের বর্ণ ছাইয়ের মত। পুরুষ প্রজাপতির পেটের তলের বর্ণ লাল। এই প্রজাপতির চারিটি পাখনায় যে চারিটি স্বচ্ছ বোতামের মত চক্র থাকে তাহার বেড়ের মধ্যভাগ হলদে। স্ত্রীর সবুজ।

সুধাকান্ত

ভাদ্র ১৮৩৪। পৃ. ১২৭-১২৮

স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার প্রবৃত্তি বোধ হয় সকল মানুষের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে আছে। সাধ করিয়া কেহ অন্যের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে চায়, এমনতো মনে হয় না। যেখানে বাধ্য হইয়া অন্যের বশবর্ত্তী হইতে হয়, সেখানে মন পীড়া বোধ করে। একটি ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে গেলেই সে বিরক্ত হয়, বা ক্রন্দন করে। তাহাতেই বুঝা যায় যে স্বাধীনতার প্রবৃত্তি হইতে শিশুও বঞ্চিত নহে।

কিন্তু এই আমাদের ভিতরের এমন একটি সদ্‌বৃত্তির সদ্ব্যবহার আমরা কিরূপে করিব তাহা আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হয়। আমরা সাধারণত স্বাধীনতা বলিতে বুঝি, যেখানে নিয়ম, যেখানে বন্ধন, যেখানে শৃঙ্খলা, সেখানে সেই সকল স্থানে তাহাদিগকে না মানিবার চেষ্টা করা। যাহারা কোন নিয়ম মানে না, আমরা তাহাদিগকেই স্বাধীনচেতা লোক বলি। নিয়ম আছে যে, ভদ্রসমাজে ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করিতে হইবে ;—অর্থাৎ ধর, যদি নিজের এমন কোন মত থাকে যাহা প্রকাশ করিলে অন্যের মন আহত হইতে পারে, তবে সেই মত না প্রকাশ করাই ভাল ; কিন্তু আমরা দেখি, যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই অন্যকে আঘাত দিয়া প্রতিবাদ করিয়া আস্ফালন করিয়া বেড়ায়, পাঁচজনে তাহাকেই স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টভাষী লোক বলে।

তবে কি নিয়মকে অতিক্রম করাতেই স্বাধীনতার ভাব প্রকাশ পায়? তাই যদি হয়, তবে এ বৃত্তিকে আমরা ভাল বলিব কেন? ইহার চর্চ্চাই বা করিব কেন?

কিন্তু স্বাধীনতার মানেই স্ব + অধীনতা—অর্থাৎ নিজের অধীনতা। তার মানে নিজের মধ্যে যে মহত্বের ও ধর্ম্মের এক বড় আদর্শ আছে, তাহারি অধীন হওয়া। স্বাধীনতা মানে কোন কালেই যথেচ্ছাচার হইতে পারে না। আমি স্বাধীন একথার অর্থ আমি আমার অধীন, বাহিরের কাহারও অধীন নহি। অন্যে যখন আমাদের উপর কোন নিয়ম বা অনুশাসন চাপায়, তখন ভিতর হইতে যদি তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা কোন সায় না পাই, তাহা হইলেই তাহা পীড়াদায়ক হয়। কিন্তু নিজের উপরে আমরা তদপেক্ষা কঠিনতর ও রূঢ়তর নিয়ম ও অনুশাসন চাপাইতে পারি—তাহাতে কিছুই হয় ত মনে হইবে না।

তবেই দেখা যাইতেছে যে নিয়মহীন স্বাধীনতা হইতেই পারে না। নিজের নিম্ন শ্রেণীর দুষ্প্রবৃত্তির অধীন হওয়াও স্বাধীনতা নয়। আমার যখন খুসি রাগ হয়, যখন খুসি অভিমান হয়, আমি যখন ইচ্ছা অন্যের প্রতি অবিচার করি ও অন্যায় করি—এ সব স্বাধীনতার লক্ষণ নহে—কিন্তু ইহা দুষ্ট প্রবৃত্তির অধীনতার অর্থাৎ দাসত্বেরই লক্ষণ। কিন্তু আমার মধ্যে যাহা মঙ্গল যাহা ধর্ম্ম যাহা শ্রেষ্ঠ, আমি তাহারি অধীন হইতেছি ইহাতেই যথার্থ স্বাধীনতার আনন্দ আছে।

পৃথিবীর যে সকল মহাপুরুষ সমস্ত মানুষকে এই নিম্ন শ্রেণীর প্রবৃত্তির দাসত্ব

হইতে মুক্তি দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই যথেচ্ছাচারকে স্বাধীনতা বলেন নাই—বরঞ্চ ধর্ম্মের নিয়মকে গ্রহণ করিয়া নীচ প্রবৃত্তির উর্দ্ধে উঠিবার কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত্র-কথা শ্রবণ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে মানুষের মনুষ্যত্ব সেইখানেই তাহার পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে, যেখানে সে কল্যাণের অধীন ধর্ম্মের অধীন হইয়াছে, তাহার সহস্র নীচ প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মের শক্তির লাগামের বশবর্ত্তী করিয়াছে। সেই যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার তেজ, সেই যে ন্যায়কে, ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা দিবার আশ্চর্য্য বল ও উৎসাহ, তাহাই তো স্বাধীনতার লক্ষণ। মহৎ ব্যক্তিরা এইরূপ স্বাধীনতা নিজেরা লাভ করিবার জন্য এবং সকল মানুষকে লাভ করাইবার জন্য কি না কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন! কত অসহ্য নির্য্যাতন পাইয়াছেন, মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে হইয়াছে। সক্রেটিস্ মানুষের বুদ্ধির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া এথেনীয়দিগের দ্বারা নিহত হইলেন। ভগবান খৃষ্ট সত্যধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া মরিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মের অধীন হইতে গিয়া যে বল লাভ করিয়াছিলেন ; যদি কিছুই মানিব না, গোঁয়ারের মত চলিব বলিয়া তাঁহারা চলিতেন তবে কি এত বল তাঁহাদের মনের মধ্যে আসিতে পারিত?

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বুঝা যায় যে মানুষ যাবৎ পর্য্যন্ত না কিছু পরিমাণে এই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় তাবৎ সে পৃথিবীর কোন মঙ্গল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। কারণ যে নিজের কতকগুলি ইচ্ছাকে কতকগুলি প্রবৃত্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে অক্ষম, সে কেমন করিয়া এমন একটা মঙ্গল অনুষ্ঠানকে সার্থক করিয়া তুলিবে যেখানে পদে পদে নিয়মনিষ্ঠা ও আপনার ইচ্ছার সংযম প্রয়োজন? সুতরাং যদি কোন মানুষ পৃথিবীতে আসিয়া কোন মঙ্গলসাধন করিবে এরূপ কল্পনা করে তবে তাহাকে প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে হইবে—অর্থাৎ ক্রমাগত নিজের উপরে নিজে জয়লাভ করিবার বলিষ্ঠতাকে অর্জ্জন করিতে হইবে।

শ্রীঃ

প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ।

মেঠো শুঁয়োপোকা ও তাহার প্রজাপতি।

আশ্রমের চারিপাশে যে সকল মাঠ আছে, তাহাতে সাধারণত দুই শ্রেণীর শুঁয়োপোকা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটির বিষয় আমরা বিগত বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। এইবার দ্বিতীয় শ্রেণীর শুঁয়োপোকার ও তাহার প্রজাপতির জন্ম ইতিহাস সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শুঁয়োপোকা পূর্ব্বোল্লিখিত শুঁয়োপোকার মত অত বেশী দেখা যায় না। না দেখা যাইবার প্রথম কারণ, ইহাদের বর্ণ সম্পূর্ণ কালো, তাহাতে অল্প

নীলাভা আছে, সুতরাং সবুজ ঘাসের নিম্নে কালো মাটিতে ইহার বর্ণ, বলিতে গেলে, প্রায় মিশিয়াই থাকে। সুতরাং ইহাদের প্রতি দৃষ্টি সহজে যায় না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প—তাহার প্রমাণ, ইহাদের প্রজাপতি কদাচিৎ নজরে পড়ে। ইহাদের গাত্রের শুঁয়ো বা কাঁটা বিষাক্ত না হইলেও পূর্ব্বের আলোচিত শুঁয়োপোকার শুঁয়ো হইতে তীক্ষ্ণ ও পরস্পর ঘেঁসাঘেঁসিভাবে স্থাপিত। ইহাদের মস্তকাংশ পীত। মাঠের কচি কচি তৃণ ও লতাপাতাই ইহাদের জীবনধারণের একমাত্র খাদ্যসামগ্রী। ইহাদের আকার আয়তন পূর্ব্বকথিত শুঁয়োপোকার মত।

গুটি।

ইহাদের গুটি প্রস্তুতকরণের প্রণালী পূর্ব্বকার আলোচিত শুঁয়োপোকার মতই, বিশেষ কোন পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে গুটির আকার, বর্ণ, এবং গড়নের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। ইহারাও গুটি নির্ম্মাণ করিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে নিঝুমভাবে বসিয়া থাকে ও ঐ সময় সুকৌশলে স্বীয় পশ্চাদ্ভাগ কোন একটি অবলম্বনযোগ্য বস্তুতে আবদ্ধ করিয়া মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া স্বীয় শরীর ক্রমাগত সঙ্কুচিত করিতে থাকি। সেই সঙ্কোচনের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ইহাদের দেহের চর্ম্মাবরণটি শুঁয়োসহ সর্পের খোলসের মত ঝরিয়া পড়ে। তখন ইহাদের দেহ অত্যন্ত কোমল ও শুভ্র হইয়া যায়। ইহার অল্প পরেই পোকাটি ধীরে ধীরে একটি গুটি হইতে থাকে। এই গুটির আকার অনেকটা আকন্দ গাছের গুটিপোকার গুটির মত, তবে সম্পূর্ণ সেরকম নয়, কয়েক জায়গায় বিভিন্নতা আছে। ইহাদের গুটির উপর কয়েকটা জায়গায় বিভিন্নতা আছে। ইহাদের গুটির উপর কয়েকটা আগাভাঙা কাঁটার মত থাকে। বলা বাহুল্য, এই গুটিও মাঠের লম্বা ঘাসে কিম্বা খর্জ্জুরের পাতায় ঝুলিয়া থাকে।

প্রজাপতি।

আবরণটির মধ্যে পোকাটি ক্রমে একটি প্রজাপতির আকার প্রাপ্ত হইতে থাকে, যতই পোকাটি প্রজাপতির অঙ্গপ্রাপ্ত হয় ততই আবরণটি কালো হইতে থাকে। এইরূপে সপ্তম দিবসের দিন পোকাটি সম্পূর্ণ প্রজাপতির আকার এবং অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। প্রজাপতিটি আবরণ মধ্য হইতে বাহিরে আসিলে, উক্ত আবরণ হইতে এক প্রকার তরল আঠার মত পদার্থ বাহির হয় ঐ তরল আঠার মত পদার্থের কিয়দংশ প্রজাপতির পক্ষচতুষ্টয়ে লিপ্ত থাকে। বোধ করি সেইজন্যই প্রজাপতিটি আবরণ হইতে বাহিরে আসিয়া স্বীয় অঙ্গকে ঘন ঘন কম্পিত করিতে থাকে। সেই কম্পনের ফলে ঐ আঠা পাখা হইতে ঝরিয়া পড়ে ও অবয়বসমূহের জড়তা এবং সঙ্কোচ সম্পূর্ণ দূর হয়। এই প্রজাপতির পক্ষচতুষ্টয়ের উপরের অংশের বর্ণ কালো, তাহাতে নীলাভা আছে ও তাহাতে কয়েকটি লাল রঙের গোল গোল চক্র আছে। ঐ চক্রগুলিকে দেখিলে ময়ূরের পেখমের বিচিত্র সৌন্দর্য্যমণ্ডিত গোল গোল

সবুজ আভাযুক্ত চক্রগুলির কথা মনে পড়ে। এই চক্রগুলি সম্পূর্ণ ময়ূরের পেখমের চক্রের মত না হইলেও অনেকটা সেই রকমের। পাখনা চারিটির নিম্নাংশ শুভ্র। তাহাতে অনেক বৈচিত্র্য আছে। সেখানেও কয়েকটি সুন্দর চক্র আছে, যদিও সেগুলি কালো। ইহাদের চারিটি পা অন্যান্য প্রজাপতির পা হইতে ছোট। এই শ্রেণীর প্রজাপতি খুব অল্পই নজরে পড়ে এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি।

সুধাকান্ত

আশ্বিন ১৮৩৪ শক। পৃ. ১৫৩-১৫৪

চিঠি।

ওঁ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

শ্রাবণের তত্ত্ববোধিনী সাতসমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমাদের হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে। আশাকরি এই মত প্রতি মাসেই বিদেশস্থ আশ্রমবাসীদিগকে পত্রিকা প্রেরণ করিয়া আনন্দিত করিবেন।

কেবল আশ্রম-কথা পড়িয়া আমাদের যাহা মনে হইতেছিল তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম ; আশাকরি এই পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া সুখী করিবেন।

আশ্রম-জননীর স্নেহাশীর্ব্বাদ এবং বিদায়সম্ভাষণ আমরা পূর্ণ অন্তঃকরণে গ্রহণ করিলাম। এই স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাদিগকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষীর গ্রহণে এবং নীর ত্যাগে সাহায্য করিবে। আশ্রম হইতে যত দূরে যাইতেছি আশ্রম-জননীর স্নেহের বন্ধন ততই দৃঢ় ও গভীরভাবে অনুভব করিতেছি। সন্তান মাতৃক্রোড় হইতে দূরে যাইয়া যেমন মাতৃস্নেহ অধিকতর গভীরভাবে অনুভব করে আমরাও তেমনি আশ্রমের ভাবসম্পদকে আরও বৃহত্তরক্ষেত্রে নূতন করিয়া অনুভব করিতেছি। ভারতের অন্তরতম যে একটি বাণী আমাদের আশ্রমের ভিতর দিয়া মূর্ত্তিলাভ করিতেছে পশ্চিম তাহার জন্য উৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছে। আমাদের ছাতিমতলায় মহর্ষির সাধনাবেদীর উপরিস্থিত প্রস্তরে খোদিত—"তিনিই আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি," এই বাণীকে সংগ্রামপূর্ণ পাশ্চাত্য জগতে বহন করিয়া আনিবার ভার আমাদের প্রত্যেক আশ্রমবাসীর উপর পড়িয়াছে। আমাদের আশ্রমবাসীদের প্রত্যেকের চরণে এই বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন এই মহান্ দায়িত্বকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিদিন জীবনকে জাগ্রত সাধনায় সচেতন রাখেন। আমরা অযোগ্য জীবন লইয়া এদেশে আসিয়াছি, ইহা স্মরণ করিয়া প্রতিদিন অনুতপ্ত হইতেছি। ভবিষ্যতে যাঁহারা এই কর্ম্মোদ্যমময় দেশে আসিবেন তাঁহারা যেন সাধনার জীবন্ত মূর্ত্তি লইয়া আসিতে পারেন ইহাই ভগবানের চরণে একান্ত প্রার্থনা।

আমরা প্রতিদিনই আশ্রমজননীর স্নেহহস্তের সংস্পর্শ অনুভব করিতেছি। এবং সেইজন্য "কিছুকালের জন্য আমরা আশ্রম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম"—একথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। আশ্রমের সহিত ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছেদও আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার
বাঁধা যে তার সুরে!"

বিনীত—
শ্রীকালীমোহন ঘোষ
লণ্ডন শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ
শ্রীচণ্ডীচরণ সিংহ
শ্রীনারায়ণ কাশীনাথ দেবল।

আশ্রম কথা।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুবাৎসরিক।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুবাৎসরিক উপলক্ষ্যে গত ২৭ শে সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে অপরাহ্নে এক সভা এবং সন্ধ্যার পরে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। সে দিন অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ ছিল।

ছাত্রগণ অতি সুন্দর করিয়া পুষ্প দ্বারা সভাগৃহ সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং সভার কার্য্যের কিছু কিছু অংশও গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ নন্দী সর্ব্বপ্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের মূল ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়া তাহা পাঠ করেন। তাহার পরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত হইতে নির্ব্বাচিত কয়েকটি চমৎকার অংশ আর কয়েকজন ছাত্র পরে পরে পাঠ করিয়া ছিলেন।

ছাত্রগণের পাঠ শেষ হইলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় রাজা সম্বন্ধে কিছু বলেন। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সমাজসংস্কারে, রাষ্ট্রে, সকল দিকে যে রামমোহন রায়ের আশ্চর্য্য প্রতিভা কিরূপ অসামান্যরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা বেশ সুন্দররূপে দেখাইয়াছিলেন। রাজা নানা ধর্ম্মের সকল বিকৃতি ভেদ করিয়া তাহাদের আসল মর্ম্মস্থানকে যে কিরূপে দেখিতে পাইতেন এবং সেই কারণে সকল ধর্ম্মের মধ্যে এক ঐক্যের বার্ত্তা তিনিই যে প্রথম ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও বক্তা মহাশয়ের কথার ভিতর হইতে বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রাজার চিত্ত সকল

মানুষের মধ্যে বিহার করিয়াও যে আপনার জাতিগত স্বাতন্ত্র্যকে কোন দিন নষ্ট করে নাই, রামমোহন রায়ের সেই বিশেষত্বের কথা বলিয়া নেপালবাবু তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

শ্রীযুক্ত চুণীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তার পরে কিছু বলিয়াছিলেন। সাধারণত সমাজসংস্কারকগণ যেরূপ উগ্র ও অস্থিরভাবাপন্ন হন—তাঁহাদের উৎসাহের অগ্নি চতুর্দ্দিককে দগ্ধ করিয়া যেরূপ তাঁহাদিগকেও যেন দগ্ধ করিতে থাকে—রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কারের কাজের মধ্যে সেই ব্যস্ততার ভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। তাঁহার মধ্যে যে স্থৈর্য্য ও প্রশান্তভাব দেখা গিয়াছিল, লুথর প্রভৃতির মধ্যে তাহা বিরল।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি বক্তৃতা করেন। তিনি বলিলেন যে রামমোহন রায় এমন একটি পূর্ণ মানুষ ছিলেন যে তাঁহাকে কোন বিশিষ্টতার দ্বারা চিহ্নিত করা অসম্ভব। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, সাধক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সমস্তই ছিলেন, অথচ ইহার কোন একটিকে বড় করিয়া দেখিলে তাঁহার যথার্থ স্বরূপটিকে দেখা হইবে না—কারণ একটি সুগঠিত অবয়ববিশিষ্ট শরীরে যেমন কোন একটি অঙ্গবিশেষ সকলকে অতিক্রম করিয়া গোচর হয় না, তেমনি এ সমস্ত তাঁহার সেই অখণ্ড মানুষটির মধ্যে এমনি মিলিয়া আছে যে, ইহাদের স্বাতন্ত্র্য চোখেই পড়ে না। রামমোহন যে কোন বিশিষ্টতার দ্বারা বিশিষ্ট নন ইহাই তাঁহার বিশিষ্টতা।

সেই কারণে জগতের আর কোন মহাপুরুষের মধ্যে যেটি দেখা যায় নাই রামমোহনের মধ্যে সেই জিনিষটি দেখা গিয়াছিল। তিনি একই সময়ে ধ্যানের অভ্রভেদী হিমাদ্রিশিখরে এবং লোকালয়ের কলকোলাহলের মধ্যে থাকিতে পারিতেন। গঙ্গার মত তিনি কোন্ লোকচক্ষুর অনধিগম্য রহস্যময় লোক হইতে আপনার ভাবের ধারাটিকে পরিপূর্ণ করিয়া লইতেন এবং মানবপ্রেমে মানুষের পঙ্কিমা আবিলতার মধ্যে, উত্তপ্ত সঙ্কীর্ণতার মধ্যে প্রত্যেক মানুষকে 'ব্রাদার' বলিয়া হাতে ধরিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। মানুষের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবধান ছিল না। অন্য মহাপুরুষের কাছে শিষ্য হইয়া ধর্ম্মার্থী হইয়া অনেকে গিয়াছেন এবং পূর্ণ হইয়াছেন ; কিন্তু রামমোহন কাহারও গুরু ছিলেন না ; তিনি যে সকল লোকের বন্ধুতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই তাঁহার অন্তরের অন্তরঙ্গ ছিলেন না—তাঁহাকে বুঝিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে রামমোহনকে তাহা কোন বাধা দিত না। ভাব এবং কর্ম্ম যে দুইটি জিনিষ পৃথিবীতে চিরদিন বিরুদ্ধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে—ইহার কাছে তাহারা একেবারে এক ও অব্যবহিত ছিল। ইহাকে তাই কোন নির্জ্জনতা অন্বেষণ করিতে হয় নাই। যাহা ভাবরূপে পাইয়াছেন, কর্ম্মের মধ্যে তাহারি মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু সে কি সঙ্কীর্ণ মূর্ত্তি—ক্ষণকালীন প্রয়োজন-সাধনের মূর্ত্তি? তাঁহার সেই সুদূরের দৃষ্টি ছিল যাহাতে তিনি নিকটের মধ্যে দূরকে, খণ্ডের মধ্যে সম্পূর্ণকে,

বর্ত্তমানের সকল তুচ্ছতা বিকৃতির মধ্যে ভাবীকালের নির্ম্মল অপরূপতাকে দেখিতে পাইতেন। সেই আনন্দে তাঁহার সকল বাধা ভাসিয়া যাইত, মানুষের কাছে আসিয়া 'ব্রাদার' বলিয়া তিনি তাহার হাত ধরিতে পারিতেন। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় কি দ্বন্দ্বশীল তিনি ছিলেন, কিন্তু কাজের হাটে—যেখানে নদীর ফেনায়িত মূর্ত্তি দেখা যায়—অথচ তাহারি ভিতরে মধ্যে মধ্যে এমন একটি সুদূরের আভাস পাওয়া যায় যাহা তাঁহার ধ্যানশীলতার পরিচয় দেয়। ধ্যান তাঁহার এইখানেই—কাজের মধ্যে, হাটের মধ্যে—গাড়িতে চলিতে চলিতে তাঁহার উপাসনা।

এই অখণ্ড মনুষ্যত্বটি তাঁহার মধ্যে জাগিয়াছিল বলিয়াই তিনি এ যুগের গুরু হইয়াছেন। মানুষকে সর্ব্বতোভাবে সকল দিক হইতে বড় করিয়া দেখা তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। তিনি যে সম্বন্ধে যখন আলোচনা করিতেন তাহার শেষ পর্য্যন্ত না গিয়া তিনি থামিতে পারিতেন না। জুরিস প্রুডেন্স—আইনতত্ত্ব—পড়িতে আরম্ভ করিলেন তো সমস্ত আইনতত্ত্ব পড়িলেন—এমন কি আয়র্লণ্ড যাইবেন সংকল্প করিয়া তিনি কেল্টদিগের সময়ে **Bruhan Law** নামক এক অতি পুরাতন আইনও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মানুষকে তিনি অখণ্ড করিয়া না দেখিয়া আংশিকভাবে দেখিতেই পারিতেন না। কারণ তাঁহার নিজের প্রকৃতির মধ্যে আংশিকতা কোথাও ছিল না।

সায়াহ্নে বালকগণ পদ্মফুলে মন্দির সাজাইয়া ধূপ জ্বালিয়া চতুর্দ্দিক সৌগন্ধ্যে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় উভয়ে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বালকগণ মধুরকণ্ঠে একটি সঙ্গীত করিলে পর স্বাধ্যায় ও উপাসনা হইল। তারপর ক্ষিতিমোহন বাবু রাজার উপরে একটি অতি চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই একটি সুন্দর কথা দিয়া আরম্ভ করিলেন। তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পিতৃপক্ষে রামমোহন রায়ের এই শ্রাদ্ধদিবসটি পড়িয়াছে; যে সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পিতৃগণের, আচার্য্যগণের ও ঋষিগণের তর্পণ সকল ভারতবাসী করিতেছে। এই সময়ে যে আমরা এই যুগগুরুর শ্রাদ্ধ করিতে পাইয়াছি, ইহা খুবই আনন্দের কথা। কারণ ইনি এমন একজন মহাপুরুষ যিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নন—যাঁহাকে কোন বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে কোন দিনই কেহ টানিতে পারিবে না। তিনি একটি উপমা দিলেন, গঙ্গার স্তব হইতে। গঙ্গাকে একজন স্তব করিয়াছেন যে, সকল তীর্থের সঙ্গে তীর্থকে গঙ্গা গ্রথিত করিয়া লইয়া এক মহাসাগরের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন। রামমোহন রায়ের চিত্তও সেইরূপ বিশ্বের সকল তীর্থের মধ্য দিয়া ধাবিত হইয়াছে, কত মত, কত ধর্ম্মের মধ্য দিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন তীর্থই তাঁহাকে তাহার বিশেষ জিনিষ করিয়া লইতে পারে নাই। তিনি সেই সকলের মধ্য দিয়া গিয়া সেই একের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন যেখানে সকলেরি গতি।

তিনি এই যুগগুরু—এই যুগে এমন একটি ব্যাপার হইয়াছে যাহা আর অন্য কোন যুগে হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে সকল জগতের সমস্ত ব্যাপার এমন করিয়া মানুষের প্রত্যক্ষ

হয় নাই। এক এক দেশের এক এক সভ্যতার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম তাহার আপন আপন স্থানে বসিয়াছিল—সকলকে মিলাইবার মত একটি ধারা তাহাদের মধ্যে আসে নাই—সকলেই যে ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া এককেই চাহিয়াছে এবং জানিয়াছে তাহা জানা যায় নাই। এই যুগে যেমনি সেই প্রয়োজন জানিল, অমনি তাহাকে মিটাইবার মানুষও দেখা দিলেন।

কিন্তু এই বাংলাদেশের তখন এমন কি সাধ্য যে তাঁহাকে খাদ্য জোগায়? বিনতা কামনা করিয়াছিলেন যেন তাঁহার মহৎ সন্তান জন্মলাভ করে—তাই, যখন গরুড় জন্মলাভ করিলেন তখন 'খাদ্য কোথায়' বলিয়া তিনি চিৎকার করিলেন। বিনতার সাধ্য কি যে তাঁহার খাদ্য জোগান—তাঁহাকে কোন্ দূরে ছুটিতে হইল খাদ্যের অন্বেষণে। সেইরূপ দুঃখিনী বঙ্গজননী তাঁহার দুঃখমোচনের জন্য মহৎ সন্তান কামনা করিতেছিলেন, কিন্তু রামমোহন রায় যখন জন্মিলেন তখন তাঁহার খাদ্য তিনি জোগান এমন সাধ্য তাঁহার কোথায়! রামমোহনকে খাদ্যের অন্বেষণে কত স্থানে ঘুরিতে হইল—দুর্গম হিমগিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে যাইতে হইল। কত দেশদেশান্তরে তাঁহাকে এই খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু তিনি যে এই নানা ধর্ম্মের ভিতর হইতে তাঁহার আত্মার পরিপুষ্টি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এ সমস্ত তিনি কি একটা তাল পাকাইয়া জড়পিণ্ডের মত তৈরী করিয়াছিলেন? এখানে কিছু, ওখানে কিছু—এরূপ নানা স্থানের নানা সংগ্রহের জড়সমষ্টি কি তাঁহার ধর্ম্মসমন্বয় ছিল? না—(এইখানে বক্তা মহাশয় রামমোহনের গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করিলেন) স্পষ্টই দেখা যায় যে তিনি এমন একটি কেন্দ্রস্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন যেখানে চক্রের সকল নেমিগুলিকে তিনি একই কেন্দ্র হইতে নানা দিকে ধাবিতরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সকল সত্যের কেন্দ্রস্থানে দাঁড়াইয়া সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একতে দেখাই চিরদিন ভারতবর্ষের বৃহৎ প্রতিভা। বৃক্ষের একটি উপমা এখানে দেওয়া যায়। মূলের দিকে বৃক্ষের কোন বিচিত্রতা নাই—পরিবর্ত্তন নাই—অথচ উপরের দিকে ক্রমাগতই কাণ্ড হইতে শাখাপ্রশাখা—ফুলফল, নানা বিচিত্রতা। ভারতবর্ষও সেই মূলটিকে নিজের ভূমিতে স্থির রাখিয়া সকল পরিবর্ত্তনকে তাহা হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া জানিয়াছিলেন। নহিলে যদি মূলকে উপরে দিয়া আর শাখাপ্রশাখাগুলিকে নিজের ভূমিতে পুঁতিয়া ধর্ম্মসমন্বয় করা হইল মনে করা যায় তবে সে বৃক্ষের প্রাণ বাঁচে কি? আমাদের দেশের যেখানে প্রতিভা, যেখানে প্রাণ সেইখানে রামমোহন রায় ছিলেন—সেইখানে গিয়া তার পর তিনি আপনার উপরে অজস্র বৈচিত্র্য ফুটাইয়াছেন—কিছুতেই তাঁহার বাধে নাই। সেইজন্য আমাদের দেশের চিরাগত প্রথানুসারে তিনিও গীতার, উপনিষদের নূতন করিয়া ভাষ্য লিখিয়াছেন—কিন্তু এবার ভারতবর্ষ যে ভাষ্য লাভ করিল তাহা আর কোন সাম্প্রদায়িক ভাষ্য হইল না—তাহা ভারতবর্ষের চিরন্তন তত্ত্বকে সকল বিশ্বতত্ত্বের মাঝখানে স্থির ভূমি দান করিল।

বক্তা মহাশয় তার পর রামমোহনের গ্রন্থ হইতে আরও কএকটি স্থান পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিলেন। সর্ব্বশেষে একটি বেদগান হইয়া উপাসনা ভঙ্গ হইল।

আশ্রমবাসী।

আশ্রম-সংবাদ।

পূজাবকাশ উপলক্ষ্যে ২৭শে আশ্বিন হইতে ৩রা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত আশ্রম-বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ থাকিবে ; ৪ঠা অগ্রহায়ণ হইতে পুনরায় বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

আশ্রমসম্মিলনী।

আশ্রমবাসী অধ্যাপক ও ছাত্রসকলকে লইয়া 'আশ্রমসম্মিলনী' কয়েক মাস হইল গঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মাসে দুইবার করিয়া এই সভা বসিয়াছে। আশ্রমসংক্রান্ত সকল বিষয় যাহাতে অধ্যাপক ও ছাত্রগণ মিলিতভাবে আলোচনা করেন এবং যাহা যাহা করণীয় তাহা স্থির করেন, এই সভা-প্রতিষ্ঠার ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। আশ্রমে যত দিকে যতগুলি অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, এই সম্মিলনীকে তাহাদের সকলগুলির কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া তুলিবার জন্য বিগত সভার পূর্ব্ব সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। আশ্রমসম্মিলনী সাধারণ সভার সংশ্লিষ্ট একটি কার্য্যনির্ব্বাহক প্রতিনিধি-সভা আছে, তাহার সভ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমকুটীর হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত নেপাল বাবু প্রস্তাব করেন যে আশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানের শাখা সভা গঠিত হইয়া তাহা হইতে প্রতিনিধি-সভার সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হন। গত সভায় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এ প্রস্তাব সম্মিলনী গ্রহণ করিয়াছেন, এবং স্থির হইয়াছে যে, মাসে একবার করিয়া সাধারণ সভা ও দুইবার করিয়া প্রতিনিধি-সভা বসিবে। আমরা একে একে বর্ত্তমান সময়ের আশ্রমের অনুষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ প্রদান করিতেছি।

(১) গ্রাম্য বিদ্যালয়।

আশ্রমের নিকটে যে সকল সাঁওতাল-পল্লী আছে, সেখানে কয়েকজন আশ্রম-বালক প্রত্যহ বৈকালে গিয়া সাঁওতাল-বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠান সাত আট মাস যাবৎ চলিতেছে, এবং এই স্বল্প দিনের চেষ্টার ফলে কয়েকজন সাঁওতাল-বালক নিজের নাম এবং যুক্তাক্ষরহীন শব্দ লিখিতে শিখিয়াছে। ছবির পুস্তকের সাহায্যে তাহাদের বর্ণপরিচয় লাভ হইয়াছে। কথিত বাংলা ভাষা যাহাতে তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে এই নিমিত্ত তাহাদিগকে নানা প্রকার গল্প বলা হয় এবং বাংলায় কথাবার্ত্তা বলাইবার চেষ্টা করা হয়। এই অনুষ্ঠানের ভার শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) সেবা-ভাণ্ডার।

আশ্রমে একটি সেবা-ভাণ্ডার আছে, ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ ঐ ভাণ্ডারে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। আশ্রমে সময়ে সময়ে দরিদ্র অতিথি আসিলে এবং আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন হইলে ঐ ভাণ্ডারের অর্থ ব্যয়িত হয়। এই দারিদ্র্য-ভাণ্ডার বর্ত্তমানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়ের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। এই ভাণ্ডারের মাসিক আয় এখন গড়ে আট টাকার কাছাকাছি। দুইটি বিদ্যার্থী এই ভাণ্ডার হইতে প্রতি মাসে সাড়ে চার টাকা হিসাবে অর্থ-সাহায্য পাইয়া থাকে। আমাদের আশ্রম হইতে অন্ধ, মূক, খঞ্জ ও রুগ্ন কখনো রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় না। চাউল, ছিন্নবস্ত্র ও যৎসামান্য অর্থ দিয়া আগন্তুক ভিখারীদিগকে সাহায্য করা হয়। দ্বিপ্রহরে বালকেরা কাঙ্গালিদিগকে ভোজনাবশেষ অন্ন ব্যঞ্জন নিজেদের হস্তে বিতরণ করিয়া থাকে।

(৩) ক্রীড়া বিভাগ।

আশ্রমের ছাত্রগণ অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে সময়োপযোগী খেলা খেলিয়া থাকেন ; আজকাল ফুটবল খেলা হইতেছে। পূজার ছুটির পর ক্রিকেট খেলা হইবে। আশ্রমের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৭টি ফুটবল টীম আছে। এখানকার ছাত্রগণ সময় সময় পরস্পর এক একটি দল গঠিত করিয়া ম্যাচ খেলিয়া থাকেন। ১০ই ভাদ্র সুহৃদ কাপের (সুহৃদ কুমার সেন আশ্রমের একজন সাধুস্বভাব ছাত্র ছিলেন ; বিগত ২১শে পৌষ অপরাহ্নে তাঁহার মৃত্যু ঘটে) ম্যাচ হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ বর্গের বালকগণ উক্ত কাপ এক বৎসরের জন্য জয় করিয়াছেন।

ক্রীড়াবিভাগের নায়কতা শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় করিয়া থাকেন।

(৪) সাহিত্য সভা।

আশ্রমের ছাত্রগণ সাহিত্য সভার-নিমিত্ত মাসের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দিবসে সাহিত্য-সভার অধিবেশন করিয়া থাকেন। একটি সাহিত্য-সভা শিশুদের জন্য, এবং অপরটি বয়স্ক বালকদিগের জন্য। এই সাহিত্য-সভায় সঙ্কলন, মৌলিক প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, অনুবাদ প্রভৃতি বিবিধ ছাত্ররচনা পঠিত হয়। এ ছাড়া সঙ্গীত বক্তৃতা প্রভৃতিও হয়। তবে শিশু-সাহিত্য-সভায় অধিকাংশ সময় তর্কযুদ্ধ হয়। বিগত ১লা আশ্বিন তারিখে বড় ছেলেদের যে সাহিত্য-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে জনৈক ছাত্র রুষ-জাপান যুদ্ধের একটি গল্প ও অন্য আর একজন ছাত্র একটি ইংরাজি হইতে অনূদিত গল্প পাঠ করেন। শিশুদের সাহিত্য-সভায় দুই দল দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া তর্কযুদ্ধ করিয়াছিল। একদল অর্জ্জুনের পক্ষ, অন্য দল লক্ষ্মণের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তর্কের বিষয় ছিল—অর্জ্জুন এবং লক্ষ্মণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। অনেক তর্কের-পর অবশেষে অর্জ্জুন পক্ষাবলম্বিগণ জয়ী হইয়াছিলেন।

ইংরাজি সাহিত্য সভা।

মাঝে মাঝে ছাত্রগণ একটি ইংরাজী সাহিত্য-সভা আহ্বান করিয়া থাকেন। তাহাতে তর্কবিতর্ক, অবৃত্তি, ও ছোটখাট অভিনয় হইয়া থাকে। কখনো কখনো আমোদজনক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সকলও প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

(৫) পত্রিকা।

এখানকার ছাত্রগণ মাসে মাসে পাঁচটি বাংলা মাসিক পত্রিকা হাতে লিখিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। পত্রিকাগুলির মধ্যে 'শান্তি' ও 'বীথিকা' বড় ছেলেদের উপযোগী। 'প্রভাত' এবং 'বাগান' মধ্যম বয়স্ক ছেলেরা বাহির করেন। 'শিশু' পত্রিকা শিশুদের জন্য। উল্লিখিত পত্রিকাগুলিতে গল্প, প্রবন্ধ, সঙ্কলন, কবিতা, প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণের ফল প্রভৃতি নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক পত্রিকাই ছাত্রগণ আপনাদের অঙ্কিত সুন্দর চিত্রে শোভিত করিয়া বাহির করিয়া থাকেন।

(৬) বাগান।

আশ্রম-ছাত্রগণ আজকাল আশ্রমের পথ বাঁধানো, জঙ্গল পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। যাহাতে এক একদল ছাত্র এক একখণ্ড জমি লইয়া তাহাতে যত্নের সহিত শাক সব্‌জি রোপণ করিতে পারেন তজ্জন্য চেষ্টা চলিতেছে। বাগানের ভার শ্রীযুক্ত সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন।

গৃহের নামকরণ। আশ্রমের দক্ষিণ দিকের প্রান্তরে যে তিনটি নূতন ঘর হইয়াছে, তাহাদের নামকরণ আশ্রমের পরলোকগত তিনজন অধ্যাপকের নামে করা হইয়াছে। যথা—সত্য-কুটীর, মোহিত-কুটীর, সতীশ-কুটীর। এছাড়া, আর একটি ছোট ঘর আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ৺সরোজ চন্দ্র মজুমদারের নামে "সরোজ কুটীর" নামে অভিহিত হইয়াছে।

ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

কার্তিক ১৮৩৪। পৃ. ১৭৭-১৮০

বিজ্ঞাপন।

আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে আমরা আশ্রমের পক্ষ হইতে আগামী ৮ই পৌষে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমাদের সাদর নিমন্ত্রণ জানাইতেছি। সেদিন তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইয়া এই উৎসবের আনন্দবর্দ্ধন করুন এবং ইহার কার্য্য সুসম্পন্ন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। যাঁহারা আসিবেন তাঁহারা আমাদের কাছে পত্র লিখিয়া জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। ইতি

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার
শান্তিনিকেতন, বোলপুর।
শ্রীসুজিতকুমার চক্রবর্ত্তী
১২৩/২ আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

আগামী ৮ই পৌষ শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পুরাতন অধ্যাপক মহাশয় ও ছাত্রগণের সকলের এই উপলক্ষে উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার

সম্পাদক, আশ্রমিক সংঘ।

আশ্রম কথা।

পূজাবকাশের পর আশ্রম পুনরায় খুলিয়াছে।

এবার অকালে শীত আসিয়া পড়িয়াছে। শরৎ আর শীতের মাঝখানে হেমন্তের শিশিরার্দ্র স্নিগ্ধতা ও মন্দীভূত রৌদ্রতেজের সাক্ষাৎলাভের পূর্ব্বেই উন্মুক্ত প্রান্তরে উত্তরের তীব্র হাওয়ায় শীতের শৃঙ্গবাদন শোনা গিয়াছে।

পূজাবকাশের পূর্ব্বে আশ্রমে "শারদোৎসব" অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয় দেখিয়া সকলেই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। শীতের উৎসব ৭ই পৌষ আসন্নপ্রায়। তাহার জন্য এখন হইতে আয়োজন চলিতেছে।

৮ই পৌষ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসব। এবার ৯ই পৌষ বিদ্যালয়ের পরলোকগত অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হইবে এবং তাঁহাদের জীবনচরিতের আলোচনা হইবে।

৭ই পৌষের পর হইতে নূতন সেশন। অগ্রহায়ণের শেষে বাৎসরিক পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়া সকল বিষয়ের বর্গগুলি পুনরায় নূতন করিয়া গঠিত হইবে এবং আগামী বৎসরের জন্য নূতন পাঠ্যপুস্তক সকল স্থিরীকৃত হইবে।

বিদ্যালয় খুলিবার পরে 'আশ্রম সম্মিলনী' দুইবার মাত্র বসিয়াছে। কার্ত্তিকের পত্রিকায় আমরা তাহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। স্থির হইয়াছে যে আশ্রমে ছাত্রদের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে তাহারা কেহ কেহ এক, কেহ কেহ একের অধিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া এই সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় প্রেরণ করিবে। এই সভাটি আশ্রমের সকল অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্বরূপ হইবে।

গ্রাম্যবিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে। সাঁওতাল ছাত্রগণ অনেকেই বাংলা প্রথম ভাগ পড়িতে শিখিয়াছে, লিখিতে শিখিয়াছে এবং একশত পর্য্যন্ত সংখ্যা গণিতে শিখিয়াছে। কেহ কেহ দ্বিতীয় ভাগ ধরিয়াছে।

আশ্রমের যে সকল ছাত্র ও অধ্যাপক বিদেশে অধ্যয়ন করিতেছেন, বিদেশ হইতে প্রায় প্রতিসপ্তাহেই তাঁহারা আশ্রমে পত্র লিখিতেছেন। শ্রীযুক্ত কালিমোহন ঘোষ ও শ্রীমান্ নারায়ণ কাশীনাথ দেবল লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে—একজন ইংরাজী

সাহিত্য ও রচনার কোর্স ও আর একজন ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনের কোর্স গ্রহণ করিয়াছেন। কালিমোহন বাবু সেখানকার শিশুশিক্ষাপ্রণালী বিশেষ উৎসুক্যের সহিত অনুধাবন করিতেছেন। শ্রীমান্ অরবিন্দ মোহন বসু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। শ্রীমান্ চণ্ডীচরণ সিংহ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছেন। শ্রীমান্ সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন।

আগামী মাসে আশ্রম সংবাদ রীতিমত জমিয়া উঠিবে। যাঁহারা আশ্রমের খবরের জন্য বুভুক্ষু হইয়া থাকেন তাঁহাদের সেই আশ্বাস দিয়া এবারকার সংবাদ এখানেই শেষ করিলাম।

প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ।

শালগাছের শুঁয়োপোকা ও তাহার প্রজাপতি।

গত আশ্বিন মাসে আমাদের আশ্রমের শালবৃক্ষে এক নূতন শ্রেণীর গুটিপোকা দেখিয়াছিলাম। এই পোকাগুলির বর্ণ ছাইয়ের বর্ণের মত—তাহার মধ্যে নীল, লাল, কালো বর্ণের অনেক বৈচিত্র্য আছে। আমরা সচরাচর যে সকল শুঁয়োপোকা দেখি ইহারা সেই শ্রেণীর শুঁয়োপোকার মতন নহে। ইহাদের পৃষ্ঠে যে সকল লোম আছে তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। পেটের দুই পাশে অর্থাৎ পায়ের ঈষৎ ঊর্দ্ধে অজস্র দীর্ঘ লোম আছে। এই রোমগুলি কোমল ও ধূসর বর্ণ। ইহাদের মাথার উপর দুইটি রোমগুচ্ছ এক চতুর্থ ইঞ্চি ব্যবধানে স্থাপিত। এই রোমগুচ্ছের পরিধির ঊর্দ্ধাংশের বর্ণ লাল, নিম্নাংশের বর্ণ শুভ্র। এই পরিধির ঈষৎ ঊর্দ্ধে আরও দুইটি রোমগুচ্ছ আছে। এই দুইটির বর্ণ ধূসর এবং স্বল্প নীলাভাযুক্ত। ইহাদের পায়ের সংখ্যা মোট ষোলটি। তন্মধ্যে গলার কাছে যে ছয়টি পা,—তিনটি করিয়া দুই পাশে স্থাপিত থাকে,—সেগুলি অন্য দশটি পা অপেক্ষা ছোট এবং তীক্ষ্ণ—অনেকটা বড় চেলাবিছের পায়ের মত। এগুলির সাহায্যে ইহারা বৃক্ষের গায়ে লাগিয়া থাকিতে অনেকটা সুবিধা পায়। ইহারা দৈর্ঘ্যে পৌনে তিন ইঞ্চি। এই তো গেল ইহাদের আকার, আয়তন, অঙ্গ, অবয়ব এবং বর্ণের কথা—এখন বলিব ইহাদের খাদ্যের বিষয়ে।

খাদ্য।

ইহারা শালপাতা খাইয়া জীবনধারণ করে। আমরা তসরের গুটিপোকা স্বল্প সময়ের মধ্যে বড় বড় শালের পাতার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দেয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু ইহারা পত্র-ভক্ষণের ক্ষিপ্রতায় পূর্ব্বোল্লিখিত গুটিপোকার ভক্ষণক্ষিপ্রতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। ইহারা দেখিতে দেখিতে বড় বড় শালের পাতা নিঃশেষে খাইয়া ফেলে। অন্যান্য পোকারা যেরূপ নীরবে আহার করে, ইহারা তেমনটি করে না। পোকাগুলিকে আমরা শয়ন শয্যার কাছে রাখিতাম বলিয়া, গভীর রাত্রে

যখনই একটু সজাগ হইয়াছি তখনই কট্ কট্ শব্দ শুনিয়াছি। সেই ধ্বনি অল্প সময়ের জন্য নয়—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। মিস্ত্রী লৌহ পেটে স্ক্রুবোল্ট প্রবেশ করাইলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ। এই সঙ্গে বলিয়া রাখি ইহারা একটু নিদ্রাপ্রিয় বলিয়া দিনের অধিকাংশ সময়ে গাছের ডালে একেবারে গা মিশাইয়া ঘুমাইয়া থাকে। এই জন্যই রাত্রিকালে ইহাদের মুখটা একটু বেশী চলে।

গুটি।

ইহাদের গুটি নির্ম্মাণ কৌশল একটু নূতন। গুটি নির্ম্মাণের কিছু পূর্ব্ব হইতে এই শুঁয়ো অন্যান্য প্রজাপতিকীটের মত চুপ করিয়া নিস্পন্দভাবে থাকে। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া স্বীয় দেহের রোমগুলিকে ইহারা অভিনব প্রণালীর সাহায্যে দেহচ্যুত করিয়া মুখের লালার সাহায্যে একটি আবরণ নির্ম্মাণ করে। আবরণটির গড়ন মৃদঙ্গের সরু অংশের আকারের মত, অবশ্য অত বৃহৎ নয়। এই আবরণটি ডালের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংলগ্ন থাকে। পোকাটি এই আবরণের ভিতরে থাকিয়া একটি পুত্তলীতে পরিণত হয়। এই পুত্তলীর আকার বলিতে গেলে অবিকল মধুমালতীর গুটিপোকার মত। বলা বাহুল্য পূর্ব্বে যে আবরণটির কথা বলিলাম তাহা নিশ্ছিদ্র। বৃষ্টি ও অন্যান্য বিপদাপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্তই সুকৌশলে এই বহিরাবরণটি ভিতরের পুত্তলীটিকে রক্ষা করিবার জন্য নির্ম্মিত হয়।

প্রজাপতি।

উক্ত শুঁয়োপোকাটি প্রায় পনেরো দিন উক্ত পুত্তলীর মধ্যে থাকিয়া পূর্ণ অবয়বপ্রাপ্ত প্রজাপতি হইয়া পনেরো দিনের দিন আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। আপনারা বোধ করি সকলেই জানেন যে প্রজাপতির আবরণমধ্যস্থিত পুত্তলী হইতে এক প্রকার তরল আঠার মত পদার্থ বাহির হয়। এই তরল আঠাই বহিরাবরণকে সিক্ত করিয়া তাহাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং কোমল করিয়া দেয় বলিয়া প্রজাপতি অনায়াসেই তাহা ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে। এই প্রজাপতির পক্ষদ্বয় ও পৃষ্ঠদেশ লাল, মাথা শুভ্র, পেটের তল শাদা। ইহাদের গড়ন অনেকটা মধুমালতীর গুটিপোকার প্রজাপতির মত।

শ্রীসুধাকান্ত রায়।

পৌষ ১৮৩৪ শক। পৃ. ২২৯-২৩০

শান্তিনিকেতনের দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

মহর্ষিদেবের দীক্ষা দিন-উপলক্ষ্যে গত ৭ই পৌষের উৎসবে নানা স্থান হইতে অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। সুদূর ত্রিপুরা, ঢাকা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকে কেবল উৎসবে ও উপাসনায় যোগ দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৭ই পৌষের অতি প্রত্যূষে আশ্রম বালকদিগের মধুর বৈতালিক গীতে জাগরিত হইয়া

সকলেই মন্দিরের উপাসনায় যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আশ্রমবালকগণ রাত্রি থাকিতে উঠিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া লতাপুষ্পপত্রে মন্দির সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উৎসাহ ও সৌজন্যতা উৎসবকে আরো আনন্দময় করিয়াছিল। তারপর সেই দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্যস্থিত আশ্রম নবসূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইবামাত্র, আশ্রমবাসিগণ ও সমাগত অতিথিসকল মন্দিরে সমাগত হইয়াছিলেন। সাতটার সময় প্রাতের উপাসনা আরম্ভ হয়। পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করেন। আশ্রমবালকদিগের মধুর সঙ্গীতে উপাসনামন্দির পূর্ণ হইয়াছিল। উপাসনান্তে সমবেত ভক্তমণ্ডলী "কর তাঁর নাম গান" ইত্যাদি সঙ্গীত সমস্বরে গান করিতে করিতে সপ্তপর্ণী তরুতলে মহর্ষিদেবের বেদীর নিকট উপস্থিত হন, এবং বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া গান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরে পূর্ব্ববৎ মেলাস্থলে অনেক ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়াছিল। নানাপ্রকার দ্রব্যে সজ্জিত বিপণীশ্রেণীর দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল। চারি পাঁচ মাইল দূর হইতে বহু লোক উৎসব ও মেলা দেখিবার জন্য উপস্থিত ছিল। বেলা দুইটার সময় হইতে দর্শকের সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে, জনতা ভেদ করিয়া গমনাগমন অসাধ্য হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও সাধারণের মনোরঞ্জন জন্য মেলাস্থলে যাত্রা গীতাভিনয় হইয়াছিল। তা ছাড়া দেশীয় সার্কাস নানা প্রকার ক্রীড়াকৌশল প্রভৃতি 'আমোদ' দেখাইবার জন্য স্থানে স্থানে তাঁবু পড়িয়াছিল।

সন্ধ্যাগমে শত শত দীপে মন্দির আলোকিত হইলে সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন এবং আশ্রম বালকগণ সঙ্গীত করেন। উপাসনান্তে নানাপ্রকার আতস্‌বাজি পুড়াইয়া উৎসবের শেষ হয়।

এ বৎসরে বিদেশাগত অতিথির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় বিদ্যালয়ের কোনো কোনো গৃহে তাঁহাদিগকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। আশ্রম বালকগণ ইহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

আশ্রম-কথা।

৭ই পৌষের উৎসবে প্রভাতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন। সায়ংকালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

৮ই পৌষ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বার্ষিক উৎসব। এতদুপলক্ষ্যে ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও অধ্যাপক অনেকেই আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। ছাতিমতলায় উৎসব-সভা বসিয়াছিল। সভাস্থান ছাত্রগণ বিশেষ যত্নের সহিত সাজাইয়াছিলেন।

অধ্যাপকগণকে ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ পুষ্পচন্দনের দ্বারা বরণ করিয়া সভায় আসন

পরিগ্রহ করাইয়াছিলেন এবং সভাপতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়কে পাদ্য ও অর্ঘ্যের দ্বারা বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

প্রথমে একটি বেদগান হয়। তার পরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনা শেষ হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বাগ্রে বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ হয়। আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় কতকটা পাঠ করেন, তার পর অবশিষ্ট অংশ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করিয়াছিলেন।

কার্য্যবিবরণী পাঠ সমাপ্ত হইলে ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুজিতকুমার চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের সময়ের আশ্রমজীবনের স্মৃতি পাঠ করেন। সভায় যে সকল অতিথি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার জন্য সভাপতি মহাশয় অনুরোধ করিলে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন এবং আর একজন অতিথিও আশ্রমদর্শনে তাঁহার মনের আনন্দ সভার নিকটে জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি মহাশয় তারপরে আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার আদর্শ এবং তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। এই আদর্শ যাঁহার জীবন ও সাধনা হইতে প্রতিফলিত হইতেছে তাঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে শুধু এদেশে নয়, সকল দেশের পক্ষেই এ আদর্শের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া অন্যান্য দেশেও ইহার বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে। মানুষের জীবনের সকল দিকের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্যবিধান,—এ আদর্শ এ যুগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

সভাপতির বক্তব্য শেষ হইলে আশ্রমসঙ্গীত করিয়া সভাভঙ্গ হয়। সকলে আশ্রমসঙ্গীত করিতে করিতে আশ্রম পরিভ্রমণ করেন।

দ্বিপ্রহরে ছাত্রগণ ক্রীড়াপ্রদর্শন করে। সন্ধ্যার পর ভ্রমণে যাওয়া হয় এবং তৎপরে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণযোগে অধ্যাপক সরকার মহাশয় অজন্তা গুহার কতকগুলি চিত্র ছাত্রগণকে দেখান এবং সে সম্বন্ধে কিছু বলেন।

৯ই পৌষ প্রভাতে আশ্রমের পরলোকগত অধ্যাপক ও ছাত্রসকলকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিবার জন্য উপাসনা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বেদ হইতে শ্রাদ্ধসম্বন্ধে বিশেষ কতগুলি মন্ত্রাদি তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য ও পিতৃগণ, সকলকে স্মরণ করিয়া ও সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তৎপরে তিনি আশ্রমের পরলোকগত বন্ধুদিগকে স্মরণ করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে মৃত্যুসম্বন্ধে বৈদিক ঋষিদিগের কতকগুলি মন্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। জীবন ঈশ্বরের পিতৃরূপ এবং মৃত্যু তাঁহার মাতৃরূপ ; একটি কর্ম্মের মূর্ত্তি, প্রয়াসের মূর্ত্তি—অন্যটি বিশ্রামের মূর্ত্তি, শান্তির মূর্ত্তি ;—তাঁহারি অনন্ত প্রাণসমুদ্রের মধ্যে যে এই দুই রূপের নিরন্তর আবির্ভাব তিরোভাব ঘটিতেছে—জীবনে এবং মৃত্যুতে প্রাণের যে কোথাও ছেদ নাই—এইরূপ ভাবের অনেক আশ্চর্য্য মন্ত্র তিনি

সংগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধক্রিয়ার ভিতরকার তাৎপর্য্য আমাদের কাছে সুন্দররূপে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুসম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন ঋষিদের চিন্তা যে কিরূপ আশ্চর্য্য দ্বিধা ও ভয়শূন্য হইয়াছিল তাহাও আমাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন।

৯ই পৌষ রাত্রে ছাত্রগণ তাহাদের পরলোকগত বন্ধুদিগের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের শ্রদ্ধার স্মৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিল।

১০ই পৌষ প্রভাতে খৃষ্টোৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত চুনীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আমরা নিম্নে বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিলাম।

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী।

(১৩১৮-১৩১৯)

(৮ই পৌষে বার্ষিক সভায় আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক পঠিত)*

অদ্য আমাদের আশ্রম ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিল।

গত কল্য ৭ই পৌষ বিদ্যালয়ের যে আর একটি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, সেই বৎসরের জন্য বিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষের পদ আমাকে দেওয়া হইয়াছিল,—এই কারণে বিদ্যালয়ের গত দ্বাদশমাসব্যাপী জীবনের এক বৃত্তান্ত লিখিতে আমিই অনুরুদ্ধ হইয়াছি। স্থির মহাসমুদ্রে পাড়ি দেওয়া যেমন সহজ আমরাও সেই প্রকার সহজে পাড়ি জমাইয়াছি, ইহাতে কর্ণধারের মোটেই কৃতিত্ব নাই। তিনি তাঁর নিজের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটিতে বসিয়া কম্পাস্ দেখিয়াছেন এবং চার্ট মিলাইয়াছেন এবং এক একবার লিভারের ডাণ্ডাটিকে দুর্ব্বল হস্তে মোচড় দিয়াছেন মাত্র। যে সকল দক্ষ নাবিক শৈলময় পথগুলিকে এড়াইয়া এবং ঝটিকাসঙ্কুল প্রদেশ বর্জ্জন করিয়া জাহাজের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, কৃতিত্ব তাঁহাদেরি, এবং আরো কৃতিত্ব তাঁহাদের যাঁহারা কলে ইন্ধন জোগাইয়াছেন, কলটিকে সুব্যবস্থা রাখিয়াছেন, রশারশি শক্ত করিয়া কসিয়া ধরিয়া আছেন। সেই সকল সুদক্ষ নাবিকের অনেকেই আজ সভাস্থলে উপস্থিত, তাঁহারা বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক বিবরণ লেখার ভার গ্রহণ না করিয়া এই অক্ষম কুণো

* গত কার্ত্তিক মাসের পত্রিকার "আশ্রম সংবাদে" ছাত্রগণ আশ্রমসম্মিলনী, গ্রাম্যবিদ্যালয়, সেবাভাণ্ডার, ক্রীড়াবিভাগ, সাহিত্যসভা ও হস্তলিখিত পত্রিকা পরিচালনা প্রভৃতি অনেকগুলি অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়াছে। সেইগুলির কথা তাই এই কার্য্যবিবরণী হইতে বাদ পড়িল। পত্রিকা পাঠকগণ কার্ত্তিক মাসের সেই আশ্রমসংবাদ এই কার্য্যবিবরণীর সহিত জুড়িয়া পড়িলেই সকল সংবাদ একসঙ্গেই জানিতে পারিবেন।

সহঃ সম্পাদক।

লোকটির ঘাড়ে সেই ভার চাপাইলে সে যেমন তাহার ভগ্ন চক্রের প্রত্যেক আবর্ত্তনেই আর্ত্তস্বরে বেদনা জানায়, আমার এই প্রতিবেদন পাছে সেই প্রকার আর্ত্তস্বরে পরিণত হয় এই আশঙ্কা হইতেছে। ভাঙাচাকার কচ্‌কচানিতে বাঁশির সুরের আশা কেহ না করেন।

বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ আজকাল দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানেরই একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে এই কার্য্যটিকে একবারে বাহুল্য বলা যায় না। এক বৎসর কালে আমরা লক্ষ্যের দিকে কত দূর অগ্রসর হইয়াছি, পিছনে তাকাইয়া দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। যাত্রিগণ যখন দূর তীর্থ দর্শনে গমন করেন তখন মন্দিরের চূড়া দেখা না দেখা লইয়া পথের হিসাব করেন, কত দিনে কতগুলি সরাই কত দুর্গম নদনদী অতিক্রম করা হইল, তাহা লইয়াই হিসাবে বসেন। তা ছাড়া কত কাজ আমাদের অসমাপ্ত আছে তাহাও আমরা এই প্রকার আলোচনা হইতে বুঝিয়া লইতে পারি। এই বুঝাপড়াটাও নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নয়।

গত বৎসরের কথা আলোচনা আরম্ভ করিলেই আশ্রমের প্রধান অবলম্বন পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুপস্থিতির কথা প্রথমে মনে পড়িয়া যায়। আশ্রমের প্রতিষ্ঠার পর এত দীর্ঘকালের জন্য তিনি কখনই অনুপস্থিত ছিলেন না। তাই আশ্রমের কার্য্যের মধ্যে প্রতিদিনই তাঁহার অভাব আমরা তীব্ররূপে অনুভব করিয়াছি, তাঁহার অনুপস্থিতিতে উৎসবগুলিও আমাদিগকে পূর্ণানন্দ দিতে পারে নাই ; আজ এই উৎসব-বাসরের শুভ প্রত্যুষে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার কথা মনে পড়িতেছে। যেখানে বহু লোক লইয়া কাজ সেখানে কখনো কখনো মতদ্বৈধ এবং ছোটখাটো তর্কদ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি এই গুলির জ্বালা প্রশমিত করিয়াছে। গত বৎসরে আমরা যে, সে প্রকার অবস্থায় পড়ি নাই এ কথা বলা যায় না। তিনি বিদেশ গমনকালে আমাদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিয়া সকল সঙ্কট হইতে জগদীশ্বরের কৃপায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য আমাদের যে বেদনা তাহা তাঁহার উপস্থিতি ব্যতীত আর কিছুতেই দূর করিতে পারিবে না। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-প্রণালী চাক্ষুষ দেখিয়া আসা, এবং তাহার মধ্যে যাহা ভাল ও আমাদের দেশের উপযোগী তদনুসারে কোন নূতন ও উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতি দাঁড় করানো, তাঁহার বিদেশযাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য। আশ্রমের কল্যাণ কামনা করিতে করিতেই তিনি যাত্রা সুরু করিয়াছেন, এবং অতি দূরে থাকিয়া তিনি কেবল আশ্রমের কথাই ভাবিতেছেন। এই কথাগুলি যখন আমরা মনে করি তখন তাঁহার অনুপস্থিতিজনিত বেদনা অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসে। প্রতি সপ্তাহেই তিনি আমাদিগকে যে নানা উপদেশ দিয়া পত্র লিখিতেছেন, সেগুলি আমাদিগকে নূতন শক্তি দান করিতেছে। জলপথে, স্থলপথে এবং হোটেলে বসিয়া নানা ব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়া তিনি এক সপ্তাহও পত্র লিখিতে বিরত হন নাই।

যে দিন বিদেশের চিঠিপত্র আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হয়, সে দিন আমাদের পরম আনন্দের দিন। ছাত্র ও অধ্যাপকগণ তাঁহার আশীর্ব্বাদযুক্ত পত্রের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, কোন সপ্তাহেই নিরাশ হন না। তিনি সুস্থ হইয়া নূতন বল সঞ্চয় করিয়া, আমাদের মধ্যে শীঘ্র ফিরিয়া আসুন, জগদীশ্বরের নিকট আমাদের আজ এই প্রার্থনা এবং আমাদের উপরে তিনি যে গুরুভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সেই ভার বহন করিবার জন্য ভগবান আমাদিগকে শক্তি প্রদান করুন ইহাও আমাদের একান্ত প্রার্থনা। রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শকে এই আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেইটি আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া দিনে দিনে যেন ফুটিয়া উঠে, আমরা সকলে যেন পথভ্রান্ত না হইয়া সেই আদর্শ ও লক্ষ্যের দিকে যেন ক্রমেই অগ্রসর হইতে পারি।

উৎসবে বাঁশির রবে যখন চতুর্দ্দিক মুখরিত, তখন হঠাৎ শোকের করুণ ক্রন্দনরোলে সকল আনন্দ কোলাহল থামিয়া গেল, এ প্রকার ঘটনা সংসারে দুর্লভ নয়। আনন্দের মাঝে এই প্রকার নিরানন্দকে আনিয়া ভগবান সৃষ্টির কোন্ মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করেন জানি না। মৃত্যুর কালিমা স্পর্শ করে নাই এ প্রকার পরিবার প্রকৃতই দুর্লভ। গত বৎসরে দুইবার আমাদের এই বৃহৎ আশ্রমপরিবার মৃত্যুর স্পর্শে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম আশ্রমবালক সুহৃদকুমার সেনের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু। পিতৃ-মাতৃগৃহের এবং আশ্রমের এই আনন্দ-দীপখানি যে এই প্রকারে অকালে নির্ব্বাপিত হইবে একথা আমরা মনেই করিতে পারি নাই। তাহার হাস্যোজ্জ্বল সরলতা-মাখানো মুখখানি এখনো আমাদের মনে জাগিতেছে। তাহার মৃত্যুতে আমাদের ও তাহার আশ্রমভ্রাতৃবৃন্দের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহার বেদনা মুছিয়া যাইবার নয়। তাহার ন্যায় পবিত্র হৃদয় উৎসাহশীল অচঞ্চল প্রিয়দর্শন বালকের মৃত্যু আমাদের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক বলিয়াই মনে হইতেছে। দ্বিতীয়, প্রবীণকুমারের মৃত্যু। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে আশ্রমের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল না। সে যখন আশ্রম ত্যাগ করিয়া যায়, তখন আমরা কখনই মনে করিতে পারি নাই যৌবনের প্রারম্ভে সে মাতাপিতাকে কাঁদাইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। আমাদের সহিত সে দেড়বৎসর কাল বাস করিয়া গিয়াছে, কাজেই তাহার অকাল মৃত্যুও আমাদিগকে যথেষ্ট আঘাত দিয়াছে। বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই একত্র বাস একত্র আহার এবং একত্র পাঠ ও ক্রীড়া অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে যেমন ভক্তি ও স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়াছে, ছাত্রদের পরস্পরের হৃদয়ও সেই প্রকার এক অপূর্ব্ব বন্ধুতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। আশ্রমবালকগণ পরস্পরকে সহোদরের ন্যায়ই দেখে। সুহৃদকুমারের মৃত্যুর পর সমস্ত আশ্রমবালকদিগকে যে প্রকার বিহ্বল হইতে দেখিয়াছি, তাহা কেবল পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেই সাধারণতঃ দেখা যায়। বহুকাল হইল আশ্রমবালক যোগরঞ্জন গুহঠাকুরতা এবং সরোজচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হইয়াছে। এই আশ্রমেই তাহাদের মৃত্যু হয়। আশ্রমভ্রাতৃগণ এই দুই লোকান্তরিত বালকের স্মৃতি রক্ষার জন্য আশ্রমের অদূরে

শ্মশানক্ষেত্রে প্রত্যেকের উদ্দেশে যে দুইটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা হইতে ইহাদের বন্ধুতা যে কত দৃঢ় অনুমান করা যায়। অপরাহ্নে অধ্যয়ন শেষ করিয়া খেলাধূলা ফেলিয়া তাহারা সেই শ্মশানক্ষেত্রে ছুটিয়াছে, নিজেরা চূণ সুরকি প্রস্তুত করিয়া নিজেদের হাতে ধীরে ধীরে সেই স্তম্ভ দুটিকে গড়িয়াছে। কত দিন দেখিয়াছি, দিবসের কঠোর শ্রমের পর তাহারা জ্যোৎস্না রাত্রিতে সেই স্তম্ভদ্বয় গাঁথিতেছে। যে সকল ছাত্র এই পরলোকগত আশ্রমবালকদিগের সহিত একত্র ছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই একে একে আশ্রমের শিক্ষা শেষ করিয়া অন্যত্র যাইবেন, এবং যে সকল অধ্যাপক তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাহারাও হয় ত দীর্ঘকাল পরে আশ্রমে থাকিবেন না,—তখন আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্তম্ভ যুগল, ঐ পরলোকগত আশ্রমবালকদ্বয়ের স্মৃতি রক্ষা করিতে থাকিবে। প্রতি বৎসরেই পরলোকগত আশ্রমভ্রাতৃগণের শ্রাদ্ধবাসরে বালকগণ যে হবিষ্যান্ন আহার করে এবং দীনদরিদ্রগণকে ভোজন করায়, তাহা হইতেও আশ্রমবাসীদিগের পরস্পরের হৃদয়ের যোগ বুঝিতে পারা যায়।

অধ্যাপক পরিবর্ত্তন

গত বৎসর সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় মহাশয়, এবং গণিত ও বাংলা ইত্যাদির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরালাল সেন ও তেজেশচন্দ্র সেন, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কালীমোহন ঘোষ মহাশয়গণ নানা অনিবার্য্য কারণে নানাসময়ে আশ্রম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বহুশাস্ত্রবিদ্ সুপণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের অভাব সহজে পূরণ হইবার নয়। নানা পারিবারিক সঙ্কটে পড়িয়া অনিচ্ছায় তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ নিষ্ঠা, জ্ঞানপিপাসা এবং নিরভিমান ও সরল হৃদয়খানি আশ্রমবাসী অধ্যাপক ও ছাত্র সকলেরি সুদৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিল। কিন্তু আশ্রমের সহিত তাঁহার যোগ একবারে ছিন্ন হয় নাই, আমাদের প্রবাসী ছাত্রেরা অনেক সময়ই তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারে, তিনি একটু অবসর পাইলেই আশ্রমে ছুটিয়া আসেন। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত আশ্রমের সম্বন্ধ প্রায় ৭ বৎসরের। তিনি আমেরিকার বিজ্ঞান-শিক্ষা করিতে গিয়াছেন,—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি কৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। তাহাকে যে আমরা একবারে হারাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। হয়ত এই আশ্রমেরই এক কোণে তাহাকে আবার আসন পাতিতে দেখিব। শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেনও শিক্ষাব্যাপদেশে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের শিশু আশ্রমবাসীদের পরম বন্ধু এই অধ্যাপকটিকেও আমরা একবারে হারাই নাই। এমন দিন হয়ত আসিবে যখন আমাদের আশ্রমজননীর এই "আকাশ জোড়া" কোলে তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় আশ্রমের মঙ্গল কামনা করিয়াই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এখন ইংলণ্ডে London Universityতে শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

শিক্ষাদান-পদ্ধতি বিশেষভাবে শিক্ষা করিয়া পরে এই আশ্রমের কার্য্যে যোগদান করেন ইহাই তাঁহার বিদেশ গমনের সংকল্প। সুতরাং তাহার আশ্রমত্যাগের জন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই। এই সকল অধ্যাপকদিগের স্থানে আমরা শ্রীযুক্ত সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়, অনঙ্গমোহন রায় এবং কিশোরী মোহন জোয়াদ্দার, সুধাকান্ত রায় রমনীরঞ্জন রায় মহাশয়গণকে পাইয়াছি। এক গণিতের অধ্যাপকের পদ আজও শূন্য আছে, শীঘ্রই একজন উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আশ্রমের দীর্ঘকাল যোগ ছিল। অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অধ্যাপনাকার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল এবং আশ্রমবালকদিগকে সঙ্গীত শিক্ষাদানে তাঁহার যে সাহায্য পাওয়া যাইত, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া আশ্রম ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র রায় মহাশয় দীর্ঘকাল আশ্রমের পীড়িতদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি গত বৎসরে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতায় তিনি এখন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। ভবিষ্যতে এই আশ্রমকেই আরো ভাল করিয়া সেবা করিতে পারেন, সেই সংকল্প লইয়াই তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন।

ছাত্রদের কথা

আশ্রমে বাংলাদেশ ছাড়া বোম্বাই, বর্ম্মা, নেপাল ও উড়িষ্যারও বালক আছে। এখন ত্রিপুরা জিলার বালকের সংখ্যাই অধিক। গত বৎসর কেবল এই জিলা হইতেই ৪৩ জন বালক আসিয়াছে। নিম্নে আমরা জিলা হিসাবে একটি তালিকা দিলাম।

এই সকল বালকের মধ্যে, ২১ জন বালক আশ্রমের ব্যয়ভার বহন করিতে একেবারে অক্ষম। অবশিষ্টের মধ্যেও সকলে পূর্ণ বেতন ১৮ টাকা দিতে অসমর্থ বলিয়া—

২৮ জন	১৫ টাকা	হিসাবে
৭ ”	১৩ ”	”
২ ”	১০ ”	”
৫ ”	১২ ”	”
১ ”	৪ ”	”
১ ”	৫ ”	”

বেতন দিয়াছে।

ছাত্র পরিচালনের সুবিধার জন্য বয়স ও পাঠোন্নতি হিসাবে আদ্য, মধ্য ও শিশু এই তিন বিভাগে সমুদয় বালকদিগকে বিভক্ত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় আদ্যবিভাগের, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যবিভাগের এবং শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন ও সুধাকান্তরায় মহাশয় শিশুবিভাগের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন।

গত বৎসর এই সময়ে বালকের সংখ্যা ১৭৭ ছিল, এখন ১৮৬ জন। তা ছাড়া বহু নূতন বালক প্রবেশপ্রার্থী রহিয়াছেন। এবারে ছাত্রসংখ্যা দুই শতকের অধিক হইয়া যাইবে।

ত্রিপুরা	৪৩
ঢাকা	৩২
ময়মনসিংহ	১২
শ্রীহট্ট	১৬
ফরিদপুর	৭
বরিশাল	৯
চট্টগ্রাম	৯
পাবনা	১০
রাজসাহী	৫
রংপুর	২
দিনাজপুর	১
ভাগলপুর	৫
পূর্ণিয়া	২
দারজিলিং	৪
মালদহ	২
মুঙ্গের	১
যশোহর	৫
খুলনা	৫
কলিকাতা	৪২
নদীয়া	৬
মুরসিদাবাদ	৫
হাওড়া	১
হুগলি	৬
বর্দ্ধমান	৩
মানভূম	১
বাঁকুড়া	২
বীরভূম	৩
হাজারিবাগ	৩
মেদিনীপুর	১
উড়িষ্যা	৩

আসাম	১
ব্রহ্মদেশ	৩
বোম্বাই	৩
রাজপুতনা	৩
পঞ্জাব	১

সাধারণ শিক্ষা

ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত, ভূগোল ও গণিত ব্যতীত আশ্রমে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষা সকল ছাত্রকেই দেওয়া হয়। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের সাধারণ সূত্রগুলি বুঝিয়া যাহাতে প্রতিদিনের নানা প্রাকৃতিক কার্য্যের কারণ আপনা হইতেই বালক ধরিতে পারে তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ (Nature Study) দ্বারা বালকদের সূক্ষ্ম দর্শন ক্ষমতা এবং অনুসন্ধিৎসা যে প্রকার জাগিয়া উঠে এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। আমরা এই বিষয়ে পূর্ব্বে অধিক দৃষ্টি দিতে পারি নাই। গত বৎসরে প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণের কাজ আরম্ভ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। আমাদের চারিদিকে যে সকল গাছপালা রহিয়াছে বালকগণ তাহাদের নানা পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আনন্দ পাইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভও করিয়াছে। ইহারা কেবল পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা অনেক কীটপতঙ্গ ও গুটিপোকার জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বৎসরে কত ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে এবং প্রতিদিন কি প্রকারে আমাদের চতুর্দ্দিকের বায়ুর উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, বারিমান (Rain Gauge) এবং উষ্ণতামান যন্ত্র দিয়া ছাত্রগণ পরিমাণ করিতেছে এবং তাহা লিপিবদ্ধ রাখিতেছে। তা ছাড়া বয়স্ক ছাত্রদিগকে রাত্রিতে একটু জ্যোতিষের শিক্ষা দেওয়াও হইয়াছে, এবং দূরবীণ দিয়া বৃহৎ গ্রহগুলির সহিত তাহাদের পরিচয় স্থাপন করানো হইয়াছে। বয়স্ক ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন রাশিচক্রগুলিকে এবং বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রগুলিকে চিনিয়া লইয়াছে।

ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা

আশ্রমগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় ও ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আশ্রমবালকগণকে ধর্ম্ম ও নীতিসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, কালিদাস বসু, নগেন্দ্রনাথ আইচ ও অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অধ্যাপকগণও এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। প্রতি সপ্তাহেই দুই দিন প্রত্যূষে আশ্রমবালকগণ মন্দিরে সমবেত হইয়াছে। এই দুই দিনের একদিন বয়স্ক ছাত্রদের উপযোগী করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, অপর দিন শিশুদের লইয়া মন্দিরের কার্য্য চলিয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিনই প্রাতে ও সন্ধ্যায় বালকগণ পৃথক

পৃথক বসিয়া উপাসনা করিয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের দৈনিক উপাসনার শেষে আশ্রম বালকগণ একত্র হইয়া উপনিষদের স্তোত্রপাঠ করিয়া অধ্যয়নাদি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

আশ্রমবাসী বালক ও অধ্যাপকগণ যাহাতে স্বদেশ-বিদেশের সাধু মহাত্মাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারেন তাহার যে ব্যবস্থা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর ছিল, গত বৎসরও তদনুসারে কার্য্য চলিয়াছে। বিশেষ বিশেষ স্মরণীয় দিনে ঈশা, মহম্মদ, গৌতমবুদ্ধ, কবীর, চৈতন্য, নানক, রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা হইয়াছে, এবং ইহাতে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যোগদান করিয়াছেন। মন্দিরেও এই উপলক্ষ্যে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

সঙ্গীত শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা

সাধারণতঃ সন্ধ্যা বা রাত্রিতে আশ্রম বালকগণ পাঠ করে না। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ প্রয়োজন অনুসারে রাত্রিতে পাঠ করিতে পারে। এজন্য সান্ধ্য উপাসনার পর হইতে রাত্রির ভোজনকাল পর্য্যন্ত সময়টাকে বিনোদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় কতকগুলি বালককে লইয়া সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, নগেন্দ্রনাথ আইচ, নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় প্রভৃতি মনোরঞ্জক অথচ শিক্ষাপ্রদ গল্প বলিয়া বালকদিগকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। কোনো কোনো দিন এই সময়ে কতকগুলি ছাত্রকে লইয়া আকাশের নক্ষত্রগুলির সহিত তাহাদের পরিচয় স্থাপন করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতিদিন রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে এবং অতি প্রত্যুষে উত্থানের পূর্ব্বে একদল গায়ক ছাত্র বৈতালিক গীত গান করিয়া আশ্রম পরিভ্রমণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া ছাত্র ও অধ্যাপকগণ মিলিয়া গত গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটির পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রানী" এবং "শারদোৎসব" নাটকের অভিনয় করিয়াছেন। ইহার জন্য যে আয়োজন তাহা বিনোদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়েই সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ঘরের ছাত্রগণ গতবৎসরে মাঝে মাঝে নিজেদের ঘরগুলিকে সাজাইয়া যে সকল আবৃত্তি এবং ক্ষুদ্র নাটকের অভিনয় করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

পুস্তকাগার ও ল্যাবরেটরি

আশ্রমবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তক যথেষ্ট না থাকিলেও সর্ব্ববিধ পুস্তক আছে। প্রতি বৎসর কিছু কিছু নূতন পুস্তক গ্রন্থাগারের শোভা ও সম্মানবর্দ্ধন করিয়া থাকে। পুস্তকাগারের দুইটি অংশ আছে। একটিতে ইংরাজী ও বাংলা পুস্তক অপরটিতে প্রাচ্য ভাষার গ্রন্থাদি আছে।

সাধারণ বিভাগটিতে ইংরাজী-সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রকারের প্রায় তিন সহস্র পুস্তক আছে। তন্মধ্যে :—

১।	ইংরাজী সাহিত্য	৭৯০
২।	শিক্ষাবিজ্ঞান	৬৩
৩।	ইতিহাস প্রাচীন, বর্ত্তমান ভারতীয় প্রভৃতি	৩৬৫
৪।	বিজ্ঞান	১০০
৫।	দর্শন	২১৭
৬।	গণিত	৯৪
৭।	ভূগোল ও ভ্রমণ-সম্বন্ধীয়	১০৩
৮।	অভিধান প্রভৃতি	১২৫
৯।	পাঠ্য পুস্তক	২০০
১০।	নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের Reports	২৫
১১।	অন্যান্য পুস্তক ও মাসিক পত্র	১০০
১২।	বাংলা—	৬০০
	পত্রিকা।	১৩০

আশ্রম-গ্রন্থাগারে কয়েকখানি মহামূল্য গ্রন্থ আছে। মহর্ষিদেব অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া স্বয়ং দাগ দিয়া রাখিতেন—সেরূপ পুস্তক দুই একখানি থাকায় এই গ্রন্থাগারের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্র বাবু, আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে নোট করা পুস্তক অনেক আছে।

এখানকার প্রাচ্য গ্রন্থালয়ে সংস্কৃত, পালি, পার্সি, তিব্বতীয় এবং হিন্দী ভাষায় লিখিত পুস্তক আছে।

সংস্কৃত	৫০০
পালি গ্রন্থ ও অনুবাদ—প্রায়	১০০
এসিয়াটিক ও রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা	১৪০
পার্সি গ্রন্থ—প্রায়	৫০
তিব্বতীয়	৫
হিন্দী—প্রায়	৩১

ভারতীয় নানা ভাষার প্রায় ১০০০ পুস্তকও এই গ্রন্থালয়ে আছে। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য আশ্রম-গ্রন্থালয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আশ্রমে একটি ক্ষুদ্র বীক্ষণাগার (Laboratory) আছে। তাহাতে যে জিনিষপত্র আছে তাহার দ্বারা সামান্য সামান্য পরীক্ষা চলে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা শিক্ষার

যৎকিঞ্চিৎ সারঞ্জাম আছে। তাহা ছাড়া একটি দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্র ও (Spectroscope) আছে।

জলবায়ু মেঘ প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণের কোনো প্রকার যন্ত্র নাই বলিলেই চলে, যে সামান্য তাপমান যন্ত্র আছে তাহার দ্বারাই বালকগণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। কিন্তু তাহা দ্বারা ফল ঠিক পাওয়া যায় না এবং পর্য্যবেক্ষকগণ আনন্দলাভ করে না। সেই অভাবগুলি মোচন হইলে যে পর্য্যবেক্ষণের ফল খুবই চমৎকার হইবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

পূর্ত্ত বিভাগ

গত বৎসর আশ্রমবালকগণ আশ্রমের পরিচ্ছন্নতাবিধান এবং পূর্ত্ত কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল। সরকারী রাস্তা হইতে আশ্রমের ভিতর প্রবেশ করিবার যে প্রশস্ত পথটি আছে তাহা আশ্রম বালকগণেরই প্রস্তুত। সেই রাস্তার সংস্কার বালকগণই করিয়া থাকে। গত বৎসর গর্ত্ত ভরাইয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া বাগান তৈয়ারী করিয়া তাহারা আশ্রমের সৌন্দর্য্য অনেক বৃদ্ধি করিয়াছে। এই পূর্ত্ত বিভাগের ভার বঙ্কিমবাবু ও সত্যজ্ঞানবাবু গ্রহণ করিয়া সুন্দররূপে কার্য্য চালাইয়াছেন।

বনভোজন ও ভ্রমণ

মাঝে মাঝে ছুটির দিনে আশ্রমবালকগণ যাহাতে বনভোজন করিয়া আনন্দ পাইতে পারে এবং নিকটবর্ত্তী দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া শুনিয়া আসিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা আছে। গত বৎসরে কবি চণ্ডীদাসের বাসস্থান নান্নুর প্রভৃতি গ্রাম কতকগুলি বালক দেখিয়া আসিয়াছে, এবং নিকটবর্ত্তী নদী ও গ্রামগুলিতে দলে দলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছে।

আশ্রমের রুগ্নাবাস

পীড়িত আশ্রমবাসী বালক ও অধ্যাপকদিগের চিকিৎসাদির সুব্যবস্থার জন্য আশ্রমেই একটি রুগ্নাবাস আছে। আশ্রম-বৈদ্য শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বর্দ্ধন মহাশয়দ্বয় রুগ্নাবাসের কার্য্য চালাইয়াছেন। পীড়িতদের শুশ্রূষা ও সেবার জন্য তিনটি ভৃত্যও ছিল। এখন দশ জন রোগীকে অনায়াসে রুগ্নাবাসে স্থান দেওয়া যায়, কিন্তু আশ্রম যে প্রকারে প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে এই স্থান যথেষ্ট নয়। আশ্রম-বৈদ্য ও তাঁহার সহকারী মহাশয় সর্ব্বদা রোগীদের নিকট থাকিয়াছেন এবং রাত্রিতেও রোগীদের মধ্যে শয়ন করিয়াছেন। সাধারণতঃ এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করা হইয়াছে, আবশ্যকমত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলিয়াছে। উভয় চিকিৎসার উপযোগী ঔষধাদি ঔষধালয়ে সংগৃহীত থাকে।

পূর্ব্বোক্ত আশ্রম-বৈদ্য এবং তাঁহার সহকারী ছাড়া বোলপুরের আসিষ্টান্ সার্জ্জনও

আশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। প্রয়োজন হইলে তিনিও আসিয়া আশ্রম বালকদিগের চিকিৎসাদি করিয়াছেন।

আশ্রমের ঔষধালয় হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগকে ঔষধ বিতরণ করিবার রীতি আছে। গত বৎসর ভুবনডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামবাসী অনেক দরিদ্র আশ্রম হইতে ঔষধ পথ্য পাইয়াছে এবং আশ্রম-বৈদ্য মহাশয় পীড়িতদিগকে দেখিয়া আসিয়া চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদের সহিত যোগরক্ষার ইহা পরম সহায় হইয়াছে।

গোষ্ঠ

আশ্রমসংলগ্ন গোষ্ঠই গত বৎসরে আশ্রমের দুগ্ধ জোগাইয়াছে। ছুটির সময়ে বালক ও অধ্যাপকগণ আশ্রমে থাকেন না। সেই সময়ের দুগ্ধ হইতে ঘৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ছুটির পর এই ঘৃতও কিছুদিন ব্যবহারে লাগিয়াছে। সময় বিশেষে গোষ্ঠ হইতে প্রতিদিন আমরা দুই মণ হইতে কখন কখন তিন মণ পর্য্যন্ত দুগ্ধ পাইয়াছি। গোষ্ঠচালনার ভার শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের উপর ছিল এবং শ্রীযুক্ত হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সহকারী ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই আশ্রমের পুরাতন ছাত্র। শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র আশ্রমের শিক্ষা সমাপন করিয়া আমেরিকায় তিন বৎসর গো-পালন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আশ্রমের কার্য্যে যোগ দিয়াছেন।

সেবা-ভাণ্ডার

বহুবৎসর যাবৎ এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের সহিত একটি সেবাভাণ্ডারের কার্য্য চলিতেছে। দরিদ্র বিদ্যার্থীদিগকে এবং অসহায় ও বিপন্ন অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ ও রুগ্নাদিগকে এই ভাণ্ডার কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকে। ছাত্র ও অধ্যাপকগণ ভাণ্ডারের পরিচালকদের নিকট ছিন্নবস্ত্র ও অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ আগন্তুক দরিদ্রেরা ছিন্নবস্ত্র, চাউল ও প্রয়োজনানুসারে সামান্য অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। ছাত্রদের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত পাঁচটি বালক এই ভাণ্ডারের মাসিক ও সাময়িক দান সংগ্রহ করিয়া থাকে। ছাত্রগণ দ্বিপ্রহরের আহারের পর ভুক্তাবশেষ অন্নব্যঞ্জন উপস্থিত কাঙ্গালদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়া থাকে। সংপ্রতি এই ভাণ্ডার হইতে দুইটি দরিদ্র বিদ্যার্থী মাসিক মোট সাড়ে ৪ টাকা অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। আশ্রমের দরিদ্র সেবকগণও বিপদের সময়ে এই ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইয়া থাকে। সন ১৯১৩ সনের ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত এই ভাণ্ডারে মাসিক ও সাময়িক দান হইতে ১০৬/১৫ আয় এবং ৭৮/৫ ব্যয় হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যেপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় একযোগে এই ভাণ্ডারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

এই সেবাভাণ্ডার এবং গ্রাম্য বিদ্যালয়, পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদের সহিত আশ্রমবাসীর

সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ়তর করিয়াছে। মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন উপলক্ষ্যে ৭ই পৌষের মেলাও এইপ্রকারে আমাদিগকে পার্শ্বস্থ ভদ্র ও ইতর সকল শ্রেণীর লোকের সহিত পরিচিত করিয়াছে।

বিশিষ্ট-অতিথি

গত বৎসরে বালকদিগের অভিভাবক ব্যতীত কয়েকজন বিশিষ্ট-অতিথিকে আমরা কয়েকদিনের জন্য পাইয়াছি। নিউইয়র্কের সুপ্রসিদ্ধ Advocate Myren Phelps. মহাশয় এবং দিল্লির অধ্যাপক W. W. Pearson আশ্রম দেখিবার জন্য কয়েকদিন এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাছাড়া বীরভূম জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট, সিবিল সার্জ্জন এবং বাংলার ডেপুটি স্যানিটারি কমিশনার সাহেবও আশ্রম দেখিয়া গিয়াছেন।

অভিভাবকগণের সহিত যোগরক্ষা

এই আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভিভাবকগণের সহিত যোগরক্ষা করিয়াছে। অভিভাবকগণও এখানে প্রায় আসিয়াছেন ও আমাদের ত্রুটি প্রদর্শন করাইয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের প্রদর্শিত ত্রুটির যথাসাধ্য সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা সেই আশ্রমহিতাকাঙ্ক্ষিগণকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

আদিসমাজের সহিত আশ্রমের যোগ

গত বৎসরে আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় এবং ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় প্রত্যেকে মাসে একবার করিয়া কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় কার্য্য করিয়াছেন এবং পুরাতন ছাত্র অধ্যাপক ও আশ্রম সুহৃদ্‌গণ কলিকাতায় যে আশ্রমিক-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহারও সাপ্তাহিক অধিবেশনে ইঁহারা যোগ দিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও একাধিকবার সঙ্ঘের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন।

মাঘ ১৮৩৪ শক। পৃ. ২৪৩-২৫০

প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ।

কেঁধগাছের শুঁয়োপোকা ও তাহার প্রজাপতি।

আমাদের আশ্রমের মধ্যে এবং বাহিরে অবারিত প্রান্তরে অনেক জাতীয় উদ্ভিদ আছে। ঐ সকল গাছের পাতায় অনেক রকমের পোকামাকড় পাওয়া যায়। আমরা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া আশ্রমের ভিতরের এবং বাহিরের প্রান্তরের ঘাসে, গাছে, লতায় যে সকল কীট থাকে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি

পোকার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পাঠকদের কাছে উপস্থিত করিয়াছি। আজ আর একটি কীট সম্বন্ধে আমাদের পর্য্যবেক্ষণের যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

(পোকা)

আমরা কেঁধ গাছে শুঁয়োপোকা জাতীয় এক প্রকার কীট পাইয়াছি। এ অঞ্চলের অনেক লোককে উক্ত পোকার নাম জিজ্ঞাসা করায় কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া অগত্যা যে গাছে তাহাকে পাইয়াছি সেই গাছের নামানুসারেই উহার নামকরণ করিলাম।

কেঁধ গাছের শুঁয়োপোকাকে দূর হইতে দেখিলে দেখা যায় যেন একটি ছোট মাকড়সার জাল পাতার গায়ে সংলগ্ন রহিয়াছে। নিকটে গেলে সে ভ্রম দূর হয়। তবে যতদূর বোধ হয় এই ভ্রম মানুষের পক্ষেই ক্ষণস্থায়ী। পাখী প্রভৃতি জীব যাহারা উহাদের শত্রু, তাহাদের এ ভ্রম দূর হয় না —দূর হইলে পোকাগুলির পক্ষে আমাদের নিকট পরিচিত হইবার এমন শুভ সুযোগ কখনই ঘটিত না। পাখী প্রভৃতি জীবের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই জাতীয় কীটগণ যে বর্ণানুকরণ করে একথা অবশ্যই সকলে জানেন। পাখী প্রভৃতি জীবই যে কেবল ইহাদের গ্রাস করে তাহা নহে। একবার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পোকার একটি প্রজাপতিকে গ্লাস কেসের কোন বিশেষ থাকে রাখিয়া দেই। একদিন বৈকালে প্রান্তরে বেড়াইতে যাইয়া ঘাসের মধ্যে এক নূতন ধরণের ফড়িং দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরি। পরে ভ্রমক্রমে হউক অথবা স্বেচ্ছায় হউক উহাকে ঐ প্রজাপতির থাকেই আটকাইয়া রাখিয়া দিলাম। বন্দীশালা হইতে মুক্তিলাভের জন্য ফড়িং মহাশয়ের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু গ্লাসকেশ-অধিকারী তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, বরং আরো ঔৎসুক্যের সহিত ফড়িং-এর বাহির হইবার চেষ্টাকে দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ফড়িংটি বাহির হওয়ার আশা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে প্রজাপতির নিকট যাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। যেমনি ধরা অমনি ভক্ষণক্রিয়া আরম্ভ করিল। অগত্যা ফড়িংটিকে প্রজাপতির কেশে রাখা একেবারেই নিরাপদ নয় বিবেচনায় উহাকে ভিন্ন স্থানে রাখা হয়। ফড়িং-এর এই কার্য্য যে ক্রোধের উত্তেজনায় হইয়াছিল এ কথা যেন কেহ না ভাবেন। কারণ তাহার পরেও বাহিরে আনিয়া ফড়িংকে অনেকবার প্রজাপতি খাইতে দেখিয়াছি। সুতরাং বুঝা গেল প্রজাপতি কীটের সব সময়ই প্রাণসংশয়। কীট হইতে পতঙ্গ জীবন লাভ করিয়াও মরণের আশঙ্কা ঘোচে না। দুঃখের বিষয় ফড়িংদিগকেও আবার এইরূপ শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়। তাহারাও বর্ণানুকরণে বেশ মজবুত।

আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এই কয়েক মাসেই এই পোকার সংখ্যা অধিক হয়, এই সময় ইহাদের মধ্যে যে শ্রেণী ঈষৎ বৃহৎ তাহারা আমগাছে আশ্রয়

গ্রহণ করে। আজকাল ইহাদের অত বেশী দেখা যায় না। ইহারা যে গাছে থাকে সেই গাছের পাতা খাইয়াই জীবন ধারণ করে। মস্তক বাদে ইহাদের শরীরের অন্যান্য অংশ মোট দশ খণ্ড মাংস দ্বারা গঠিত। ঐ দশ খণ্ড মাংসের প্রত্যেক খণ্ডের উপরে একটি করিয়া দশটি বেগুনি বর্ণের গোল বিন্দু আছে। ঐ বিন্দুর পরিধির বর্ণ কৃষ্ণ। প্রত্যেক মাংসখণ্ডের উর্দ্ধাংশের (অর্থাৎ পিঠের দিকের) দুই পাশে দুইটি করিয়া দশ খণ্ডে ২x১০=২০টি কাঁটা বাঁকিয়া নীচের দিকে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক কাঁটার গায়ে অজস্র ছোট শুঁয়ো বা রোম আছে। এই অজস্র রোম এবং কাঁটাই পোকার শরীরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে দূর হইতে দেখিলে মাকড়সার জালের অনুরূপ দৃষ্ট হয়। ইহাদের শরীরের বর্ণ সবুজে পীতাভাযুক্ত, কিন্তু মস্তকটি প্রায়ই সবুজ দেখা যায়। ইহাদের মোট ষোলটি পদ। নিম্নাংশের দুইটি পায়ের, দুই চক্র, ঊর্দ্ধে পর পর চারিটি চক্রে দুই পাশে দুইটি করিয়া আটটি পা থাকে এবং পুনরায় এক চক্র ঊর্দ্ধে পর পর তিনটি চক্রে দুই পাশে দুইটি করিয়া ছয়টি আছে। শেষোক্ত পা ছয়টি অন্যান্য পা হইতে ছোট এবং দীর্ঘ, ঐ পা ছয়টির অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ—অনেকটা চেলা বিছের পায়ের মত। এতৎ সাহায্যে ইহারা পাতা আঁকড়িয়া ধরিবার সুযোগ পায়।

(গুটি ও নির্ম্মাণ কৌশল)

অন্যান্য প্রজাপতি-কীট যেমন পুত্তলী হওয়ার পূর্ব্বে নিয়মিত ভাবে কয়েকবার চর্ম্মাবরণ পরিবর্ত্তন করে ইহারাও সেইরূপ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য তিন চার বার চর্ম্মাবরণ পরিবর্ত্তনের জন্যই উহাদের দেহের সৌন্দর্য্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি সাধিত করা হয়। গুটি নির্ম্মাণ করিবার দুই দিন পূর্ব্ব হইতে ইহারাও অন্যান্য প্রজাপতি-কীটের ন্যায় নিঝুম মারিয়া বসিয়া থাকে। ঐ প্রকার নিশ্চল অবস্থায় ইহাদের পশ্চাদংশ হইতে এক প্রকার আঠাল পদার্থ বাহির হয়। পরে ঐ আঠা শুকাইলে, পোকাটি পশ্চাৎ অংশ পাতার সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া যায়। গুটি নির্ম্মাণ করিবার ১১/১২ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে মস্তক নীচের দিকে করিয়া ঝুলিয়া পড়ে ও তদবস্থায় ক্রমাগত নিজের শরীরকে সঙ্কুচিত করিতে থাকে। ঐ সঙ্কোচনের ফলে চর্ম্মাবরণ ঝরিয়া পড়ে। চর্ম্মাবরণহীন পোকাটিকে তখন পোকা বলিয়া চেনা মুস্কিল ; তখন পোকাটির বর্ণ শুভ্র হইয়া যায়। পাগুলি মিশিয়া গিয়া দেহটি একান্ত শুভ্র মাংসের ন্যায় পাতার গায়ে দুলিতে থাকে। ক্রমে উহাই একটি সুন্দর গুটিতে পরিণত হয়। গুটির বর্ণ প্রায় ১৫ দিন পর্য্যন্ত গাঢ় সবুজ থাকে। গুটিটির গড়ন অনেকটা ছোট তিনটি গ্রন্থিযুক্ত ফড়িংএর ন্যায়। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকরণার্থই বুঝি উহার চারি পাশে সুন্দর সোনালী পাড় আছে। গুটির গায় দশটি কালো বিন্দু থাকে। ১৫ দিবস অতিক্রান্ত হইলে গুটির বর্ণ ক্রমে লাল হইতে থাকে।

(প্রজাপতি)

পোকাটি প্রায় ১৯ দিন পর্য্যন্ত গুটির অভ্যন্তরে থাকিয়া অবশেষে ২০ দিনের দিনে একটি অনতিবৃহৎ প্রজাপতির আকার ধারণ করিয়া আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। প্রজাপতিটির পক্ষ চতুষ্টয়ের উপরাংশ গাঢ় বাদামি, নিম্নাংশ লাল ও গোলাপী আভাযুক্ত। এ ছাড়া পাখনাগুলিতে আরো অনেক বর্ণবৈচিত্র্য আছে, এজন্য প্রজাপতিকে সুন্দর দেখায়। ইহাদের পুরুষজাতীয় প্রজাপতি স্ত্রী অপেক্ষা ছোট ও সুন্দর। এতদ্ব্যতীত পুরুষজাতীয় প্রজাপতির চারিটি পাখনার মধ্যে যে ছোট ছোট দুইটি পাখনা থাকে, সেই পাখনা দুইটির উপরপিঠের উর্দ্ধাংশের কিনারায় একটি শাদা ঈষৎ প্রশস্ত দাগ থাকে। ইহাদের মোট চারিটি পা ও দুই শৃঙ্গ এবং একটি শুঁড় আছে। পায়ের বর্ণ ধূসর, শৃঙ্গ -দ্বয়ের শীর্ষভাগের বর্ণ পলাস ফুলের বর্ণের ন্যায়। শুঁড়টি শাদায় গোলাপী আভাযুক্ত। সব সময়ই উহা কোঁকড়ান থাকে। প্রজাপতিগণ ফুলের মধু পান করিবার সময় যেখানে মধু সঞ্চিত থাকে তথায় শুঁড়টি সোজা করিয়া চালনা করিয়া মধু পান করে।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

চৈত্র ১৮৩৪ শক। পৃ. ২৯৭-২৯৮

আশ্রম কথা।

গ্রীষ্মের ছুটির কিছুকাল পর হইতে দিল্লী কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড সি. এফ্. এন্ড্রুজ সাহেব প্রায় দেড় মাস কাল আশ্রমে অবস্থান করেন। অধ্যাপকগণের নিকটে তিনি শিক্ষাতত্ত্ব ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে চারিটি মনোজ্ঞ ও সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে বালকদিগকেও কয়েকটি উপদেশ দেন। এন্ড্রুজ সাহেব দুইদিন বালকদিগকে শেক্সপীয়রের নাট্য হইতে দুইটি অংশ অভিনয় করিয়া শুনাইয়াছিলেন—ছাত্রগণ তাহাতে যথেষ্ট আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। আশ্রম হইতে বিদায়গ্রহণের পূর্ব্বে কয়েকদিন ধরিয়া বয়স্ক ও উচ্চশ্রেণীর বালকগণকে লইয়া তিনি ইংরাজী সাহিত্যের এক ক্লাস খুলিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস ও ভাবসম্পদের কথা নিতান্ত সহজভাবে ও সরল ভাষায় এন্ড্রুজ সাহেব প্রত্যহ ছাত্রগণের নিকট গল্প করিয়া শুনাইতেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে আশ্রমে বাস করিয়া তিনি এখানকার একজন সর্ব্বদা স্মরণীয় বন্ধু হইয়াছেন এবং আশ্রমস্থ অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে নানা সদালাপ ও সদালোচনায় অনেক বিষয়ে সচেতন করিয়াছেন।

একদিন ইংলণ্ডের বিদ্যালয় ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে অধ্যাপকগণের সহিত আলোচনাকালে তিনি ছাত্রদের নিদ্রা ও পরিশ্রমের কালের পরিমাণ সম্বন্ধে সে দেশের

বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছিলেন। ছাত্রজীবনে—বিশেষতঃ শৈশবকালে—নিদ্রার সময় যথেষ্ট থাকা উচিত। ইউরোপে এ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষার পর দেখা গিয়াছে যে দশ ঘণ্টা নিদ্রার সময় দিলে তবে ছাত্রগণ শরীরে ও মনে রীতিমত বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়। নিদ্রার কালের পরিমাণ হ্রাস করিলে তাহার আনুষঙ্গিক রূপে ছাত্রের বুদ্ধি, মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি সমস্তেরই স্ফূর্ত্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

তারপর সে দেশের বিদ্যালয় সকলে নানা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে স্কুলে পাঠের ঘণ্টার মধ্যে মধ্যে ছেদ না দিলে ছাত্রগণ কখনই যথেষ্ট পাঠোন্নতি দেখাইতে পারে না। "ব্রেণফ্যাটিগ"—মাথাকে অতিরিক্ত চালনার জন্য যে ক্লান্তি—তাহা মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম না পাইলে অবশ্যম্ভাবী রূপে ঘটিবেই। দেখা গিয়াছে যে এক ঘণ্টা অধ্যাপনার পর যদি কিছু সময় অবকাশ দিয়া তার পর আর এক ঘণ্টার অধ্যাপনাকার্য্য সুরু হয়, তবে ছাত্রগণ দ্বিতীয় ঘণ্টায় পাঠে অধিক উৎসাহ ও মনোযোগ দিতে পারে। সেইজন্য প্রত্যেক পড়াইবার ঘণ্টার পরে স্বল্পকালের মত অবকাশ দেওয়া ভাল। তাহাতে ছাত্রগণের তরুণ মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয় না বলিয়া পড়াশুনার ফল খুব ভালই হয়। এন্‌ড্রুজ সাহেবের এই আলোচনার পর এই দিক দিয়া বিদ্যালয়ের সময়সূচী সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিশপ্ স্কুল ও সি এম্ এস্ বোর্ডিং-এর সহিত আশ্রমের ছাত্রগণ ফুটবল ম্যাচ খেলিয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে বিশপ্ কলেজের অধ্যাপক মিঃ মিল্‌বার্ণ ও সি এম্ এসের অধ্যাপক মিঃ বারোজ মহোদয় আশ্রমে আসিয়াছিলেন।

স্কটিশ চর্চ্চ কলেজের অধ্যাপক মিঃ ওয়াটিসন্ আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। আশ্রম দেখিয়া ইহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

দিল্লীর অধ্যাপক মিঃ ডব্‌লিউ পিয়ার্সন এম্ এ বি এস্ সি মহোদয় আশ্রমের কাজে আগামী জানুয়ারী মাস হইতে যোগদান করিবেন। ইনি ভারতবর্ষকে আপনার দেশ করিয়া লইয়াছেন। এই আশ্রমে যে ইনি আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ইহাতে আশ্রম কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হইয়াছে।

আশ্রমে এবার খুবই বর্ষা হইয়াছে। শ্রাবণ মাসে প্রায় ১৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। আশ্রমের স্বাস্থ্য ভালই আছে।

আশ্রম বিদ্যালয় ১৬ ই আশ্বিন বন্ধ হইবে ও ২৪শে কার্ত্তিক খুলিবে।

আশ্বিন ১৮৩৫ শক। পৃ. ১৫১-১৫২

আশ্রম-কথা।

পূজার ছুটির পর বিগত ২৪এ কার্ত্তিক বিদ্যালয় খুলিয়াছে।

আশ্রমের আচার্য্য পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে চার দিন এবং কলিকাতা হইতে সম্বর্দ্ধনার জন্য যে দিবস পাঁচশতজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আসিয়াছিলেন সেই এক দিন মোট পাঁচ দিন বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ ছিল।

পূজাবকাশের পূর্ব্বে আশ্রমে "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয় দেখিয়া সকলেই প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

শীতের উৎসব ৭ই পৌষ আসন্নপ্রায়। এবার সেই সময়ে শিশুরা "ডাকঘর" অভিনয় করিবে—তাহার আয়োজন চলিতেছে।

ছাত্র-সভা

"ছাত্র-সভা" নামে নূতন একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। আশ্রমের সমস্ত কাজই ছাত্রগণ যথাসাধ্য পরিচালনা করিবেন। তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূজনীয় আচার্য্যদেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলে সকলেই স্পষ্ট-রূপে এই সভার উদ্দেশ্য কি তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

"আশ্রমের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আহার বিহার, শ্রীসৌন্দর্য্য, আচার ব্যবহার ও চরিত্র নীতি সম্বন্ধে উন্নতি বিধানের জন্য ছাত্রগণ দ্বারা যাহা সম্ভব তাহাই নিজেদের চেষ্টায় সাধন করিবার উদ্দেশ্য এই "ছাত্র-সভা" স্থাপিত হইল। কেবল মাত্র ছাত্রগণ এই সভার সভ্য।" "ছাত্র-সভা" হইতে একটি প্রতিনিধি সভা গঠিত হইয়াছে। তাহার সভ্য সংখ্যা পনের জন। তাহার মধ্যে একজন পুরাতন ছাত্রদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অন্য চৌদ্দ জন বর্ত্তমান ছাত্রদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। একজন সম্পাদক, দুই জন সহকারী সম্পাদক ও এক জন কোষাধ্যক্ষও আছেন। ইহা সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে—ইহার বিস্তৃত বিবরণ এবং কার্য্যপ্রণালী ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

গ্রামের বিদ্যালয়।

সম্প্রতি সাঁওতাল গ্রামের বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের মধ্য হইতে একজন স্থায়ী শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি নূতন প্রণালী অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে পড়াইতেছেন। পূর্ব্বে যে কয়েকজন ছাত্র প্রত্যহ গিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিতেন—তাঁহারা এবং দুই একজন শিক্ষক পালাক্রমে মাঝে মাঝে গিয়া তাহাদিগকে গল্প বলিয়া ছবি দেখাইয়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনজন সাঁওতাল বালক দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়াছে—তাহাদিগকে অন্য বই পড়াইবার কথা চলিতেছে। গ্রামের কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হইলে তাহাদিগকে ঔষধ দিয়া যত্ন লওয়া হইতেছে।

কৃষি কার্য্য।

বিদ্যালয়ের কৃষিকার্য্য খুব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এবার বেগুন, কপি, আলু, ওলকপি, মটর, বীট ইত্যাদি বপন করা হইয়াছে। ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহাদের এ বিষয়ে আগ্রহ আছে, তাঁহারা বাগানের সেবা ও তত্ত্বাবধান যত্ন পূর্ব্বক করিতেছেন। কৃষিকার্য্য পরিদর্শনের ভার সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের উপর আছে।

মিঃ এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন।

দক্ষিণ আফ্রিকার পীড়িত ভারতবাসীদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিতে এই দুই ভারত-হিতাকাঙ্ক্ষী ইংরাজ আশ্রম হইতে শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। যে কয়েক দিন তাঁহারা এখানে ছিলেন, বাঙালীর ন্যায় ধুতিচাদর পরিধান করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা গত বুধবার ভোর ৪ টার গাড়ীতে এখান হইতে যাত্রা করেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁহাদের জন্য মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

রাত্রে তাঁহাদের বিদায়োপলক্ষ্যে তাঁহাদিগকে স্রক্‌চন্দনে ভূষিত করিয়া বিদায় দেওয়া হয়। সেই সময়ে প্রায় সমস্ত আশ্রমবাসী ছাত্র ও অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। মাল্যচন্দন দিবার পর তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে অনুরোধ করা হইলে মিঃ পিয়ার্সন বাংলায় কয়েকটি কথা বলেন—"আমি এবং আমার বন্ধুর পক্ষ হইতে একটিমাত্র কথা তোমাদিগকে বলিতেছি যে এই শান্তিনিকেতন আশ্রম হইতে যে শান্তি আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার কার্য্যে আমাদিগকে সাহায্য করিবে।"

আগামী বৎসরের কর্ম্মচারী।

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ অধ্যাপক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে আগামী বৎসরের (১৩২০, ৭ই পৌষ হইতে ১৩২১ এর ৬ই পৌষ পর্য্যন্ত) জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন—

সর্ব্বাধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়।
আদ্য বিভাগের অধ্যক্ষ	শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন।
মধ্য বিভাগের অধ্যক্ষ	শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়।
শিশু বিভাগের অধ্যক্ষ	শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ।
ধনাধ্যক্ষ	শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়।
সঙ্গীতাচার্য্য	শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বিনোদন-পরিচালক	শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

গত পূজাবকাশের পর হইতে শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদেশ প্রত্যাগত

শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ বিদ্যালয়ের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।

আগামীবারের আশ্রম-সংবাদ আরও বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইবে।

শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৮৩৫ শক। পৃ. ১৯০-১৯১

শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণী।

(৮ই পৌষ বার্ষিক সভায় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক পঠিত)

১৩১৯-১৩২০।

অদ্য আমাদের আশ্রম-বিদ্যালয় চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিল ; নববর্ষ শুভকর ও কল্যাণময় হউক, ভগবানের নিকটে এই আন্তরিক প্রার্থনা করিতেছি ; তাঁহার করুণায় আজ হইতে আমাদের সকল দুর্ব্বলতা সকল অক্ষমতা দূরীভূত হউক। এই পুণ্য প্রভাতে তাঁহার চরণে বার বার প্রণাম করি।

জগন্নাথের রথে যে-দুইটি কাঠের রঙিন্ ঘোড়া সাজানো থাকে যতই আস্ফালন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকুক না কেন, তাহারা রথখানিকে একপদও অগ্রসর করিতে পারে না ;—রথ চলে ভক্তবৃন্দের টানে। দূরে থাকিয়া এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের ব্যাকুলতা দিয়া তাঁহারা রথরজ্জুতে যে মৃদু আকর্ষণ প্রদান করেন, তাহাই রথখানিকে গন্তব্য পথে অগ্রসর করায়। আমাদের আশ্রম-দেবতার রথখানি গত এক বৎসরে যদি লক্ষ্যের অভিমুখে নিরাপদে এক পদও অগ্রসর হইয়া থাকে, তবে তাহার গৌরবে আমাদের ন্যায় অক্ষম সেবকবৃন্দের অতি অল্পই দাবি আছে। গৌরব তাঁহাদেরই যাঁহারা দূরে থাকিয়া আশ্রমের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন, এবং আমাদের সকল কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। তাই আজ আশ্রমের নববর্ষের প্রথম প্রভাতে দেশ-বিদেশের আশ্রম-বন্ধুগণকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি। তার পরে স্মরণ করিতেছি, এই সকল তরুণ আশ্রমবাসীর অভিভাবকদিগকে,—যাঁহারা গৃহের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দদীপগুলিকে আশ্রমে পাঠাইয়া, তাহাদের উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি দেখিবার জন্য গৃহদ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইঁহাদের সুপরামর্শ এবং আশ্রমের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদিগকে নানা প্রকারে শক্তিশালী করিয়াছে। আজ এই শুভদিনে তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। যে সকল ছাত্র আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া স্থানান্তরে বিদ্যার্জ্জন করিতেছেন বা কার্য্যান্তরে নিযুক্ত আছেন, আজ নববর্ষের দিনে তাঁহাদের সম্মুখে চির-উজ্জ্বল থাকুক, এবং তাঁহাদের সকল চেষ্টা জয়যুক্ত হউক, অদ্যকাল শুভবাসরে ভগবানের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি।

গত বৎসরের কার্য্য আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই আশ্রমের আচার্য্য পূজনীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিদেশ ভ্রমণ ও স্বদেশে প্রত্যাগমনের কথা স্মরণ হয়। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ও ধর্ম্মজীবনের আভাস পাইয়া সমগ্র জগৎ আজ বঙ্গদেশকে এবং ভারতবর্ষকে কি প্রকার শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এই ঘটনা বাঙ্গালার ইতিহাসেই চিরমুদ্রিত থাকিবে। সমগ্র ভারতবাসীর সহিত আমরা রবীন্দ্রনাথের সম্মানলাভে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি; আমাদের বিশেষ আনন্দ ও গৌরবের বিষয় এই যে, আমরা পূজনীয় আচার্য্যদেবের যে সাহচর্য্য লাভ করিতেছি অপর কাহারো ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই,—এই লাভ প্রকৃতই অতুলনীয় ; ইহা দ্বারা যদি আমরা নিজেদের জীবনকে পুষ্ট করিতে পারি, তবেই আমরা রবীন্দ্রনাথের এই দুর্লভ সাহচর্য্য-লাভকে সার্থক করিতে পারিব। বিদেশ ভ্রমণ-কালে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের কথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়াছিলেন ; সেখানকার বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাদান-প্রণালী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং সেই সকল কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন, বিদেশে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট দেখিয়াছেন, তদনুসারে আশ্রম বিদ্যালয়টিকে গঠন করিবার জন্য আজও তিনি অনেক চিন্তা করিতেছেন এবং নানা প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন। নববর্ষে এই সকল প্রস্তাব অনুসারে ধীরে ধীরে কার্য্যারম্ভ হইবে। প্রচলিত শিক্ষাদানপ্রণালীতে যে-সকল ত্রুটী আছে, এই ব্যবস্থায় তাহা সংশোধিত হইয়া যাইবে বলিয়া আশা হইতেছে।

আশ্রম-বিদ্যালয়ে যে সকল অধ্যাপক কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে আশ্রমের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ; তথাপি নানা অনিবার্য্য কারণে গত বৎসরের কয়েকজন অধ্যাপকের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইংরাজির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন জোয়াদ্দার আশ্রম ত্যাগ করিলে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং কয়েক মাস হইল তিনিও আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন ; এখন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই পদে নিযুক্ত আছেন। অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভাব আজ আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছি। ইনি সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছিলেন ; অধ্যাপনা-কার্য্যের সহিত আশ্রমের বাহ্য সৌন্দর্য্য-বিধানের জন্য তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ ছাত্র ও অধ্যাপকগণের নিকটে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। গত বৎসরে আমরা দুঃখের সহিত সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতার জন্য আশ্রম-ত্যাগের উল্লেখ করিয়াছিলাম। আজ আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, কয়েক মাস হইতে তিনি আবার ইংরাজির অধ্যাপনা এবং সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরাজির অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় নানা কারণে কয়েক মাস বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়াছেন। গত বৎসরে আশ্রমের চিকিৎসক শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে সুযোগ্য চিকিৎসক

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয় আশ্রম-বৈদ্যের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বর্দ্ধন মহাশয় দীর্ঘকাল আশ্রমের রুগ্নাবাসের সেবকরূপে নিযুক্ত ছিলেন; সম্প্রতি তিনি রুগ্নাবাসের কার্য্য ত্যাগ করিয়া আশ্রমের পরিচ্ছন্নতা-বিধান ও দ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে এবং ধনাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়ের সহকারী-রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। শিশুবিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন রায় মহাশয় রুগ্নাবাসের সেবকরূপে কার্য্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় এক বৎসরকাল ইংলণ্ডে অধ্যাপন-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া এবং ইংলণ্ডের নানা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া সম্প্রতি আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের সহিত স্বদেশে ফিরিয়াছেন। আশ্রমের শিশু ছাত্রদের শিক্ষাবিধানের ভার তাঁহার হস্তে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যজ্ঞান বাবুর অবসর গ্রহণের পরে তাঁহার স্থানে অদ্যাপি কোনো সংস্কৃত-অধ্যাপক নিযুক্ত হন নাই। শীঘ্রই এই পদে একজন যোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। দুই মাস পরে শ্রীযুক্ত পিয়ার্‌সন্ সাহেব আশ্রমবালকদিগের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। তাঁহার ন্যায় সদাশয় ও উদারপ্রকৃতির সুপণ্ডিতকে অধ্যাপকরূপে পাইলে, আশ্রম নানা প্রকারে লাভবান্ হইবে। এতদ্ব্যতীত বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরে বালকগণকে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

গত বৎসরে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৮৯ এবং অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা ২৫ ছিল। পূজার ছুটির পর হইতে প্রতি ছাত্রের বেতন মাসিক কুড়ি টাকা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। কিন্তু যে-সকল পুরাতন ছাত্রের অভিভাবক মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে বেতন দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে উক্ত হারে বেতন লওয়া হয় নাই। উক্ত ১৮৯ জন ছাত্রের মধ্যে ২১ জন সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ছাত্রবেতন হইতে আশ্রমের আয় মাসিক ৩১০০ টাকা মাত্র। সকলে পূর্ণ-বেতন দিলে আয় ৩৭৮০ টাকা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং মাসিক মোট পূর্ণ বেতন হইতে ৬৮০ টাকা কম আদায় হইয়া থাকে। এই হিসাবে গড় অবৈতনিক ছাত্রের সংখ্যা ৩৪ হইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রত্যেক ১১ জন ছাত্রের মধ্যে দুই জন বিনা বেতনে আশ্রমে শিক্ষা লাভ করে। গত কার্ত্তিক মাসে আশ্রমের বৃত্তিভুক্ সেবকগণের তালিকায় ৭২ টি নাম লিপিবদ্ধ দেখা গিয়াছে। ইহার মধ্যে ২৫ জন অধ্যাপক ও কর্ম্মচারী আছেন, অবশিষ্ট ৪৭ জন পাচক-ব্রাহ্মণ, ভৃত্য, মালী, ধোবা, নাপিত ইত্যাদি।

আশ্রমে বাংলা দেশ ছাড়া বোম্বাই, বর্ম্মা, নেপাল ও মাদ্রাজের বালক আছে। গত বার ত্রিপুরা দেশের বালকের সংখ্যা অধিক ছিল। এই জেলার ৩০ জন বালক আসিয়াছিল। নিম্নে কোন্ জিলার কত ছাত্র তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

ত্রিপুরা	৩০
কলিকাতা	২৭
ঢাকা	২১
শ্রীহট্ট	১১
বরিশাল	৬
রাজসাহী	৬
বৰ্দ্ধমান	৬
পাবনা	৫
নদীয়া	৫
২৪ পরগণা	৪
বীরভূম	৪
দার্জ্জিলিং	৩
হাজারীবাগ	৩
মানভূম	৩
জয়পুর	৩
ভাগলপুর	২
দিল্লী	২
জলপাইগুড়ি	২
ডিব্রুগড়	২
ফরিদপুর	১
মেদিনীপুর	১
নেপাল	১
কাণপুর	১
বাঁকুড়া	১
মুঙ্গের	১
হাওড়া	১
খুলনা	১
দ্বারভাঙ্গা	১
শিলচর	১
মালদহ	১
ফরাশী চন্দননগর	১
হুগলি	১

বর্ম্মা	১
এলাহাবাদ	১
উড়িষ্যা	১
মাদ্রাজ	১

শিক্ষা-সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে আমাদের যে সকল পুরাতন ছাত্র সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম স্মরণ হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজ এখানে উপস্থিত আছেন, কেহ বা কার্য্যান্তরে নিযুক্ত থাকায় এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অসমর্থ হইয়াছেন। আমাদের পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে একজন আমেরিকায় এবং তিনজন ইংলণ্ডে শিক্ষা শেষ করিবার জন্য অবস্থান করিতেছেন।

মোটের উপর গত বৎসর শিক্ষাসম্বন্ধে কোনোরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। আশ্রমের তরুণ বালকগণ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অনেক কীট-পতঙ্গের জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনেকে নিয়মিত-ভাবে আশ্রমের বারিপাত উত্তাপ, বায়ু ও মেঘসম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এইখানে আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একশত টাকা মূল্যের একটি Meteorological Set দানের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে।

আশ্রম-আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, শরৎকুমার রায়, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ক্ষিতিমোহন সেন, কালিদাস বসু ও নগেন্দ্রনাথ আইচ মহাশয় বালকগণকে উপদেশ দান করিয়াছেন, এবং বিশেষ বিশেষ স্মরণীয় দিনে ঈশা, গৌতম বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, রাজর্ষি রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। সেই সকল বিশেষ দিনে মন্দিরেও উপাসনা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আশ্রমের অধ্যাপকগণ প্রতিদিন কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে প্রত্যূষে সপ্তপর্ণী বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া উপাসনা করিয়াছেন।

গত বৎসরে দুস্থ দেশবাসীদের হিতকল্পে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ বিশেষভাবে দুইটি অনুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলেন। একটি,—প্লাবন-পীড়িত নিরন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য করা, অপরটি দক্ষিণ আফ্রিকায় উৎপীড়িত ভারতবাসীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। শেষোক্ত কার্য্যটির জন্য বালকগণ এবং কয়েকজন অধ্যাপক ক্রীড়াদি ত্যাগ করিয়া স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা অদ্যাপি অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই কর্ম্মীদের সাধু চেষ্টা সফল হউক এবং উৎপীড়িতদের বেদনা দূরীভূত হউক, আজ ভগবানের নিকটে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে কয়েকজন অধ্যাপক মনোরঞ্জক অথচ শিক্ষাপ্রদ গল্প বলিয়া বালকদিগের বিনোদন করিয়াছেন। তাছাড়া এই সময়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় বালকদিগকে সঙ্গীতও শিক্ষা দিয়াছেন। "সাহিত্য-সভা" "আলোচনা-

সভা" প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, আশ্রম-বালকগণ তাহাতে নানা বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ ও বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছে। গত বৎসরে আশ্রমবাসী ছাত্র ও অধ্যাপকগণ মিলিত হইয়া আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" নাটক এবং "বাল্মীকি প্রতিভা" গীতিনাট্যের অভিনয় করিয়াছিলেন।

পুস্তকাগার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। আগরতলার শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় তাঁহার পুত্র আশ্রমের পুরাতন ছাত্র শ্রীমান্ সোমেন্দ্রচন্দ্রের নামে কতকগুলি মূল্যবান পুস্তক দান করিয়াছেন, এই সুযোগে দাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন্ সাহেব তাঁহার নিজের সমগ্র পুস্তক আশ্রমকে দান করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের সংখ্যা প্রায় চারিশত হইবে, ইহার প্রায় সকলগুলিই মূল্যবান। ইহা ব্যতীত দিল্লি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এনড্রুজ সাহেব এবং পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় কতকগুলি পুস্তক দান করিয়া পুস্তকাগারটিকে পুষ্ট করিয়াছেন। আমরা ইহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। পূজনীয় আশ্রমাচার্য্য মহাশয় বিদেশে অবস্থান কালীন অনেকগুলি নূতন পুস্তক পুস্তকাগারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং স্বদেশে আগমন কালীন কয়েক শত পুস্তক সঙ্গে আনয়ন করিয়াছেন।

আশ্রমে ছাত্রপরিচালনায় ভার সম্পূর্ণরূপে বালকগণেরই হস্তে ন্যস্ত আছে। বৎসরের শেষভাগে ছাত্রসভা নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, বালকগণ বিদ্যালয়ের সকল কার্য্য উহার সাহায্যে আপনারা চালাইবে। ছাত্রপরিচালনায় এই অভিনব উপায় গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর সুন্দরতররূপে চলিবে আশা করা যায়। যাহাতে বালকগণ আপনা হইতেই ব্যবহারে শিষ্ট হইবার, বাক্যে মধুর হইবার, চরিত্রে দৃঢ় হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া, ছাত্রগণকে অধ্যাপকের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন রাখা হয় নাই। এই ব্যবস্থায় ছাত্র ও অধ্যাপকের পরস্পর সম্বন্ধ দৃঢ়তরই হইতেছে।

ছাত্রগণের পরিচালিত সাহিত্যসভা ও মাসিক পত্রিকাগুলি ভালই চলিয়াছে। ইহা ব্যতীত-বালকগণ আশ্রমের দৈনন্দিন সংবাদ প্রকাশ করিবার জন্য "দৈনিক" নামে একখানি পত্রিকা বাহির করিয়াছিল। মোটের উপর ছাত্রগণের পরিচালিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানই লক্ষ্যানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিল।

মাঝে মাঝে ছুটির দিনে বালকগণ আনন্দোৎসব করিতে দূরে ভ্রমণে গিয়াছিল। একবার কয়েকজন বালককে লইয়া অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় মুর্শিদাবাদ ও পলাশী ভ্রমণে গিয়াছিলেন। গত বৎসর ফুটবল ক্রীড়ায় বালকগণ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। তাহারা একবার আশ্রমের বাহিরেও খেলিতে গিয়াছিল। বালকগণের ব্যায়াম ও ক্রীড়া দেখিবার জন্য দুইজন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন।

বালক, অধ্যাপকগণের মাসিক চাঁদায় ও অধ্যাপক মহোদয়গণের সাময়িক দানে পরিচালিত 'সেবাভাণ্ডার' হইতে দরিদ্র বিদ্যার্থী, অসহায়, বিপন্ন, অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ ও রুগ্নদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করা হইয়াছিল। স্থানীয় বন্যাপীড়িত দুস্থ লোকেরাও কিছু কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে ও কয়েকটি বালকের অক্লান্ত চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটির কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

গ্রামের লোকজনের সহিত যোগরক্ষার জন্য অধ্যাপকবর্গ বালকগণ ও আশ্রমের সুযোগ্য চিকিৎসক মহাশয় যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। ছাত্রগণ নিয়মিতভাবে কতকগুলি গ্রাম্য বালককে শিক্ষাদান করিয়াছেন, কোনো কোনো অধ্যাপক ও তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, ও চিকিৎসক মহাশয় গ্রামের শিক্ষালয়ের বালক ও তাহাদের অভিভাবকগণকে প্রয়োজনমত ঔষধ দান করিয়াছেন। এবং সেবাভাণ্ডার হইতে সাধ্যমত ছিন্ন কাপড়চোপড় দান করা হইয়াছে। গত বৎসর যে কয়টি বালক গ্রাম্য বিদ্যালয়ের সাঁওতাল ছাত্রগণের শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তাঁহাদিগকে আজ আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাঝে মাঝে পুস্তকাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন; আজ তাঁহাকেও আমরা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অন্যান্য বৎসর হইতে গত বৎসরে অতিথির সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। ছাত্রগণের অভিভাবক ব্যতীত আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকেও পাইয়াছিলাম। দিল্লী কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক আশ্রম-বন্ধু এন্‌ড্রুজ সাহেব এবং শ্রীযুক্ত পিয়ার্‌সন্ সাহেব কয়েক সপ্তাহ আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। তা ছাড়া ডেভিড ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ গ্রিফিথস্ সাহেব, বর্দ্ধমান বিভাগের বিদ্যালয়গুলির ইন্‌স্পেক্টর ষ্টার্ক সাহেব, বিশপ্‌স্ কলেজের অধ্যাপক মিলবার্ণ সাহেব, সি. এম. এস কলেজের অধ্যক্ষ হলাণ্ড সাহেব, বাঁকুড়া কলেজের অধ্যাপক ওয়াট্‌সন্ সাহেব, দিল্লী কলেজের অধ্যাপক লরেন্‌স্ সাহেব, ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট-মহাসভার সভ্য র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজ অতিথি আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান বিভাগের আসিষ্টান্ট ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ সান্ন্যাল এবং কাশীর হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কেও আমরা অতিথিরূপে কয়েকদিনের জন্য পাইয়াছিলাম।

গত বৎসরে আশ্রম-বালকদিগের স্বাস্থ্য ভালই ছিল, হাম বা অপর কোনো সংক্রামক ব্যাধি দেখা দেয় নাই। আশ্রমের রুগ্নাবাসে পূর্ব্বে এককালে দশটির অধিক ছাত্র স্থান পাইত না, এখন তাহাতে পনেরোটি ছাত্রের স্থান সংকুলান হয়। তথাপি স্বতন্ত্র আহার-গৃহ ইত্যাদির জন্য নূতন গৃহ-নির্ম্মাণের প্রয়োজন আছে। আশ্রমবৈদ্য মহাশয় এ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। এ্যালোপ্যাথিক ঔষধাদির সহিত

হোমিওপ্যাথিক ঔষধও থাকে, প্রয়োজন হইলে হোমিওপ্যাথিক মতেও চিকিৎসা করা হয়।

আশ্রম-গোষ্ঠে এখন গো-মহিষের মোট সংখ্যা ৭৩। বহু ব্যয়ে এই গোষ্ঠ রাখা হইয়াছে। ইহা হইতে যে দুগ্ধ ও ঘৃতাদি পাওয়া যায় তাহা আশ্রম বালকগণই ব্যবহার করে। আশ্রমপালিত দুইটি মহিষ এবং দুইটি গরু দিয়া দুইখানি গাড়ি গত বৎসরে টানানো হইয়াছে। আশ্রমের কার্য্যের জন্য বাহির হইতে গো-গাড়ি ভাড়া করার প্রয়োজন হয় নাই। এই সকল গো-মহিষাদি দ্বারা বর্ত্তমান বৎসরে কৃষিকার্য্য সুরু করা যাইবে মনে হইতেছে। শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আশ্রম-গোষ্ঠ পরিচালিত হইয়াছিল।

মাঘ ১৮৩৫ শক। পৃ. ২১১-২১৫

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের প্রথম কথা।*

জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রথম কথাটা বলিবার পূর্ব্বে এই শাস্ত্রটা কি জানা প্রয়োজন। আমরা অঙ্ক কসি, ভূগোল পড়ি। একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারি অঙ্ক-শাস্ত্রটা এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি সংখ্যার যোগ বিয়োগ ভাগ প্রভৃতি শিক্ষা দেয় এবং পৃথিবীর কোন্ স্থানের অবস্থা কি প্রকার কোন্ সাগর কোন্ মহাসাগর কোথায় অবস্থিত তাহা ভূগোল পাঠে জানা যায়। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের বিষয় এ সব লইয়া নয়। রাত্রির নির্ম্মল আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র দেখা যায়, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান তাহাদেরি পরিচয় আমাদিগকে দেয়। আমরা প্রতিদিনই দেখি সূর্য্য প্রাতে পূর্ব্ব আকাশে উঠিয়া সন্ধ্যাকালে পশ্চিমে অস্ত যায়। শীতকালে সূর্য্য দক্ষিণ ঘেঁসিয়া আকাশের উপর দিয়া চলে, দিন ছোট হয়। গ্রীষ্মকালে তাহা প্রায় মাথার উপর দিয়া চলিয়া অস্ত যায়, তখন দিনগুলি বড় হয়। তার পরে রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, দ্বিতীয়ার সেই ক্ষীণ রেখার মত চাঁদখানি দিন দিন বড় হইয়া সন্ধ্যার সময়ে ক্রমেই আকাশের উপরে দেখা দিতেছে। তার পর একদিন সেটি সোনার থালার মত পূর্ণিমার চাঁদ হইয়া পড়িতেছে। কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যাবেলায় যখন চাঁদ না থাকে, তখনও আকাশে দেখিবার জিনিষের অভাব হয় না। হীরক বিন্দুর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত নক্ষত্র আকাশকে ছাইয়া থাকে। কোনোটি উজ্জ্বল, কোনোটি ম্লান, কোনোটি ছোটো, কোনোটি বড়। কোনোটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে, কোনোটি নিমেষশূন্য দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া আছে। কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একটি দীর্ঘ মালার আকারে আকাশে বিস্তৃত রহিয়াছে, কতকগুলি একত্র হইয়া

---

* ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সান্ধ্য বক্তৃতা সভায় পঠিত।

হয়ত একটি ত্রিভুজের আকার গ্রহণ করিয়াছে। এই সব দেখিয়া মনে হয় না কি, আকাশের এই আলোক বিন্দুগুলি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? এরা কোথা হইতে আসিল? আমাদের সূর্য্যটাই বা কি এবং চন্দ্রই বা কি? জ্যোতির্বিজ্ঞান এই সকল প্রশ্নেরই উত্তর দেয়। কেবল তা নয়, আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, যার মাটিতে শস্যাদি বুনিয়া খাদ্য উৎপন্ন করি, যাহার ধুলা মৃত্তিকার সহিত আমাদের আজন্ম সম্বন্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞান তাহারো জন্মকথা আমাদিগকে বলিয়া দেয়।

শিশু পুত্র মাতাপিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কতই না প্রশ্ন করে। একটি ফুল দেখিলে সেটা কি এবং কোথা হইতে আসিল জানিতে চায়, একটি পাখী উড়িয়া গেলে সেটি কোথায় চলিল জানিতে চায়। জ্ঞানের যখন উদয় হয় তখন এই প্রশ্নগুলি শিশুর মনে আপনিই জাগিয়া উঠে। মানবজাতি এখন যেমন জ্ঞানী অতি প্রাচীন বহু চিন্তা করিয়া এবং বহু অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আর নূতন করিয়া আমাদের জানিতে হইতেছে না, পূর্ব্ব পুরুষদের জ্ঞানের ভাণ্ডার পাইয়া আমরা যেমন জ্ঞানী হইয়াছি, খুব অতীত যুগের মানুষেরা সে প্রকার জ্ঞানী ছিল না। তাহারা জ্ঞানে আমাদের শিশুর মতই ছিল, তাহারা প্রকৃতির মধ্যে যে সকল বস্তু ও যে সকল ঘটনা দেখিত, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিত। কিন্তু এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার মত লোক ত তখন ছিল না, কাজেই নিজেরাই দেখিয়া শুনিয়া এক একটা উত্তর দাঁড় করাইত। সকল শাস্ত্রেরই গোড়ার খবর জানিবার জন্য চেষ্টা করিলে দেখা যায়, প্রাচীন মানবজাতির প্রশ্ন ও তাহার উত্তরেই শাস্ত্রের মূল-পত্তন হইয়াছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তির পত্তনও ঠিক এই প্রকারেই হইয়াছিল। দূর অতীত যুগে মানুষের মনে যে দিন প্রথম জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল তখন তাহারা চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রশ্ন করিত এরা কে? কোথা হইতে এদের জন্ম? তাহাদের যে-টুকু জ্ঞান ছিল, সেই জ্ঞানের সাহায্যে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিত। ইহাতে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা সম্বন্ধে যে কত গল্প কত অদ্ভুত সিদ্ধান্তের সৃষ্টি হইয়া ছিল তাহার সংখ্যা নাই। আফ্রিকার গভীর অরণ্যের অসভ্য অধিবাসিগণকে প্রশ্ন কর, তাহারাও চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীর উৎপত্তি ও চলাফেরা সম্বন্ধে এক একটা অদ্ভুত গল্প বলিবে। মানুষের মনে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, সে কখনই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, প্রকৃতিতে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা দেখে, সে তাহার বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুরূপ সেগুলির ব্যাখ্যা দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানের তো অন্ত নাই। কাজেই মানুষ যতই জ্ঞানী হইতেছে, ততই প্রকৃতির ঘটনা সম্বন্ধে নূতন নূতন প্রশ্ন তাহার মনে হইতেছে, এবং নূতন নূতন ভাবের প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। যেখানে উত্তর মিলিতেছে না, সেখানে মানুষ কেবল অবাক হইয়া প্রকৃতির কার্য্য দেখিতেছে। এই প্রকার অবাক-করা অনেক ঘটনা আজও নানা শাস্ত্রে আছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানেও অনেক আছে। মানুষ যতই প্রকৃতির কার্য্য

ভাল করিয়া দেখিতেছে, নিত্য নূতন ঘটনা দেখা দিয়া ততই তাহাকে বিস্মিত করিতেছে। এই বিস্ময়ের শেষ কখনই হইবে না। বিধাতার সৃষ্টি যেমন অনন্ত, সৃষ্টির রহস্যও তেমনি অনন্ত। এক মুষ্টি তণ্ডুল যে মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, দেহের মর্ম্ম স্থানে একটু মৃদু আঘাতে যাহার মৃত্যু ঘটে, এবং অতি সামান্য কারণে যাহার বুদ্ধি লোপ পায়, বিধাতার অনন্ত সৃষ্টির এই কীটানুকীট মানুষের কি সাধ্য যে অনন্ত আকাশ জোড়া সৃষ্টির মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারে? জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাতে সৃষ্টি যে কত বিশাল, তাহার কার্য্য যে কত সুনিয়মে চলিতেছে, তাহাই আমাদিগকে জানাইয়াছে। আদিম মানব যে দিন প্রথম চিন্তা করিবার শক্তি পাইয়াছিল তখন সে যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে আকাশে স্থূলভাবে দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখনকার পরম জ্ঞানী সুসভ্য মানুষও প্রকৃতিকে অতি সূক্ষ্মভাবে দেখিয়া ঠিক সেই রকমই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আকাশের চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রকে যাঁহারা প্রথমে নিয়মিত ভাবে দেখিয়া উহাদের রহস্য জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা মনে করিলে ক্যালডিয়ান্ জাতি এবং আমাদেরি অতি প্রাচীন পূর্ব্ব পুরুষদের উল্লেখ করিতে হয়। ক্যালডিয়ানদিগের মেষ-পালন করাই ব্যবসায় ছিল। তাহারা যে প্রাচীন যুগে পৃথিবীতে বাস করিত তখন এখনকার মত বড় বড় সহর ছিল না, তাহারা বনে বনে মাঠে মাঠে মেষ চরাইত, এবং রাত্রিতে মেষগুলিকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাদের পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। মেঘশূন্য আকাশের তলে শয়ন করিয়া যখন তাহারা নক্ষত্রগুলিকে দেখিত তখন তাহাদের মনে কত কথারই উদয় হইত। কতকগুলি নক্ষত্রের সমষ্টিকে তাহারা মানুষের, সিংহের বা ভেড়ার আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিত এবং সেই অনুসারে কোন স্থানের নক্ষত্রসমষ্টিকে সিংহ রাশি, কতকগুলিকে মেষ রাশি বা বৃশ্চিক রাশি নাম দিত। আমরা যখন মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকি, তখন মেঘের কতই আকৃতি পরিবর্ত্তন দেখি। এখনি যে মেঘখণ্ডকে মানুষের মত দেখিতেছিলাম, পরক্ষণে তাহা হয় ত ঘোড়ার মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়ায়। রাত্রির আকাশের তলে শুইয়া ক্যালডিয়ানেরা এই রকমেই নক্ষত্রের সমষ্টিতে নানা মূর্ত্তির কল্পনা করিত। মেঘ ক্ষণে ক্ষণে আকাশ পরিবর্ত্তন করে, কিন্তু নক্ষত্রেরা আমাদের কাছে প্রায় নিশ্চল, এ জন্য সেই অতি প্রাচীন যুগে আকাশের নানা স্থানের নক্ষত্রে ক্যালডিয়ানেরা যে আকৃতি কল্পনা করিয়াছিল, আজও আমরা আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার পরিচয় পাইতেছি। আজও তাহাদেরই কল্পনা অনুসারে আমরা আকাশের স্থানবিশেষের নক্ষত্রগণকে মেষরাশি, বৃষরাশি, সিংহরাশি ইত্যাদি বলিয়া থাকি। আমাদের এই ভারতবর্ষেও এক সময়ে খুব বড় বড় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। এখনো তাঁহারা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের গুরুস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। হিন্দুদের যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ সকলই তিথি নক্ষত্র অনুসারে করিতে হয়, এই কারণে গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র

সূর্য্যের গতিবিধির সহিত বিশেষ পরিচয় স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। আজকাল বড় বড় দূরবীণের সাহায্যে এবং আরো অনেক যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্রদের গতিবিধি দেখা চলিতেছে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই সকল যন্ত্রের সাহায্য না লইয়াও নানা জ্যোতিষিক ঘটনা সম্বন্ধে যে প্রকার হিসাবপত্র করিতেন, তাহা সত্যই আশ্চর্য্যজনক!

আকাশে যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্যের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় অধিক। সূর্য্য প্রভাতে পূর্ব্বে উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়। চাঁদেও আমরা তাই দেখি। তাছাড়া ইহারা নিয়তই স্থান পরিবর্ত্তন করে। অর্থাৎ চাঁদকে আজ সন্ধ্যার সময়ে যে সকল নক্ষত্রের কাছে দেখিলে, কাল সন্ধ্যার সময়ে তাহাকে আর সে সকল নক্ষত্রের কাছে দেখিতে পাইবে না, নক্ষত্রদের ভিড় ঠেলিয়া সে যেন শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কেবলি পূর্ব্বদিকে ছুটিয়া চলে। সূর্য্যের অবস্থাও তাই। আজ আকাশের সীমার যে গাছটির মাথা হইতে সূর্য্য উদিত হইল, এক মাস পরে যদি পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে ঠিক সে স্থান হইতে সূর্য্যের উদয় হইতেছে না। হয় বামে না হয় ডাহিনের আর একটা গাছের মাথা হইতে সূর্য্য আকাশে উঠিতেছে দেখিবে। কিন্তু নক্ষত্রদের এরকম স্থান পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। আজ যে চারিটিকে এক স্থানে একটি বৃত্ত বা ত্রিভুজ রচনা করিয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে, সে চারিটি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যাইবে বটে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যের যে দূরত্ব তাহার একটুও পরিবর্ত্তন হইবে না। চন্দ্র সূর্য্য এবং আমাদের পৃথিবীর মত আর যে কয়েকটি ছোট জ্যোতিষ্ক আছে, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, আকাশের সকল নক্ষত্রই আমাদের কাছে প্রায় নিশ্চল। জগদীশ্বর ছোট বড় নক্ষত্রকে বসাইয়া সমগ্র আকাশে যে একটি ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন, সে ছবির পরিবর্ত্তন নাই। কেবল চন্দ্র সূর্য্য ও আমাদের পৃথিবীর মত ক্ষুদ্র ছয় সাতটি গ্রহ ঐ ছবির উপর দিয়া চলাফেরা করে।

আকাশে যে এই অসংখ্য নক্ষত্র দেখা যায়, তাহারা কত বড় শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, ইহাই আমাদের নিকটে খুব বড় বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্য আবার এই পৃথিবী হইতেও অনেক বড়। এক কোটি তিন লক্ষ পৃথিবী জোড়া দিলে তবে একটা সূর্য্য হয়, অর্থাৎ সূর্য্যের বৃহৎ উদরের ভিতরে এক কোটি তিন লক্ষ পৃথিবী অনায়াসেই লুকাইয়া থাকিতে পারে। আলোক বিন্দুর মত যে নক্ষত্রদিগকে আমরা আকাশে দেখিতে পাই, তাহাদের কোনটিই সূর্য্য অপেক্ষা ছোট নয়, বরং অনেকেই শত শত গুণ বড়। পৃথিবী হইতে সূর্য্য প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে। এজন্য এত বড় জিনিষ হইয়া সূর্য্য আমাদের কাছে ছোট। দূরের পাহাড়, দূরের গাছ বাড়ী ছোট দেখায় ;—সূর্য্যকেও ঐ কারণে ছোট দেখায়। নক্ষত্রেরা আবার সূর্য্য হইতেও অনেক দূরে আছে, এইজন্য এগুলি এত ছোট হইয়া দাঁড়ায় যে আমরা কেবল তাহাদের আলোই দেখিতে পাই, অবয়ব দেখিতে পাই না। যাহাদের

আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না, এ রকম নক্ষত্রও আকাশে অনেক আছে। এগুলি পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে তাহাদের আলো পর্য্যন্ত আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না।

নক্ষত্রগণ পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে, তাহার একটু আভাস দেওয়া যাউক। কোনো স্থানে শব্দ করিলে সেই শব্দ দূরে গিয়া পৌঁছতে যে একটু সময় লয়, তাহা আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই। খোলা মাঠে ফুটবল খেলা হইতেছে, দূরে দাঁড়াইয়া যিনি খেলা দেখেন তিনি বেশ বুঝিতে পারেন বলটিকে পা দিয়া মারা হইল এবং তাহা লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু শব্দ তৎক্ষণাৎ কাণে পৌঁছিল না, দূরত্ব অনুসারে দু'সেকেণ্ড বা এক সেকেণ্ড পরে শব্দ শুনা গেল। শব্দ যেমন এক স্থান হইতে দূরবর্ত্তী কোনো স্থানে পৌঁছিতে সময় লয়, আলোকও তেমনি এক স্থান হইতে আর এক স্থানে পৌঁছিতে সময় লয়। ঘরের এক কোণে আলো জ্বালাইলে তাহা অন্য কোণে পৌঁছিতে সময় ব্যয় করে, কিন্তু সে সময়টা অতি সামান্য। আলো প্রতি সেকেণ্ড এক লক্ষ নব্বুই হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া চলে। আমাদের সূর্য্য যে দূরে আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া আলো আট মিনিটে পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এমন নক্ষত্র অনেক আছে, যাহার আলো প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ নব্বুই হাজার মাইল বেগে ছুটিয়াও দুই শত বা চারি শত বৎসরের পূর্ব্বে পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে না। এখন বিবেচনা কর নক্ষত্রেরা কত দূরে আছে। যে নক্ষত্রটি আমাদের খুব নিকটে তাহারই আলো পৃথিবীতে আসিতে চারি বৎসর চারি মাস সময় লয়। উত্তর আকাশে ধ্রুব তারাকে আমরা অনেকেই দেখিয়াছি, এই তারাটির উদয়াস্ত নাই। ইহার আলো পৃথিবীতে আসিতে সাতচল্লিশ বৎসর ক্ষেপণ করে। আকাশে যে কতকগুলি তারা সজ্জিত হইয়া কালপুরুষের (Orion) রচনা করিয়াছে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহার নিকটে একটা খুব উজ্জ্বল তারা আছে। তারাটির নাম (Sirius) ইহা এত দূরে অবস্থিত যে তাহার আলোক পৃথিবীতে আসিতে পথের মাঝেই সাড়ে আট বৎসর কাটাইয়া দেয়। উত্তর আকাশে Arctaraus নামে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। ইহার আলো এক শত ষাইট বৎসরে পৃথিবীতে পৌঁছায়। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পলাসি যুদ্ধের তিন বৎসর পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্রটি যে আলোক ত্যাগ করিয়াছিল, এখন তাহারই ধারা পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায়, যে রাজ্যে নক্ষত্রদের বাস তাহা কত বৃহৎ! আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর চারিদিকে কোটি কোটি মাইল দূরে হাজার হাজার সূর্য্যের সমান যে অসংখ্য নক্ষত্র রহিয়াছে জ্যোতির্বিজ্ঞান তাহাদেরি সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। আমাদের সূর্য্য এই সকল নক্ষত্রদেরই মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। আমাদের পৃথিবী ইহারি চারিদিকে ঘুরিতেছে;—তা'ছাড়া বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি আরো অনেক গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আবার এই সকল গ্রহকে

ঘেরিয়া উপগ্রহেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যের ন্যায় একটা ছোট নক্ষত্রকে ঘেরিয়া যদি এতগুলা গ্রহ উপগ্রহ থাকে, তবে অনন্ত আকাশের কোটি কোটি বড় নক্ষত্রকে ঘেরিয়া যে কত কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ দিবারাত্রি ঘুরিতেছে, তাহার সংখ্যাই হয় না। জ্যোতিষ্কদের রাজ্য কত বড় এবং তাহাতে কত অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্র আছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এই সকল গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্র ছাড়া আকাশের আরও অনেক জ্যোতিষ্ক আছে। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীকে জ্যোতির্বিদগণ নিহারিকা (Nebula) বলিয়া থাকেন। নির্ম্মল রাত্রিতে এগুলিকে খুব পাতলা সাদা মেঘের মত দেখা যায়। আকাশের দুই একটা স্থানে খালি চোখেও ইহাদিগকে দেখা যায়, তা'ছাড়া অপর স্থানে দেখিতে হইলে দূরবীণ দিয়া দেখিতে হয়। আকাশের নানা স্থানে ক্ষুদ্র মেঘের টুকরার ন্যায় প্রায় কুড়ি হাজার নিহারিকার কথা জানা গিয়াছে। দুর হইতে মেঘের টুকরার ন্যায় দেখা গেলেও এগুলি আকারে অত্যন্ত বড়। ইহাদের এক একটিই আকাশের কোটি কোটি মাইল স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। কেবল তাহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে। অতি দূরে এইপ্রকারে যে প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে, তাহারি মৃদু আলো দেখিয়া আমরা তাহাদের কথা জানিতেছি।

ধূমকেতুগণ অনন্ত আকাশের আর এক শ্রেণীর অধিবাসী। ইহাদের অনেকগুলিই আমাদের পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহদের ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু ইহাদের আকৃতি প্রভৃতি বড়ই অদ্ভুত! দীর্ঘকালের শেষে হঠাৎ একদিন ইহারা দেখা দেয়, যতই আমাদের কাছে আসিতে থাকে তাহাদের পুচ্ছ ততই দীর্ঘ হইতে থাকে,—তার পরে একটু একটু করিয়া পুচ্ছ গুটাইতে গুটাইতে তাহারা আমাদের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায়। ১৮১১ সালে যে বড় ধূমকেতুটিকে আমরা দেখিয়াছিলাম তাহার কথা বোধ হয় সকলেরই মনে আছে। শেষ রাত্রিতে যখন সেটি পূর্ব্বাকাশে উদিত হইত তাহার পুচ্ছটি মধ্য আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িত। এটি প্রায় পঁছাত্তর বৎসর অন্তর এক একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ শেষ করে। এখন সে দূরে চলিয়া গিয়াছে, পঁচাত্তর বৎসর পরে আবার দেখা দিবে। যাহারা দুই শত, আড়াই শত বৎসর অন্তর এক একবার দেখা দেয়, এ রকম ধূমকেতুও আছে। আবার এমন ধূমকেতুও অনেক রহিয়াছে যাহারা একবার মাত্র সূর্য্যকে ঘুরিয়া চিরদিনের মত সূর্য্যের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া মহাকাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়া যায়। ইহাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

উল্কাপাত আমরা সকলেই দেখিয়াছি। আকাশ নির্ম্মল; সহস্র সহস্র নক্ষত্র আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকার রাত্রিতে প্রায়ই দেখা যায়, অসংখ্য নক্ষত্রদের মধ্যে হইতে যেন একটি নক্ষত্র খসিয়া দ্রুতবেগে এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এই প্রকারে ধাবমান জ্যোতিষ্কদিগকে উল্কাপিণ্ড বলে। বলা বাহুল্য ইহারা নক্ষত্র

নয়। নক্ষত্রেরা এক একটা মহা সূর্য্য। ইহারা ঐ প্রকারে খসিয়া পড়িতে পারে না। উল্কাপিণ্ডগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র আকারের জিনিষ, ইহারা দলে দলে এবং কখন কখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মহাকাশে পরিভ্রমণ করে। কাজেই ছোট হইলেও এগুলিকে অনন্ত আকাশের ক্ষুদ্র অধিবাসী বলিয়া মানিতে হয়। মহাকাশে বেড়াইতে বেড়াইতে ইহারা যখন পৃথিবীর আকর্ষণের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন পৃথিবী তাহাকে টানিয়া মাটিতে ফেলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কদাচিৎ দুই একটাই মাটিতে পড়ে ; কারণ পৃথিবীর টানে আমাদের আকাশের বায়ুর ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে ; বায়ুর ঘর্ষণে সেগুলি এত গরম হইয়া পড়ে যে, পথের মাঝেই তাহারা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

আমাদের দেশে প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের বাস। মানুষের পরমায়ু বড়ই অল্প, এক শত বৎসর পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকেই বাঁচে। সুতরাং বলা যাইতে পারে আশী বা নব্বুই বৎসর পরে এই ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে একটিও জীবিত থাকিবে না। তখন আবার এক দল নূতন ত্রিশ কোটি লোক দেখা দিবে। কাজেই দেখা যাইতেছে প্রতি এক শত বৎসর অন্তর এক এক দল সম্পূর্ণ নূতন লোক আমাদের দেশে আসিতেছে! মনে করা যাউক আমাদের দেশের প্রত্যেক লোকের জন্য এক একটা স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা যাইতেছে। এপ্রকারে একশত বৎসর পরে আমাদের ভারতবর্ষের উপরে নিশ্চয়ই ত্রিশ কোটি স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে ; এবং স্তম্ভের সংখ্যা একশত বৎসর অন্তরে ত্রিশ কোটি করিয়া বাড়িয়া হাজার বৎসর পরে এমন হইয়া দাঁড়াইবে যে তখন মাটির উপরে আর ঘর বাড়ী নির্ম্মাণের স্থান থাকিবে না, সকলই স্মৃতিস্তম্ভে ভরিয়া উঠিবে। অনন্ত আকাশে যে কোটি কোটি নক্ষত্রগণ এখন উজ্জ্বল হইয়া আলোক বিতরণ করিতেছে, তাহাদেরও জন্ম মৃত্যু আছে। মানুষ আসী, নব্বুই বা এক শত বৎসর বাঁচে, নক্ষত্রেরা হয় ত কোটি বৎসর বাঁচে। কিন্তু এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন তাহাদের এত উজ্জ্বলতা এবং এত প্রতাপ একবারে লয় প্রাপ্ত হইবে ; তখন অনুজ্জ্বল অবস্থায় ঘোর অন্ধকারে বিচরণ করা ব্যতীত তাহাদের আর উপায় থাকিবে না। আমাদের এই যে সৃষ্টি তাহা দুই কোটি বা দশ কোটি বৎসরের নয়, অনন্তকাল ধরিয়া শত শত সূর্য্যের ন্যায় এই সকল নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু ঘটিতেছে। কাজেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারা যায়, এখন যতগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্র আকাশে বর্ত্তমান আছে, তাহাদের তুলনায় অনেক অধিক মৃত নক্ষত্র আকাশে আছে। আকাশের এই অধিবাসীদের তাপ নাই, আলোকও নাই, ভূতের ন্যায় অন্ধকারে ছুটোছুটি করিয়াই তাহারা সৃষ্টির শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটাইবে। আমাদের এই অনন্ত আকাশ কেবল কোটি কোটি উজ্জ্বল নক্ষত্রেরই লীলাভূমি নয়, অসংখ্য প্রেত জ্যোতিষ্কেরও ইহা বিচরণ ক্ষেত্র।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

৩০ মাঘ।

আশ্রম সংবাদ।

দুইজন পাঞ্জাবী গায়ক আশ্রমে সঙ্গীতশিক্ষা দিবার নিমিত্ত সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রত্যহ প্রভাতে ও বৈকালে দুইবার করিয়া বালকেরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের নিকটে সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছে।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

সপ্তাহে দুই দিন সন্ধ্যাকালে কয়েকজন অধ্যাপক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বয়স্ক ছাত্রদের নিকটে বক্তৃতা দান করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। অধ্যাপকগণ ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পাঠকগণের জন্য সেই সকল বক্তৃতা তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রথম একটি বক্তৃতা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত কাপ্তেন জে. ডব্লিউ. পেটাভেল (Retired R. E.) ও তাঁহার পত্নী আশ্রমের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। পেটাভেল সাহেব উচ্চশ্রেণীতে ইংরাজী পড়াইতেছেন ও জরিপের কাজ শিক্ষা দিতেছেন। মিসেস পেটাভেল শিশু ছাত্রদিগকে কথাবার্ত্তা ও খেলার ভিতর দিয়া ইংরাজী শিখাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

আশ্রমে কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটি ভদ্রলোক কিছুদিন হইল আশ্রম পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত এফ্.টি. ব্রুক্স্ আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ছাত্রদের নিকটে দুইটি বক্তৃতা দেন। মিসেস ট্যানার্ড নাম্নী এক বাহাই ধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলাও আশ্রম দেখিতে আসিয়াছিলেন ও বাহাইধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণাপথ মালাবার হইতে একজন ভদ্রলোক তাঁহার পুত্রকে আশ্রমে ভর্ত্তি করাইবার জন্য আসিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ডব্লিউ পিয়ার্সন শীঘ্রই দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে পৌঁছবেন। ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াই তিনি আশ্রমের কার্য্যে যোগদান করিবেন। ইতি

আশ্রমবাসী

চৈত্র ১৮৩৫ শক। পৃ. ২৫৯-২৬৪

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

আশ্রম-সংবাদ।

শ্রীযুক্ত ডব্‌লিউ ডব্‌লিউ পিয়ার্সন।

শ্রীযুক্ত ডব্‌লিউ ডব্‌লিউ পিয়ার্সন এম. এ, বি. এসসি, মহোদয় আসিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। তিনি বিগত ১৭ই চৈত্র দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আশ্রমে প্রবেশ করিবার সময় বৈদিক প্রথানুসারে তাঁহাকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

ছাত্র-সভা।

ছাত্র-সভার আরম্ভ খুব বেশিদিন না হইলেও তাহার কার্য্য মোটের উপর মন্দ চলিতেছে না। ক্রমে ক্রমে ছাত্র-সভার দায়িত্ব বাড়িয়া উঠিতেছে। কয়েকটি তার ছাত্রদিগের উপর নূতন আসিয়া পড়িয়াছে। যেমন—

(১) পূর্ব্বে আশ্রমে পূর্ত্ত বিভাগের যাবতীয় কার্য্যাবলীর ভার নির্দ্দিষ্ট অধ্যাপক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল। সম্প্রতি তাহা ছাত্র-সভা গ্রহণ করিয়াছেন। এ গুরুভার এখনও সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই। আশা হইতেছে ক্রমে ক্রমে তাহা সফল করিয়া তুলিবার জন্য ছাত্রগণ সচেষ্ট হইবেন।

(২) ভৃত্য ও ব্রাহ্মণদিগের পরিবর্ত্তে আজকাল ছাত্রগণ পালাক্রমে প্রত্যহ দুইবেলা জলখাবার, এবং মধ্যাহ্ন ও রাত্রির ভোজনের সময়ে পরিবেষণ করিতেছেন। এক এক ঘরের ছাত্রদের পরিবেষণের পালা উপস্থিত হইলে তাঁহারা সাদরে অবশিষ্ট সকল ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে লিখিত পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া অতি যত্নের সহিত অতিথিরূপে তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করেন। তাঁহারা সাধ্যমত গৃহসজ্জা করিয়া পরিপাটিভাবে তাঁহাদিগকে আহার করাইতে চেষ্টা করেন এবং সকলের ভোজনান্তে আপনারা আহার করেন। এইরূপে কাজ বেশ ভালই চলিতেছে। ইহাতে ছাত্রদিগের মধ্যে একটি সামাজিক ভাবেরও চর্চ্চা হইতেছে।

সাঁওতাল বিদ্যালয়।

সাঁওতাল বিদ্যালয়ের কার্য্য একরূপ মন্দ চলিতেছে না। সামনে বর্ষাকাল আসিতেছে। সেই সময়ে পড়াইবার অত্যন্ত অসুবিধা হয়। সেইজন্য একখানি গৃহ তুলিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। আশা করা যাইতেছে ছুটির মধ্যেই তাহা সম্পন্ন হইয়া যাইবে। এ কাজে যে যে মহাত্মাগণ কৃপা করিয়া অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকটে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত কোনোক্রমে এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর হইত না।

এই "সাঁওতাল-শিক্ষা-সমিতি" হইতে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেন্ট মহাসভার শ্রমজীবী

সম্প্রদায়ের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের "জনসাধারণের উন্নতি" সম্বন্ধে শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রদত্ত বক্তৃতা বাংলায় ক্ষুদ্র পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দেশের অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতির শুভাকাঙ্ক্ষীদিগের নিকট ইহা অতি উপকারপ্রদ হইবে বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক নব্য যুবকের এই পুস্তিকাখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য। ঠিকানাসহ দুই পয়সার ডাক টিকিট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে ঐ বই বিনামূল্যে প্রেরণ করা হইবে।

"সম্পাদক, সাঁওতাল-শিক্ষা-সমিতি"
শান্তিনিকেতন।

বর্ষশেষ ও নববর্ষোৎসব।

গত ৩০শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্য বন্ধ ছিল। বর্ষশেষের দিনে প্রাতে বৈষ্ণব কীর্ত্তনের দলের সংকীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। নববর্ষের দিনে প্রত্যুষে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে বৈকালে সুরুলযাত্রা করা হয়। তথায় অসময়ে বৃষ্টি আসাতে গৃহপ্রবেশ কার্য্যাদি নিয়মমত সম্পন্ন হইতে পারে নাই।

শ্রীযুক্ত সি এফ্ এণ্ড্রুস্।

শ্রীযুক্ত সি এফ্ এণ্ড্রুস্ বিগত ৬ই বৈশাখ সন্ধ্যায় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে পূজনীয় আচার্য্যদেব একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আশ্রমের প্রবেশদ্বারে উপনীত হইলে তাঁহাকে আসনে বসাইয়া শঙ্খধ্বনি করত লোকসমাগমের মধ্যে স্বয়ং আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্রক্‌চন্দনে ভূষিত করেন। তাহার পর ছাত্রগণ সমস্বরে বেদ গাথা পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিরচিত কবিতাটি পাঠ করিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। কবিতাটির প্রথম দুই ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার
হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।

অতঃপর ছাত্রগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি কয়েকটি কথা বলেন।

বর্ত্তমানে তিনি দিল্লী গমন করিয়াছেন। আগামী জুলাই মাসে আশ্রমে পুনরায় আগমন করিবেন ও আশ্রমের কার্য্যে যোগদান করিবেন। আগামী সংখ্যায় আমরা তাঁহার অভ্যর্থনার কবিতাটি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিব।

ছুটি ও অভিনয়।

গ্রীষ্মাবকাশে ১৫ই বৈশাখ হইতে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ থাকিবে। ছুটির পূর্ব্বে ১৩ই বৈশাখ "অচলায়তন" অভিনীত হইয়াছে। তাহাতে আচার্য্য

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আচার্য্যের অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন সাহেবও নাট্যোল্লিখিত শোণপাংশুদের মধ্যে একজন ছিলেন। অভিনয় দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৬ শক। পৃ. ৪২-৪৩

আশ্রম-কথা।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে আশ্রম কথা প্রসঙ্গে মিঃ এণ্ড্রুজ মহোদয়ের বিদেশ হইতে আশ্রমে আগমন উপলক্ষ্যে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পরে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবার কথা ছিল। অতএব তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

"প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার
হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার
হে বন্ধু, গ্রহণ কর, করি নমস্কার।
খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার
হে বন্ধু, প্রবেশ কর, করি নমস্কার।
তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।"

আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে বিগত গ্রীষ্মের ছুটির পর হইতে মিঃ এণ্ড্রুজ আশ্রমের কাজে যোগদান করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি বাংলা শিখিবার জন্য অধিকাংশ সময় যাপন করিতেছেন। রাত্রে বয়স্ক ছাত্রদের সহিত একত্র এক ঘরে বাস করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার দীর্ঘকালের পুরাতন ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু অনিলকুমার মিত্র দিল্লী হইতে আশ্রমের অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছেন।

মিঃ এণ্ড্রুজ ও মিঃ পিয়ার্সন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় কেন গমন করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের মনের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল তাহা মিঃ এণ্ড্রুজ বিগত ১৩ ই আষাঢ়ে একটি সুন্দর বক্তৃতায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম যেদিন মিঃ গোখলের নিকট হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিবার অনুরোধ পত্র পাইলেন তখন তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মতি দান করিলেন। তিনি তখনও জানিতেন না যে তাঁহার বন্ধু পিয়ার্সন সাহেব তাঁহার সহিত যাইবেন। তিনি সম্মতি দিয়া কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। শুধু ভাবিলেন যে যাত্রার পূর্ব্বে তিনি

আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। সেই জন্য জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে তিন চারি দিন আশ্রমে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাইবার সময়ে পূজনীয় আচার্য্যদেবের নিকট হইতে তাঁহার বাণীস্বরূপ কয়েকটি কথা লিখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সেই কয়েকটি কথা তাঁহাদিগকে সমস্ত কাজে সহায়তা করিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ঐ তীব্র দ্বেষানলের মধ্যেও তাঁহারা ঐ বাণী স্মরণ করিয়া শান্তি পাইয়াছিলেন। সেই কয়েকটি কথা হইতেছে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতম্।"

দক্ষিণ আফ্রিকার যে যে সহরে গিয়াছেন—সেই সেই সহরেই তাঁহারা ভারতবর্ষের ঐ বাণী সকলকে স্মরণ করাইবার জন্য বক্তৃতা করিয়াছেন। পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারত-বিদ্বেষী ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষকে কেবলমাত্র "কুলীর দেশ" বলিয়া জানিতেন। বর্ত্তমান সময়ে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি "গীতাঞ্জলি" ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাহার আদর ও খ্যাতি দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদিগকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করিয়াছে। প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের নিকট ইংরাজি "গীতাঞ্জলি" পাওয়া যায়। তাঁহারা "গীতাঞ্জলি"র মধ্য দিয়া ভারতবর্ষকে বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছেন।

মিঃ এণ্ড্রুজ যখন বিলাত হইতে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন তখন বোম্বে হইতে তাঁহার নিকট একটি 'তার' গিয়া উপস্থিত হয়। বিশেষ কাজ থাকায় তাঁহাকে তখনই দিল্লীতে যাইবার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি তাহা পাইয়াও কিছুতেই সর্ব্বাগ্রেই আশ্রমে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চরণকমল হইতে যে অর্ঘ্য তিনি আহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তিনি পুনরায় তাঁহারই পায়ের তলায় না পৌঁছাইয়া দিয়া অন্যত্র কেমন করিয়া যাইবেন? তিনি বলিলেন এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করিয়া তাঁহার যাইবার কথা প্রথমেই মনে হইতে পারে।

ছাত্র-সভা।

বিগত ১৫ই আষাঢ় ছাত্র-সভার এক টারম পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পুরাতন ১৫ জন প্রতিনিধিদিগের কার্য্য সমাপ্ত হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নূতন সাতজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি—আশা করি তাঁহারা সুচারুরূপে কার্য্য চালাইবেন।

এতদিন রাত্রিকালীন আহার ৮টার পরে হইত। সম্প্রতি ঠিক হইয়াছে যে সন্ধ্যার ঠিক পরে সাড়ে সাতটার সময় আহার হইবে। বর্ত্তমান সময়ে আশ্রমে একটি কাপ্-ম্যাচ খেলা হইতেছে। কাপটির নাম "সুহৃৎ-কাপ"। ইহার সহিত আমাদের আশ্রমের প্রিয় বন্ধু ও ভ্রাতা স্বর্গীয় শ্রীমান সুহৃৎকুমার সেনগুপ্তের স্মৃতি বিজড়িত আছে। তাঁহারই নামে এটি উৎসর্গ করা হয়। ১৩১৮ সালের ২২শে পৌষ তিনি বর্দ্ধমানে অকস্মাৎ

ট্রেনের তলায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। ঐ কাপম্যাচটি প্রত্যেক ক্লাশের মধ্যে খেলা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে বা শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে খেলা হইয়া থাকে। গত দুই বৎসর ১৩১৯ সালের ৪র্থ বর্গের ছাত্রগণ ও ১৩২৯ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গের ছাত্রগণ একযোগে জয়লাভ করেন। এবার খেলা আরম্ভ হইয়াছে, কোন্ বর্গ যে কাপ পাইবে তাহার স্থিরতা নাই। কাপ ম্যাচটির সহিত যাঁহার স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে, ভগবানের চরণে তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহার কথা যেন আমরা মাঝে মাঝে স্মরণ করি।

আশ্রমের পূর্ব্বতন ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কলেজে পাঠ করেন—তাঁহারা সম্প্রতি সকলে একত্রে থাকিবার জন্য ২১১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে একটি বাসা ভাড়া করিয়াছেন। তাঁহারা সকলে একত্রে থাকিলে অনেক প্রকার সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশ্রম হইতে যে সব ছাত্র পাশ করিয়াছেন ও করিবেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের কলিকাতায় মেসে থাকিয়া পড়িবার ইচ্ছা আছে তাঁহাদের কাছে এই শান্তিনিকেতন মেস্‌টি খুব অনুকূল স্থান।

শ্রীসুহৃদ্‌কুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রাবণ ১৮৩৬ শক। পৃ. ৮৫-৮৬

ব্রহ্মবিদ্যালয়

আশ্রম কথা। অতিথি সমাগম।

গত মাসে আমাদের আশ্রমে কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির সমাগম হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে সীরিয়া দেশের আরবী কবি শ্রীযুক্ত ওয়াদি এল্ বোস্তানী মিশর দেশ হইতে পূজনীয় আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। (পাণ্ডুলিপি পৃ. ১১৭) পূজনীয় আচার্য্যদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রীতি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" ও "The Gardener" আরবী ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। এই স্থানে তিনি এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই এখানকার গভীর নিস্তব্ধতা তাঁহার প্রাণকে এত নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল যে তিনি সেই রাত্রেই পূজনীয় আচার্য্যদেবের উদ্দেশে একটি ইংরাজি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার একটা নকল আমাদের দিয়া গিয়াছিলেন—কিন্তু অসাবধানতাবশত তাহা হারাইয়া গিয়াছে—তাহার শেষ চরণকয়টি স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"Gitanjali" is the greatest boon
"The Gardener" is my name

And in my heart is "The Crescent Moon",
A "Chitra" with love I frame."

(বোস্তানী নামের অর্থ—মালী এবং তিনি নিজে মুসলমান)

সীরিয়া তাঁহার মাতৃভূমি। কিন্তু সম্প্রতি মিশরদেশে তিনি বাস করিতেছেন। বিগত ১৪ই জুলাই প্রাতে তিনি ছাত্র ও অধ্যাপক মহাশয়গণের সমক্ষে তাঁহার দেশ সম্বন্ধে একটি ছোট বক্তৃতা করিয়াছিলেন—বক্তৃতার পর আরবী ভাষায় বিভিন্ন ছন্দে সুর করিয়া "গীতাঞ্জলি" ও "The Gardener" এর অনুবাদ পাঠ করিলেন—ভাষা কিছু না বুঝিলেও ছন্দের সুর ও পঠনভঙ্গী এত মনোমুগ্ধকর যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। মূল বাংলা কবিতাও কয়েকটি পাঠ করা হইয়াছিল, তিনি তাহার ছন্দ শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

তাঁহার স্বরচিত ছয় সাতখানি আরবী পুস্তক আমাদের গ্রন্থাগারে উপহার দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বোস্তানী ব্যতীত স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরার কোনো বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, জনৈক আমেরিকাবাসী ভদ্রলোক এবং সুইডেনবাসী জনৈক মহিলা আশ্রম পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন।

ছাত্র-সভা।

সম্প্রতি ছাত্র-সভার একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এতদিন আশ্রমের সমস্ত ছাত্র একত্রিত হইয়া আশ্রম পরিচালনা করিতেন। তাহাতে কাজের বিশেষ উন্নতি বা সুবিধা না হওয়ায় পূজনীয় আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে ছাত্র-সভা আদ্য মধ্য ও শিশু এই তিন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই তিনটি সভা "ছাত্র-সভা" নামেই অভিহিত হইবে—কিন্তু ইহার কার্য্য স্বতন্ত্রভাবে সম্পন্ন হইবে—একটির সহিত অন্যটির কোনো বিশেষ সম্বন্ধ থাকিবে না। সকল ছাত্রের মধ্যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করার ব্যাঘাত হইত। আশা করি এই তিনটি স্বতন্ত্র সভা সে ব্যাঘাত দূর করিবে। নিজেদের বিভাগ কিরূপে পরিচালনা করিতে হইবে, কোন্ নিয়মের সংস্কারের প্রয়োজন তাহা ছাত্রগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া স্থির করিবে—তাহাতে কোনো অধ্যাপক মহাশয় উপস্থিত থাকিবেন না।

আশা করা যাইতেছে ইহাতে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপক একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য "আশ্রম-সম্মিলনীর" পুনঃ অধিবেশন নিয়মিতরূপে হইবে।

স্মৃতি-সভা।

বিগত ১৩ই শ্রাবণ পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু সাম্বৎসরিক উৎসবে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাতে পূজনীয় আচার্য্যদেব মন্দিরে উপাসনা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। ক্ষিতিমোহনবাবু বলিয়াছিলেন— "সমস্ত মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছেন—এবং সমস্ত বিশ্বমানবের সমষ্টিই যে স্বয়ং ভগবান সেই বোধটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান ছিল। সেই জন্যই কাশীতে অবস্থানকালে যখন সকলে বিশ্বনাথ দর্শনার্থে গমন করিতে বলিয়াছিল, তিনি স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিয়াছিলেন—আমার পিতাঠাকুর মহাশয়ই স্বয়ং বিশ্বনাথ এবং মাতৃদেবী ভগবতী আমার গৃহে বর্ত্তমান থাকিতে আমি কোন্ বিশ্বনাথের দর্শনার্থ গমন করিব?—তিনি নিজেকে কখনও দেশবাসী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই। সকল সময়ে তিনি সকলের মধ্যে একজন, তাঁহার অবমাননায় সমস্ত দেশ অবমানিত হয়, সকল দেশের অবমাননায় তাঁহার অবমাননা, এইটি তিনি অনুভব করিতেন বলিয়াই যখন শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক তিনি অপমানিত হইলেন—সকল দেশকে সেই অবমাননা হইতে রক্ষা করিতে তাহারই সম্মুখে সর্ব্বজনবন্দিত সেই চটিজুতাশোভিত চরণ তুলিয়া দিতে সঙ্কোচবোধ করেন নাই।

পত্রিকা-উৎসব।

বিগত ঝুলনপূর্ণিমা রজনীতে আশ্রমের ছাত্র-পরিচালিত হস্তলিখিত বাংলা মাসিক পত্র "বাগানের" পঞ্চম বার্ষিক জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত পত্রের পরিচালকগণ বিশেষ কষ্ট সহকারে ও অশেষ পরিশ্রমে সভার আয়োজনে বৈদিক প্রথানুসারে প্রস্তুত হইয়াছিল। শঙ্খধ্বনি, চন্দন তিলক, ধূপধুনা প্রভৃতির দ্বারা সমস্ত সভাগৃহ একটি গভীর ও পূত ভাব ধারণ করিয়াছিল। পূজনীয় আশ্রমাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

কিছুদিন হইল মহারাষ্ট্রীয় দেশের একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সুগায়ক আসিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত পড়াইতেছেন ও গান শিক্ষা দিতেছেন। গায়ক ব্যতীত আরো দুই জন মহারাষ্ট্রদেশীয় ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন সংস্কৃতজ্ঞ শাস্ত্রী; তিনি ছাত্রদিগের সহিত সংস্কৃতে বাক্যালাপ করেন। অন্যজন ছাত্রদিগের সহিত একঘরে গৃহের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষরূপে বাস করিতেছেন। তিনি ছাত্রদিগের দৈনিক নিয়ম পালন ও কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

সাঁওতাল-বিদ্যালয়।

মাঝে কয়েকদিন সাঁওতাল বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল—সম্প্রতি গড়ে ২০/২২ জন ছাত্র আসিতেছে। গ্রামের সেবক সংখ্যা দশজন। পীড়িত ছাত্রের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করা হইতেছে।

গত গ্রীষ্মের ছুটির পর হইতে এযাবৎকাল পর্য্যন্ত মোটের উপর চব্বিশ জন নূতন

ছাত্র আশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তিনজন ছাত্র গুজরাট হইতে আসিয়াছে। শিলং হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত একটি অনাথ খাসিয়া বালক সম্প্রতি আশ্রমে আসিয়াছে।

গত গ্রীষ্মের ছুটির পর ৩০ জন ছাত্র আশ্রমে আসে নাই।

বর্ত্তমানে মোট ছাত্র-সংখ্যা ১৮০। শিক্ষক সংখ্যা ২০ জন।

গত শ্রাবণ মাসের ২৫ তারিখ পর্য্যন্ত মোট ৮.৬৭ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চতম উত্তাপ ৯২° ডিগ্রি। নিম্নতম উত্তাপ ৭৬° ডিগ্রি। আজ কাল বায়ুচক্রশাস্ত্র (meteorology) সম্বন্ধে অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বিশেষ যত্ন লইতেছেন। প্রত্যহ ভারতের অন্যান্য জায়গার বায়ুচক্রশাস্ত্রীয় (meteorological) সংবাদ পত্র এখানে আসিতেছে ৫ম ও ৪র্থ বর্গের ছাত্রগণ নিজেরা তাপমান (Thermometer), বায়ুমান (Barometer), বর্ষমান (Ram-guage) যন্ত্রের সাহায্যে স্থানীয় আবহাওয়া পর্য্যবেক্ষণ করে।

কিছুদিন হইতে নিম্ন বর্গের ছাত্রদিগকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় পর্য্যবেক্ষণ কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন।

ক্রীড়া-সংবাদ।

আমাদের আশ্রমের ফুটবলটিম বর্দ্ধমানের বনবিহারী কাপ ম্যাচে খেলিবার জন্য প্রবেশ করিয়াছেন। শীঘ্রই প্রথম ম্যাচ খেলা হইবে—ফলাফল পরে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীসুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভাদ্র ১৮৩৬ শক। পৃ. ১০২-১০৪

আশ্রম-কথা।

অতিথি-সমাগম।

গত মাসে হরিদ্বারের গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে সেইখানকার জনৈক অধ্যাপক আমাদের আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের মধ্যে চারি দিন অতিবাহিত করিয়া দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ দেখিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন। গুরুকুল আশ্রম ও আমাদের আশ্রম একই পথের যাত্রী—দুই আশ্রমেরই লক্ষ্য প্রায় এক। তিনি আমাদের কোনো সভায় উপস্থিত ছিলেন সেইখানে এই আশ্রমের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাইয়াছিলেন। গুরুকুলের অধ্যাপক মহাশয় ব্যতীত মান্দ্রাজের সুদূর তাঞ্জোর প্রদেশ হইতে দুই জন অতিথির শুভাগমন হইয়াছিল।

আশ্রম-সম্মিলনী।

গত মাসে আশ্রম-সম্মিলনীর একটি অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় বিশেষ কিছু স্থির হয় নাই—কেবল মাত্র কি প্রণালীতে ঐ সভা পরিচালিত হইবে তাহার জন্য একটি অস্থায়ী সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা যে সকল ব্যবস্থা স্থির করেন, তাহা আগামী সভায় আলোচিত হইয়া গ্রহণ করা হইবে। ছাত্রসভার কাজ মন্দ চলিতেছে না।

সাহিত্য-সভা।

ছাত্রগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরাজি ও বাংলা সাহিত্য-সভার নিয়মিত অধিবেশন হইতেছে। গত বাংলা সাহিত্য-সভায় একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় জনসাধারণে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে আমাদিগের কি কর্ত্তব্য ও পল্লীসমূহের কি অবস্থা এই বিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধটি এবারকার "তত্ত্ববোধিনী"তে প্রকাশিত হইবে। ছুটি আসন্ন—ছাত্রগণ নিজের নিজের পল্লীতে গিয়া ঐ বিষয়ে কোনো উন্নতি করিতে পারেন কি না—সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করিবার পক্ষে ঐ প্রবন্ধ বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল।

পত্রিকা-উৎসব।

গত মাসে আমরা "বাগান" পত্রিকার জন্মোৎসবের কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম। এবার গত ১৫ই ভাদ্র "বীথিকা" মাসিক পত্রিকার চতুর্থ বার্ষিক জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহে হইয়া গিয়াছে। আজকাল আশ্রমে যে সব বিশেষ সভার অধিবেশন হইতেছে—তাহার প্রত্যেকটি হইতে বিজাতীয় অনুকরণ টেবিল চেয়ারকে বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের দেশীয় প্রথানুসারে মৃত্তিকা-বেদি, আলপনা, চন্দন, ধূপ, ধূনা, পদ্ম, পদ্মপর্ণ প্রভৃতি আমাদিগের দেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক চিহ্নগুলিকে বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে এই প্রথা দেশময় বিস্তার লাভ করিলে সভা-সমিতি একটি পূতভাব ধারণ করিবে।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় ঐ সভার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সভায় গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে আগত অধ্যাপক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সভাগৃহের সুশোভন সজ্জিত শ্রী দেখিয়া বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

আগামী ৭ই আশ্বিন হইতে ১৩ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে। ১৪ই কার্ত্তিক হইতে কার্য্য আরম্ভ হইবার কথা। এবার ছুটির পূর্ব্বে "শারদোৎসব" এবং এর

দুই একটা দৃশ্য অভিনীত হইবে।

শ্রদ্ধাস্পদ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদ্যালয়কে একটি বহুমূল্য অণুবীক্ষণ দান করিয়াছেন। তাহার সমস্ত সরঞ্জাম সমেত প্রায় তিন হাজার টাকা দাম হইবে। তাঁহার নিকট আমরা ইহার জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

জল বায়ু।

গত ২৬শে শ্রাবণ হইতে ২৫শে ভাদ্র পর্য্যন্ত মোট ৫.৫৬ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে। বাতাস অধিকাংশ সময় দক্ষিণ পুর্ব্বদিক হইতে প্রবাহিত হইতেছে। উচ্চতম উত্তাপ ৯৫° ডিগ্রি ও নিম্নতম উত্তাপ ৭৫° ডিগ্রি।

ক্রীড়া-সংবাদ।

বর্দ্ধমানের বনবিহারী কাপ্‌ম্যাচে আশ্রম টীম প্রবেশ করিয়াছিল—প্রথম দিন বর্দ্ধমানে খেলা হইয়াছিল—কোন পক্ষই জয়লাভ করে নাই—কিন্তু কোনো কারণে তাহার পরে ঐ ম্যাচ আর খেলা হয় নাই।

ইহার পর চুঁচুঁড়া, জামালপুর ও রামপুরহাট হইতে তিনটি টীম খেলিতে আসিয়া হারিয়া গিয়াছেন। এ ছুটিতে আর কোনো ম্যাচ খেলা হইবে না।

আশ্রমের নূতন রান্নাবাড়ি ও ভোজনালয়ের গাঁথনি সুরু হইয়াছে—আশা করা যাইতেছে তাহা পূজার ছুটির মধ্যে সমাপ্ত হইবে।

শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আশ্বিন-কার্তিক ১৮৩৬। পৃ. ১২৮-১২৯

আশ্রম-কথা।

শারদীয় পূজার অবকাশের পর বিগত ১৪ই কার্ত্তিক হইতে বিদ্যালয়ের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। গতমাসের 'তত্ত্ববোধিনী'তে আশ্রমকথা প্রসঙ্গে "শারদোৎসব" অভিনীত হইবে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল—কিন্তু নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। কয়েকটি ছোট ছোট ব্যঙ্গনাটিকা, আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রভৃতি ছাত্রগণ করিয়াছিলেন। এণ্ড্রুস সাহেব কর্ত্তৃক শিক্ষিত ছাত্রগণ সেক্সপীয়ারের "A Mid Summer Night's Dream" এর দুইটি দৃশ্য অভিনয় করিয়াছিলেন।

আশ্রমের অধ্যাপক মহাশয়গণ এবারকার ছুটিতে নানা স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় গৌহাটী, সারা, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে "মীরাবাঈ" "কবীর", "রামানন্দ" প্রভৃতি

সাধকগণের জীবন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে একদিন "গীতি-মাল্যের" উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়দিন 'ধর্ম্ম ও স্বদেশপ্রেম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় তাঁহার স্বগ্রামে (তারপাশা, বরিশালে) দুইটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁহার দেশে "দক্ষিণ চাঁদপুর-সম্মিলনীর" যুবকদের সহিত মিলিত হইয়া নিম্নশ্রেণীর মধ্যে লোকশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আশ্রমের পূজনীয় আচার্য্যদেব এবার ছুটির শেষভাগে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বুদ্ধগয়াতে গিয়াছিলেন। তাহার পর গয়া হইয়া এলাহাবাদ, আগ্রা ও দিল্লী অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। সব জায়গায় জনসাধারণ তাঁহাকে সসম্মানে বরণ করিয়া লইয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। তাঁহাকেও কয়েক স্থানে দুই একটি বক্তৃতা প্রদান করিতে হইয়াছিল।

সর্ব্বত্যাগী লোকহিতব্রত শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি মহাশয়ের ফিনিক্সে যে বিদ্যালয় ছিল—তাহার কতিপয় ছাত্র ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গান্ধি মহাশয় এখন ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন—তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১৬ জন ছাত্র আশ্রমে থাকিবেন। তাঁহারা লবণ, ঝাল, মিষ্টি প্রভৃতি কিছুই খাননা—কেহ কেহ দুধ, ঘি পর্য্যন্তও খান না। আশ্রমের সকল কাজে তাঁহারা নিয়মিত যোগদান করিতেছেন। তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের অভিভাবকরূপে শ্রীযুক্ত গান্ধি মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মগনলাল গান্ধি মহাশয় ও আর একজন অধ্যাপক মহাশয় এস্থানে অবস্থান করিতেছেন। উক্ত বালকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত গান্ধি মহাশয়ের তিনটি পুত্র আছেন।

য়ুরোপীয় সমরানলের শিখা আমাদের ঘরের দরজায় আসিয়া লোলজিহ্বা প্রসারিত করিতেছে। এই যুদ্ধের জন্য আজ পূর্ব্ববঙ্গের কত ঘরে যে অন্নাভাবে সহস্র সহস্র লোক কষ্ট পাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পাট ব্যবসায়ীগণ পাটের দর কমিয়া যাওয়াতে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ পাটের কারখানা প্রভৃতিতে চাকুরীর অভাবে, জমিদারগণ পাওনা খাজনা প্রাপ্তির অভাবে—অতিকষ্টে দিন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইতেছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে উদ্ধৃত করা সম্ভবপর নয়—সুধীজন মাত্রেই এ বিষয় অবগত আছেন।

আমাদের বিদ্যালয়ে পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলের ছাত্র অধিক। তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজের দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। দেশবাসীর সেই ভীষণ অবস্থা আলোচনা ও সেই বিষয়ে আমাদের কি করণীয়—তাহা বিচার করিবার নিমিত্ত গত ২২ কার্ত্তিক ১৩২১ একটি সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন সাহেব, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় যথাক্রমে দেশের যথার্থ অবস্থা কি তাহা বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পান।

শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন সাহেব বলেন যে কর্ত্তব্য জিনিষটি বড় শক্ত বিষয়—যথার্থ কর্ত্তব্য কি তাহা আমরা সকল সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তিনি বিখ্যাত স্বদেশসেবী ম্যাট্‌সিনির একটি উক্তি উল্লেখ করিয়াছিলেন—উক্তিটি এই—

"Life is immortal ; but the method and time of evolution through which it progresses is in our own hands. Each of us is bound to purify his own soul as a temple, to free it from selfishness ; to set before himself, with a religious sense of the importance of the study, the problem of his own life ; to search out what is the most striking, the most urgent need of the men by whom he is surrounded, then to interrogate his own faculties and capacity, and resolutely and unceasingly apply them to the satisfaction of that need...Young brothers, when once you have conceived and determined your mission within your soul, let nought arrest your steps. Fulfil it with all your strength ; fulfil it, whether blessed by love or visited by hate ; whether strengthened by association with others, or in the sad solitude that almost always surrounds the martyrs of thought. The path is clear before you ; you are cowards, unfaithful to your own future, if, in spite of sorrows and delusions, you do not pursue it to the end."

আমাদের সম্মুখেও তেমনি আজ পূর্ব্ববঙ্গের দুঃখের দিনে সাহায্য করিবার কর্ত্তব্য আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাকে সমস্ত অন্তরের সহিত আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় পূর্ব্বোক্ত বক্তা মহাশয়ের কথা সমর্থন করিয়া বলেন যে ঐ বিষয়ে আমাদের সকলেরই উৎসাহ প্রদর্শন করা উচিত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়, তাঁহার স্বগ্রামবাসীর অবস্থা নিজচক্ষে যেরূপ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বিস্তৃতভাবে সমস্ত অবস্থাটি বুঝাইয়া দিয়া অবশেষে বলেন,—"এই দুর্দ্দিনে সমস্ত প্রজার দুঃখ দূর করিবার মত শক্তি আমাদের নাই—কিন্তু আমরা আর্থিক বা অন্য কোনো প্রকারে তাহাদের সাহায্য করিতে না পারিলেও যদি তাহাদের জন্য মনে কষ্ট অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট। আজ যে শত শত লোক অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে—তাহা যেন প্রত্যহ স্মরণ করিয়া তাহাদের জন্য অশ্রুজল ফেলিতে পারি। বিদ্যাসাগর, এক দিনে বিদ্যাসাগর হন নাই। তিনি শৈশব হইতেই বিধবা নারীর দুর্দ্দশা, স্বজাতির দুর্দ্দশাকে নিজের দুর্দ্দশার সামিল করিয়া

অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই—তিনি সহস্র সহস্র টাকা উত্তর কালে দুই হাতে দান করিতে পারিয়াছিলেন। তোমরা জান, কি করিয়া তিনি তোমাদের মত বয়সে কত দুঃখ কষ্টের মধ্যে অন্যকে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি রাত্রি দিন পরিশ্রম করিয়া সাংসারিক কাজকর্ম্ম ব্যতিরেকে দৈনিক পাঠাদি প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষার প্রথম হইয়া বৃত্তি পাইয়াছেন—এবং সেই দারিদ্র্যের মধ্যেও সেই বৃত্তির টাকা সহপাঠী দরিদ্র ছাত্রগণের সাহায্যার্থ ব্যয় করিয়াছেন। সেই জন্য বলিতেছি—এখন হইতে তোমাদের অনুভব করিবার শক্তি জাগ্রত হওয়া চাই—মৃত জড়পিণ্ডের মত হৃদয় হইয়া গেলে অনুভূতির শক্তি থাকে না। কোনো রকমে সাহায্য করিতে না পারিলেও প্রত্যহ অন্নগ্রাস মুখে তুলিবার পূর্ব্বে যেন আমাদের স্বদেশবাসীর এই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করি।"

এই বিপদের দিনে অর্থের অভাবে অনেক দরিদ্র বালকের পাঠাদি ত্যাগ করিতে হইয়াছে—আমাদের আশ্রম হইতে কিছু টাকা তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। সেই অর্থের দ্বারা দরিদ্র বালকগণের পাঠের সাহায্য করা হইবে এরূপ স্থির করা হইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ড।

বিগত ২২ কার্ত্তিক সন্ধ্যার পর অদূরবর্ত্তী ভুবনডাঙ্গা গ্রামে একটি গোহাল-গৃহে হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়। আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ গিয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। সেই জ্বলন্ত গৃহের পাশেই ধানের গোলা ছিল—সেইটি রক্ষা পাইয়াছে—তাহাতে অনেকের জীবনধারণের সংস্থান বাঁচিয়াছে।

শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেব সম্প্রতি অসুস্থ হইয়া দিল্লীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার আসিতে এখনও দিন পনের বাকী আছে। বিদ্যালয়ের কার্য্যের ক্ষতি হইবে বিবেচনা করিয়া তাঁহার ছাত্র শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি পাঠাইয়া দিয়াছেন। এণ্ড্রুজ সাহেব সুস্থতালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলে সম্ভবতঃ হরিমোহন বাবু ফিরিয়া যাইবেন।

৭ই ও ৮ই পৌষের উৎসব—সন্নিকট। আশ্রমের পূর্ব্বতন ছাত্র ও অধ্যাপক মহাশয়গণ ঐ উৎসবে যোগদান করিলে বিশেষ প্রীত হইব।

L. M. S. Collegeএর Principal, Mr. Warren নামে একজন বিদেশী ভদ্রলোক আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

আজকাল নূতন ছাত্র আশ্রমে আর লওয়া হইতেছে না। অনেক আবেদন পত্র আসিতেছে—কিন্তু স্থানাভাব হেতু সে সকল গ্রাহ্য করা হইতেছে না।

শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

পৌষ ১৮৩৬ শক। পৃ. ১৬৫-১৬৬

শান্তিনিকেতন

আশ্রম-বিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণী।

(৮ই পৌষ বার্ষিক সভায়—অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক পঠিত ১৩২০-২১)

আজ আমাদের আশ্রম-বিদ্যালয় ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করিল। যে আশ্রম-দেবতার কৃপায় আমরা গত এক বৎসর কাল নিরাপদে চলিতে পারিয়াছি, নববর্ষের আরম্ভে তাঁহাকে আমরা বার বার প্রণাম করি। অদ্যকাল প্রভাতটি যেমন নির্ম্মল, শুভ্র ও উজ্জ্বল আমাদের সম্মুখের বৎসরটি যেন সেই রকম সুন্দর ও কুহেলিকাহীন হয়।

যে সব তরুণ ব্রহ্মচারী আশ্রমজননীর ক্রোড়ে পালিত হইতেছে, তাহাদের বাক্য মধুময় হউক, ব্যবহার শিষ্ট হউক, অন্তঃকরণ নিষ্কলুষ হউক, হৃদয় নির্ভীক হউক, তাহাদের মুখে সত্যের জ্যোতি ফুটিয়া উঠুক।

আশ্রমের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া আমরা যে কয়েকজন এখানে সমবেত হইয়াছি, আমরা সকলেই যেন এই ব্রতের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারি,—স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, গর্ব্ব ও অভিমান আমাদিগকে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে না পারে। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের যে দুর্লভ সাহচর্য্য আমরা সৌভাগ্যক্রমে লাভ করিয়াছি তাহা যেন বৃথা না হয়। ভগবান আমাদের সহায় হউন।

আশ্রমের যে সব পুরাতন ছাত্রের উদ্যোগে আজ এই সভা আহুত হইয়াছে, আজ হয়ত নানা কারণে তাঁহারা সকলে সভাস্থানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আশ্রমে পালিত বলিয়া তোমরা যে গৌরব অনুভব কর, তাহা যেন বৃথা না হয়,—আশ্রমের সহিত তোমাদের যোগের বন্ধন দিন দিন দৃঢ়তর হউক। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছ এবং কেহ কেহ হয়ত সংসারক্ষেত্রে পদার্পণের আয়োজন করিতেছ,—তোমাদের পূজনীয় গুরুদেব যে আদর্শ তোমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, সংসারে নামিলে সেই আদর্শ যেন তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে না যায়। পুত্র কৃতী হইলে মাতাপিতার মনে যে আনন্দ হয়, তোমাদের কর্ম্ম এবং তোমাদের ব্যবহার আশ্রমোচিত হইতেছে দেখিয়া তিনি সেই রকম আনন্দলাভ করেন, ইহা আমরা নানা সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তোমরা বিদ্যায়, জ্ঞানে ও কর্ম্মে আশ্রমের মুখোজ্জ্বল কর, অদ্যকার পুণ্য ভগবানের নিকটে এই নিবেদন করিতেছি।

আশ্রম-বালকগণের যে অভিভাবকবর্গ এবং আশ্রমের হিতকামী অন্যান্য যে মহোদয়গণ নানা সুপরামর্শ দিয়া আমাদের কর্ম্মকে সহজ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে এই সুযোগে আজ আমরা কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। আশ্রমের প্রতি তাঁহাদের স্নেহদৃষ্টি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, এই প্রার্থনা।

পনেরো বৎসর পূর্ব্বে ছয়টি তরুণ ব্রহ্মচারীকে লইয়া ঠিক এই রকম যে একটি

দিনে আমাদের আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজ মনে পড়িতেছে। তখন আশ্রমের পারিবারিক গণ্ডী খুবই সঙ্কীর্ণ ছিল,—দশ বারোটি ছাত্র ও অধ্যাপক লইয়াই ছিল তখনকার আশ্রম। আশ্রমের সুখ দুঃখ এই ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও, আশ্রমজননী সমগ্র দেশকে নিজের ক্রোড়ে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই চেষ্টা সার্থক হইয়াছে! এখন আশ্রমের আর সে মূর্ত্তি নাই,—সমগ্র বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলার একাধিক পরিবার আশ্রমের পারিবারিক গণ্ডীর ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। দূর সিন্ধু বোম্বাই, এবং মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের বালকেরাও এখন আমাদের আশ্রমের ছাত্র। পরিবার বৃহৎ হওয়ার যে আনন্দ তাহা আমরা উপভোগ করিতেছি ; ভাব ও চিন্তার আদানপ্রদান করিয়া এবং পরস্পরকে চিনিয়া, যাহা লাভ করা যায়, তাহাও আমরা পূর্ণমাত্রায় পাইতেছি। কিন্তু পারিবারিক সুখের সঙ্গে পারিবারিক বেদনাগুলিকেও আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে।

প্রিয়দর্শন প্রিয়ভাষী আশ্রমশিশু শ্রীমান অমৃতলালের মৃত্যুতে এবং আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে আমরা গত বৎসরে সেই বেদনা তীব্ররূপে অনুভব করিয়াছি। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীমান্ অমৃতলাল রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া কেবল আশ্রমের কথা বলিয়াছিল এবং মৃত্যুর সময়ে সে আশ্রমের উপাসনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল। বালকের শোকাতুর পিতার পত্রে আমরা ইহা জানিয়াছিলাম। সত্যজ্ঞান বাবু অতি অল্পদিনই আশ্রমের সহিত যুক্ত ছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি নিজের মধুর স্বভাবের গুণে ও কর্ম্মকুশলতায় সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে পারিবারিক কারণে তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের আশা ছিল ভবিষ্যতে তিনি আশ্রমের কার্য্যে আবার নিযুক্ত হইবেন। যখন সত্যজ্ঞান বাবু সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় নিঃসহায় অবস্থায় কলিকাতায় ছিলেন, সেই সময়ে কলিকাতা প্রবাসী আমাদের কয়েকজন পুরাতন ছাত্র নিজেদের স্বাস্থ্য ও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহার যে প্রকার সেবা করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাহারও উল্লেখ করিতেছি। আমাদের এই কয়েকটি ছাত্রের কর্ম্ম তাঁহাদের আশ্রমবাসী ভ্রাতৃবর্গের সুদৃষ্টান্তস্বরূপ হউক।

অধ্যাপক-পরিবর্ত্তনাদি।

আশ্রমবিদ্যালয়ের অধিকাংশ স্থায়িভাবে আশ্রমের সেবায় নিযুক্ত আছেন। তথাপি নানা অনিবার্য্য কারণে গত বৎসরে কয়েকজন আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরাজির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চুনিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত চারি বৎসর যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনার কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। গত বৎসর ইনি আশ্রমের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায় এবং ইংরাজির অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়দ্বয় বৎসরাধিক কাল আশ্রমের

কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া গত বৎসরে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। ইহারা সকলেই কর্ম্মনিষ্ঠ এবং সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন রায় আশ্রমের শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ করিয়া গত বৎসরে আশ্রমের চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের সহকারিরূপে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিদেশ গমন করিয়াছেন, আজও তাঁহার স্থানে কেহ নিযুক্ত হন নাই।

নূতন অধ্যাপকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত সি. এফ্. এনড্রুজ এবং ডবলিউ. ডবলিউ. পিয়ারসন্ সাহেবের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের ন্যায় সুপণ্ডিত উদারচরিত্রের অধ্যাপকগণকে যে আমরা কখনো আশ্রমে পাইব, একথা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা কখনই মনে করিতে পারি নাই। তাঁহাদের অত্যাশ্চর্য্য ত্যাগস্বীকার আমাদের সকলের দৃষ্টান্তস্বরূপ হউক। আজ বার বার তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

গত বৎসরের প্রারম্ভে একজন ইংরাজি ও একজন সংস্কৃতের অধ্যাপকের স্থান শূন্য ছিল। শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন রায়, এম. এ. বি. টি. ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয় সেইস্থান পূর্ণ করিয়াছেন। প্রমোদ বাবুর ন্যায় সহৃদয় সুযোগ্য শিক্ষককে পাইয়া আশ্রম নানাপ্রকারে লাভবান হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত অনিলকুমার মিত্র মহাশয় গণিতের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজাঙ্গম আয়ার এবং শ্রীযুক্ত চিন্তামণি শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় গত বৎসরে আশ্রমের অধ্যাপনা কার্য্যে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। ইহারা উভয়েই মহারাষ্ট্র দেশবাসী,—দূর বাংলাদেশে আসিয়া তাঁহারা আশ্রমের সেবাকার্য্যে নিরত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকটে আজ আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

গত বৎসরে কয়েক মাসের জন্য দুইজন পঞ্জাবী গায়ক আশ্রম বালকদিগের সঙ্গীতশিক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা আশ্রম ত্যাগ করিলে, মহারাষ্ট্রদেশীয় শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় সঙ্গীত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি সংস্কৃত ভাষাতেও সুপণ্ডিত,—শিশু ছাত্রদের সংস্কৃত-শিক্ষা দিবার ভার ইহার উপরে অর্পিত হইয়াছে। কথোপকথনচ্ছলে ইনি সংস্কৃত শিক্ষা দিতেছেন। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও গত বৎসরে বালকগণকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন নিজের শিক্ষার জন্য গত দুই বৎসর কাল আশ্রমে ছিলেন না। গত বৎসরের শেষে তিনি আবার আশ্রমের কার্য্যে যোগ দিয়া অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গত বৎসরে কাপ্তেন পেটাভেল্ ও তাঁহার পত্নী কিছু দিন আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। আশ্রম-বিদ্যালয়ের ইংরাজি অধ্যাপনায় ইঁহাদের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। আজ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গত বৎসরের শেষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বালকদিগকে বৈজ্ঞানিক কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে শিক্ষাদান-কার্য্য ভালো করিয়া চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃষিতত্ত্বের সহিত উদ্ভিদতত্ত্বের শিক্ষা দিবারও আয়োজন হইতেছে। শ্রীযুক্ত পিয়ারসন্ সাহেব এবং সন্তোষচন্দ্র মজুমদার কৃষিবিভাগের অধ্যাপনা কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন।

গত বৎসরে চব্বিশ জন অধ্যাপক এবং তিন জন কর্ম্মচারী আশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

শিক্ষাদান-প্রণালী।

গত বৎসরে ভাষাশিক্ষাদান-প্রণালীর কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। কথোপকথনচ্ছলে যাহাতে বালকেরা ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, তৎপ্রতি অধ্যাপকগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদান কার্য্য এই ব্যবস্থায় সহজ হইয়া আসিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত নানা চিত্তাকর্ষক পুস্তক বিদ্যার্থীদিগকে তাড়াতাড়ি পড়াইয়া, অধ্যাপকগণ বালকদিগের ভাষাজ্ঞান জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতেও সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয় গল্পের ও খেলার ভিতর দিয়া যাহাতে বিদ্যার্থীরা আনন্দের সহিত সহজে আয়ত্ত করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা গত বৎসরে ছিল। ইহাতেও আমরা শুভ ফল পাইয়াছি। বালকদিগের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণকার্য্যও গত বৎসরে চলিয়াছিল। ইংরাজির অধ্যাপনার উপরে শ্রীযুক্ত পিয়ারসন সাহেব এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গত বৎসরে আশ্রমের চারিটি ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল। সকলেই ভালো হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা।

গত বৎসরে আশ্রম বালকদিগকে স্বয়ং আচার্য্য—রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্ম ও নীতি-সম্বন্ধীয় উপদেশাদি দান করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এবং শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় প্রভৃতি ইহার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ স্মরণীয় দিনে খৃষ্ট, বুদ্ধ, নানক, রাজা রামমোহন এবং মহর্ষিদেব প্রভৃতি জীবনী আলোচনা করা হইয়াছে এবং মন্দিরে উপাসনাদি হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠানাদি।

গত বৎসরে আশ্রম বালকগণ পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য নিজেরা নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে এবং আশ্রমের নিকটবর্ত্তী সাঁওতাল অধিবাসীদের হিতকল্পে একটি বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। বালকদিগের প্রতিষ্ঠিত ইংরাজি বাংলা তর্ক-সভা (Debating clubs) এবং হস্তলিখিত ইংরাজি বাংলা পত্রিকাগুলির কাজও ভালো চলিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, কালীমোহন ঘোষ

এবং জগদানন্দ রায় মহাশয়গণ সান্ধ্যসম্মিলনে নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া বালকদিগের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন।

গত বৎসরে “অচলায়তন” ও “Midsummer Night’s Dream” এর কিয়দংশ আশ্রম-বালক এবং অধ্যাপকগণ অভিনয় করিয়াছিলেন।

বালক ও অধ্যাপকদিগের মাসিক সাহায্যে ও আগন্তুক মহাশয়গণের দানে আশ্রমে যে “সেবা-ভাণ্ডার” প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার কার্য্য সুচারুরূপে চলিয়াছিল। এই ভাণ্ডার হইতে দরিদ্র বিদ্যার্থী, অসহায় বিপন্ন অন্ধ খঞ্জ, ও রুগ্নগণ কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়দ্বয়ের যত্নে ও উৎসাহে এই প্রতিষ্ঠানটির ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে। কয়েকটি আশ্রম বালকও সেবাভাণ্ডারের জন্য প্রচুর শ্রম করিয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গত বৎসরেও অধ্যাপক ও বালকগণ দলবদ্ধ হইয়া নানা স্থান ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। পরেশনাথ পাহাড়, ঝরিয়ায় কয়লার খনি, বক্কেশ্বরের উষ্ণপ্রস্রবণ এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের নানা দর্শনীয় স্থান ইঁহারা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

আশ্রমের চারিদিকের গ্রামগুলির সহিত যোগরক্ষা করিবার জন্য অধ্যাপক ও বালকগণ এবং আশ্রমের সুযোগ্য চিকিৎসক মহাশয় যথেষ্টা চেষ্টা করিয়াছেন। কয়েকটি ছাত্র নিয়মিতভাবে গ্রামের বালকগণকে শিক্ষাদান করিয়াছে। কয়েক জন অধ্যাপক মহাশয় ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। শ্রীমান্ কালিদাস দত্ত, জ্যোতিষচন্দ্র রায়, সুশীলচন্দ্র সেন প্রভৃতি বালকবৃন্দ তাঁহার সহকারিরূপে শ্রম করিয়াছে।

আশ্রমবালকদিগের ক্রীড়ার ব্যবস্থাদির ভার শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপরে ছিল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ক্রীড়াদি গত বৎসরে ভালই চলিয়াছিল। আশ্রম বালকগণ বাহিরের কয়েক দল ফুটবল ক্রীড়কের সহিত খেলা করিয়াছিল এবং সকল খেলাতেই জয়লাভ করিয়াছিল। সিউড়ী প্রদর্শনীর সংসৃষ্ট ক্রীড়াতে আশ্রম বালকগণই অধিকাংশ পুরস্কার লাভ করিয়াছিল।

ছাত্র-পরিচালনায় প্রায় সকল ভারই গত বৎসরে আশ্রম বালকদের উপরে ন্যস্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগে এক একটি ছাত্রসভা ছিল। এই সকল সভার সাহায্যে ছাত্র পরিচালনা সহজ হইয়াছিল। সমগ্র আশ্রম বালকদের প্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত “আশ্রম সম্মিলনী” নামক আর যে একটি সভা আছে, তাহাও ছাত্র পরিচালনা কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

ছাত্র।

বাংলা দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশ হইতে অনেক বিদ্যার্থী আশ্রমে সমবেত হইয়াছেন। বোম্বাই, নেপাল, দক্ষিণ মালবার, সিন্ধু, গুজরাট, শিলং ও খাসিয়া পাহাড়

প্রভৃতি স্থান হইতে আমরা ছাত্র পাইয়াছি। গত বৎসরে কলিকাতা-নিবাসী ছাত্রদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। আশ্রম-বাসী ছাত্রদের নিবাসের উল্লেখ করিয়া নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হইল,—

কলিকাতা	৩৩
ত্রিপুরা	৩১
ঢাকা	১৪
ময়মনসিংহ	১২
পাবনা	৯
শ্রীহট্ট	৯
উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব	৭
নদীয়া	৬
বর্দ্ধমান	৫
বাখরগঞ্জ	৪
দারজিলিং ও নেপাল	৪
আসাম	৪
২৪ পরগণা	৪
ভাগলপুর	৩
গুজরাট	৩
বোম্বাই	২
মুরসিদাবাদ	২
ছোটনাগপুর	২
খুলনা	২
জয়পুর (রাজপুতানা)	২
যশোহর	২
মেদিনীপুর, মান্দ্রাজ, মালদহ, হুগলি, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম, সিন্ধু প্রত্যেক স্থানে	১

গত বৎসরের শেষ ছাত্র সংখ্যা ১৬৭ ছিল। গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এই সংখ্যা ২২ জন পরিমাণে কম। গত বৎসরের শেষভাগে নূতন ছাত্র গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়াই ছাত্রসংখ্যার এই হ্রাস দেখা যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত মোহনলাল গান্ধি মহাশয় দক্ষিণ-আফ্রিকায় কয়েকজন ভারতবাসী ছাত্রকে লইয়া একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আফ্রিকা ত্যাগ করার পরে, সেই বিদ্যালয়ের কুড়ি জন ছাত্র ও শিক্ষক আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেছেন

এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন। ইহাদের কর্ম্মনিষ্ঠা ও শ্রমসহিষ্ণুতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণ আমাদের আশ্রম-বালকদিগের সুদৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছে।

ছাত্রবেদন।

পূর্ব্বোক্ত ১৬৭ জন ছাত্রের মধ্যে কেবল ৮১ জনের নিকট হইতে আমরা পূর্ণ বেতন মাসিক কুড়ি টাকা পাইয়াছি। ২৪ জন আঠারো টাকা, ৬ জন সতেরো টাকা, ২ জন ষোল টাকা, ১৭ জন পনেরো টাকা, ৬ জন তেরো টাকা, ৩ জন বারো টাকা, ২ জন দশ টাকা এবং ১ জন পাঁচ টাকা হিসাবে বেতন দিয়াছে। আশ্রমে ২৫ জন অবৈতনিক ছাত্র আছে।

গত বৎসরের শেষ হইতে পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে পাট বিক্রয় বন্ধ হওয়ায় ঐ অঞ্চলের অনেক অভিভাবক যথা সময়ে বেতন দিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বেতন হ্রাসের জন্যও অনুরোধ করিয়াছিলেন। অবস্থা বুঝিয়া কোনো কোনো স্থলে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়াছে। ইহাতে গত বৎসরের শেষ হইতে আর্থিক অবস্থা মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। সকল ছাত্র পূর্ণ বেতন দিলে ছাত্র-বেতনের মোট মাসিক আয় ৩৩৪০ হইত, কিন্তু উপস্থিত ইহা হইতে ২৫৬২ টাকার অধিক পাওয়া যাইতেছে না। ছাত্র বেতন হইতে প্রাপ্ত টাকা লইয়া হিসাব করিলে দেখা যায়, শতকরা ৩৮ জন করিয়া ছাত্র অবৈতনিকরূপে আশ্রমে আছে। আশ্রমের মাসিক গড় সর্ব্ববিধ ব্যয় সাড়ে চারি হাজার টাকার উপর।

বিবিধ।

গত বৎসরে আশ্রম-বালকদিগের স্বাস্থ্য মোটের উপরে ভালই ছিল। বৎসরের শেষে কয়েকটি ছাত্র পান-বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছে। সংক্রামক-ব্যাধিগ্রস্তদের একটু পৃথক স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করার খুব ভালো ব্যবস্থা আজও করিতে পারা যায় নাই। সম্প্রতি জনৈক দাতা সংক্রামক-ব্যাধিগ্রস্তদের জন্য একটি পৃথক গৃহ নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় বহন করিবেন বলিয়া আমাদিগকে আশা দিয়াছেন। গৃহনির্ম্মাণকার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

আশ্রম গোষ্ঠ শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল। গত বৎসরে কতকগুলি নূতন গাভী ও মহিষ ক্রয় করা হইয়াছিল, ইহাতে এ পর্য্যন্ত দুগ্ধের অভাব হয় নাই। আশ্রম-পালিত বলদ ও মহিষ দ্বারা এখন তিনখানি গাড়ী চলিতেছে।

অন্যান্য বৎসরের তুলনায় গত বৎসরে আশ্রমে অতিথির সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। ছাত্রদিগের অভিভাবক ছাড়া কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিও আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। দিল্লী কলেজের অধ্যাপক লরেন্স ও ইয়ং সাহেব, হাজারিবাগ কলেজের টমসন্ সাহেব, স্কটল্যাণ্ডের জনৈক শিক্ষক ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব, বাহা ধর্ম্মপ্রচারিকা

মিসেস ষ্টানার্ড, মিশরদেশবাসী কবি মিঃ বোস্তানি, বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের সভ্য শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল ও পূর্ণানন্দ স্বামী, আমেরিকাবাসী মার্শেল সাহেব প্রভৃতি আশ্রমে আসিয়াছিলেন।

মাঘ ১৮৩৬ শক। পৃ. ১৭৮-১৮২

আশ্রমে শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী।

সত্যনিষ্ঠ ও কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত গান্ধীমহাশয়ের অভ্যর্থনার জন্য তাঁহার আগমনের প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে আমাদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। যাঁহার নেতৃত্বে অশিক্ষিত দিনমজুর সম্প্রদায়ও আত্মসম্মানের জন্য বিদেশে থাকিয়া, দিনের পর দিন অসহ্য উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও, অন্যায়কে দমন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে, যাঁহার অদম্য শক্তি সমগ্র আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসীদিগকে অন্যায়ের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার জন্য প্রস্তুত করিল, তাঁহাকে সপত্নীক আশ্রমে দেখিতে পাওয়া যাইবে এই আনন্দে আমরা অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। যে দিন তার আসিল, যে গান্ধী মহাশয় সপত্নীক ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আশ্রমে আসিতেছেন—সমগ্র আশ্রমে সে দিন আনন্দের ধূম পড়িয়া গেল। আশ্রমের ছাত্রদল অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে, তাঁহার অভ্যর্থনা যাহাতে সুচারুরূপে ও ভারতীয় রীত্যনুসারে হয়, তাহার আয়োজন করিতে লাগিল। অভ্যর্থনার পূর্ব্বদিন রাত্রি, সাড়ে ১২ ও তৎপূর্ব্ব দিন রাত্রি ১টা ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত ছেলেরা অভ্যর্থনার আয়োজন করার জন্য শ্রম করিয়াছে। এমন উৎসাহের সহিত এমন আনন্দের সহিত তাহারা এই পরিশ্রমকে বরণ করিয়াছিল যাহা কখনো ভুলিবার নয়।

এই অভ্যর্থনার নায়কতার ভার, আশ্রমের সুযোগ্য অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সায়াহ্নে গান্ধী মহাশয় সপত্নীক আশ্রমে পদার্পণ করেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আশ্রমের নূতন তৈয়ারী পথের মাথায় একটি চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করা হয়। তথায় তাঁহাকে যথারীতি পুষ্প চন্দনাদির অর্ঘ্য দানান্তে বরণ করা হয়। এই সময় ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের (এসরাজ ও সেতার) সহিত আশ্রমের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী গান করিয়াছিলেন। প্রথম কুট্টীম প্রবেশ করিলে—সেখানে তাঁহাদের চরণ ধৌতার্থে সলিল নীত হয়। এই কুট্টীমে, আশ্রমের মাতৃস্থানীয়া, দার্শনিক পণ্ডিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীমতী হেমলতা দেবী ও অন্যান্য উপস্থিত মহিলাগণ, গান্ধীপত্নীকে

হিন্দু রীতি অনুসারে যথাযোগ্য দ্রব্য দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। এই স্থান হইতে অবশেষে তাঁহারা আশ্রমের "অন্তস্তোরণে" আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই তোরণের সম্মুখে উত্তর অংশে, একটি মৃত্তিকার পদ্মপুষ্পাকার আসন তৈয়ার করা হইয়াছিল। এই আসনটিও বৈদিক যুগের অভ্যর্থনাকালীন আসনের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই আসনের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দিকের কোণে যথারীতি, চারিটি কদলি বৃক্ষ ও আম্রপল্লব আচ্ছাদিত চারিটি মৃণ্ময় জলকুম্ভ স্থাপন করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ঐ আসনে উপবিষ্ট গান্ধী ও তাঁহার পত্নীর সম্মুখে পঞ্চপ্রদীপের চারিটি বরণডালাও রক্ষা করা হইয়াছিল। এইখানে, মহিলাবর্গের তরফ হইতে একটি বালিকা উপস্থিত অতিথিদ্বয়কে পুষ্প মাল্য দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া গান্ধী পত্নীর ললাটে সিঁন্দুর পরাইয়া দিল। সিঁন্দুর পরান শেষ হইলে বালিকাটি উভয়ের চরণরেণু মাথায় আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিল। এখানেও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহোদয় ও অন্য দুই জন মহারাষ্ট্র অধ্যাপক বেদমন্ত্র পাঠ ও তাহাকে বাংলা ও গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করিয়া অভ্যর্থনা শেষ করেন।* অভ্যর্থনা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত গান্ধী মহাশয় নিম্নলিখিত মর্ম্মে স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাপন করেন—"আজ যে আনন্দ অনুভব করিলাম ইতিপূর্ব্বে সে আনন্দ অনুভব করি নাই। আজ আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে সশরীরে যদিও এখানে নাই, তথাপি, তাঁহার সহিত প্রাণের যোগ অনুভব করিতেছি। ভারতীয় রীত্যনুসারে এখানে অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। বোম্বাইতে যদিও আমাদের খুব সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা হইয়াছিল, তবু তাহাতে আনন্দ অনুভব করিবার কিছু ছিল না। কারণ সেই অভ্যর্থনার মধ্যে পাশ্চাত্য রীতিকে বিশেষভাবে অনুকরণ করা হইয়াছিল। আমরা প্রাচ্য আদর্শের মধ্য দিয়াই আমাদের লক্ষ্যের নিকটবর্ত্তী হইব—বিদেশীর আদর্শের মধ্য দিয়া নহে, যেহেতু আমরা প্রাচ্য। ভারতবর্ষের সুন্দর রীতিনীতির মধ্য দিয়াই আমরা মানুষ হইব এবং এই আদর্শের মধ্য দিয়াই আমরা ভিন্নাদর্শ অবলম্বী জাতিকে বন্ধুরূপে স্বীকার করিব। ভারত প্রাচ্য আদর্শের মধ্য দিয়াই পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে বন্ধুরূপে স্বীকার করিবে। বাংলা দেশের এই আশ্রমে, আজ আমি অত্যন্ত পরিচিত, আমি তোমাদের পর নহি। সুদূর আফ্রিকাও আমার ভাল লাগিয়াছিল। কারণ সেখানে আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয় ব্যক্তিগণ, প্রাচ্য রীতিনীতিকে বিসর্জ্জন দেন নাই।" এই বলিয়া তিনি সমবেত জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ ও প্রীতি নমস্কার নিবেদন করিয়া আসন গ্রহণ করেন।

---

* প্রত্যেক তোরণে, অতিথিদ্বয়ের প্রবেশের কালেই, ক্ষিতিমোহন বাবু সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার বাংলা অনুবাদ করিলে তাহার পর উক্ত মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপকগণ তাহার অনুবাদ করেন। শেষোক্ত অভ্যর্থনার শেষে শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নায়কতায় আশ্রমের বালকগণ দুইটি গান করেন।

আশ্রমে গান্ধী মহোদয়কে পাইয়া আমরা তাঁহার ভিতরকার পরিচয় আরো ভাল করিয়া পাইলাম। স্বদেশকে ভাল বাসিলে মানুষ স্বদেশের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করে, কতটা আত্মসংযমী হয় ও কতটা আত্ম অভিমান বর্জ্জিত হয় এবং মন কতটা বলে বলীয়ান হয়, তাহা গান্ধী মহাশয়ের জীবনে প্রত্যক্ষ করিলাম। গান্ধী মহাশয় যদিও আজকালকার ইউনিভারসিটির একজন খ্যাতনামা গ্রাজুয়েট এবং উত্তম ব্যারিষ্টার বটে, কিন্তু তথাপি, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তা তাঁহার উপর কোন রকমের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় যে তিনি খাঁটি ভারতবাসী, এবং খাঁটি দেশনায়ক। নায়কতা গ্রহণ করিতে হইলে, মনের মধ্যে যতটা শক্তি দরকার ও যে পরিমাণ ন্যায়নিষ্ঠ হইতে হয়—গান্ধি মহাশয়ের মনের শক্তি সে পরিমাণ আছে এবং তিনি অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ। তাঁহার স্ত্রী পুত্রের মধ্যেও বিলাসিতার কোন প্রভাব নাই। গান্ধী মহাশয়—যেমন একদিক দিয়া সর্ব্বসাধারণ হইতে বহু ঊর্দ্ধে তেমনি অন্য দিক দিয়া—দীনতম ব্যক্তির সহিত, অত্যন্ত আপনার মত মিশিতে পারেন। দীনতম ব্যক্তিও গান্ধী মহাশয়ের নিকটে অত্যন্ত নির্ভয়ে উপস্থিত হইতে পারে। আমরা গান্ধী মহাশয়ের সহিত অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আলাপ করিতাম। তাহার একমাত্র কারণ এই যে দেশের সেবার জন্য তিনি, দুঃখদৈন্যের ও আত্মত্যাগের ও স্বার্থত্যাগের যে জায়গাটিতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—আমাদের বাক্যরাশি, সেখানে অনায়াসে উপস্থিত হইলেও, আমরা সে স্থান হইতে বহু বহু দূরে পড়িয়া আছি। আপনার মধ্যে আপনার Principle সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস রক্ষা করাই গান্ধী মহাশয়ের চরিত্রের একটি আশ্চর্য্য দৃঢ়তা। এই দৃঢ়তার জন্যই, তাঁহার কাছে, আফ্রিকা অবস্থান কালের কারাযন্ত্রণা, অন্যায় অত্যাচার, ও অন্যান্য নানা বিধ দুঃখ কষ্ট, অসহ্য হয় নাই। গান্ধী মহাশয়কে কেবল আদর্শ কর্ম্মবীর বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়। তিনি কেবল আদর্শ কর্ম্মবীর নহেন। আদর্শ ন্যায়নিষ্ঠ, ভারতের সেবক। আমরা যে কয়দিন তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়াছি—সে কয়দিনই, তাঁহার দিকে তাকাইয়া নিজেদের ধিক্কার দিয়াছি। বাক্য দ্বারা কর্ম্মের ব্যাখ্যা দেওয়া গান্ধী মহাশয়ের স্বভাব নয়, কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের ব্যাখ্যা দেওয়া তাঁহার স্বভাব। পূর্ব্বে বলিয়াছি গান্ধী মহাশয় কেবল আদর্শ কর্ম্মবীর নহেন —ন্যায়নিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠও বটে। ঁগোখ্‌লে গান্ধীর রাষ্ট্রগুরু ছিলেন। সেই গোখ্‌লে একবার কোন কারণ উপলক্ষ্যে গান্ধীকে, আফ্রিকার কোন এককার্য্য হইতে বিরত হইতে বলিয়াছিলেন। গান্ধী মহাশয় তাঁহার অনুরোধ পত্রের উত্তরে জানাইয়াছিলেন—"আপনার জন্য জীবন দিতে পারি, কিন্তু সত্যকে—কখনই অস্বীকার করিতে পারিব না।" বলা বাহুল্য এই একটি ঘটনাই গান্ধী মহাশয়ের ন্যায়নিষ্ঠার প্রমাণ।

গান্ধী মহাশয়ের কয়েকটি পুত্র ও কয়েকজন ছাত্র আমাদের আশ্রমে কয়েক মাস ধরিয়া বাস করিতেছেন। গান্ধী মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, তিনি সস্ত্রীক কয়েক মাস তাঁহাদের

সহিত আশ্রমে বাস করিবেন,—কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারি প্রাতে গান্ধী মহাশয় তার পাইলেন যে মহাত্মা গোখ্‌লে আর ইহলোকে নাই। এই আকস্মিক নিদারুণ সংবাদে তিনি বিশেষ ব্যথিত হইলেন। তাঁহার উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে বিষাদের কালিমা দেখা দিল। স্বদেশের একনিষ্ঠ সেবক গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের মৃত্যুতে আশ্রমের মধ্যেও নিরানন্দ জাগিয়া উঠিল। তার পাওয়া মাত্র, বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। শোক প্রকাশের জন্য তৎক্ষণাৎ একটি সভার অধিবেশন হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। আশ্রমের ছাত্রদিগের নিকট পরলোকগত কর্ম্মবীরের জীবনী সংক্ষেপে বলিবার জন্য, আশ্রমের সর্ব্বজনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়কে অনুরোধ করা হইল। তিনি বক্তব্য বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। তৎপরে সভাপতিমহাশয় তাঁহার বক্তব্য নিম্নলিখিতরূপে বলিলেন।

শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে, কয়েকদিন পূর্ব্বে যিনি সশরীরে আমার সহিত দেখা করিয়াছিলেন, আজ লোকান্তরে। তাঁহার বিয়োগে যে দেশের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর বেশী করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বসাধারণের কাছে, গোখ্‌লের কর্ম্মের দক্ষতাই ধরা পড়িয়াছিল। সকলে তাঁহার কর্ম্মমূর্ত্তি দেখিয়াছিল, অল্প লোকেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কথা জানিত। সত্যধর্ম্মই, তাঁহার কর্ম্মশক্তির মূলে ছিল। আমি ভারতে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ বীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া একজন প্রকৃত বীর পাইয়াছিলাম, তিনি গোখ্‌লে। দেশের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি ছিল ও শ্রদ্ধা ছিল। দেশের সেবার জন্য তিনি সকল সুখ, সকল স্বার্থকে নিঃশেষে ত্যাগ করিয়াছিলেন। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও দেশের মঙ্গল চিন্তা হইতে তিনি মুক্তি পান নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন রাত্রিতে যখন তিনি রোগশয্যায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন—তিনি আমাদের কয়েকজনকে ডাকাইয়া আনিয়া দেশের কথা বলিয়াছিলেন, দেশ সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যৎ আশার কথা বলিয়াছিলেন। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে পুনঃপুনঃ কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লইবার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—"মৃত্যু ব্যতীত অন্য কেহ আমাকে কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।" সেই মৃত্যুই তাঁহাকে শান্তি দিল। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গান্ধী মহাশয় কোন কিছুই বাক্যে প্রকাশ করেন না, কর্ম্মই তাঁহার কথা, গোখ্‌লের মৃত্যুর জন্য তিনি ব্যথিত হইলেন—কিন্তু অধীর হইলেন না। পাছে গোখ্‌লের "Servants of India Society"র কাজের কোন অব্যবস্থা হয়, এইজন্য তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, সেই দিনই পুনা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আশ্রম হইতে গান্ধী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী উভয়েই খালি পায়ে বোলপুর ষ্টেশনে যাত্রা করিলেন। আশ্রমের অনেকেই তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিলেন।

প্ল্যাটফর্ম্মে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া ইজি চেয়ার দেওয়া হইল, কিন্তু তিনি তাহাতে বসিলেন না। তিনি কেবলমাত্র ফলভোজী, অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন না। সেদিন তাহাও গ্রহণ করেন নাই। সমস্ত দেশের মধ্যে যাঁহারা প্রাণসঞ্চার করিতে আসেন— তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া আবশ্যক ও তাঁহাদের জীবন কতদূর সাদাসিধা (Simple) হওয়া প্রয়োজন, গান্ধী মহাশয়ের দিকে তাকাইলে তাহা সম্যক বুঝা যায়। ষ্টেশনে ট্রেণ আসিলে, তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করিলেন। গান্ধীপত্নী গান্ধী মহাশয়ের ছায়ার মত, স্বামীকে প্রত্যেক বিষয়ে অনুসরণ করিয়া নারীসমাজে ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার চরণধূলি পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

আশ্রম হইতে গান্ধী মহাশয় দূরে গেলেও পুনরায় তাঁহাকে আশ্রমে পাইব বলিয়া আমাদের আশা আছে।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

চৈত্র ১৮৩৬ শক। পৃ. ১৯৯-২০১

পৌষ উৎসব

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

১৮১৩ শক; মাঘ; ৫৮২ সংখ্যা [১৮৯১]

"শান্তিনিকেতনে মঠ প্রতিষ্ঠা ঃ ...বিগত ৭ই পৌষ ঈশ্বরের প্রসাদে ঐ মঠ প্রতিষ্ঠার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগীত কার্য্যে যোগদান করিয়া উপাসক মণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।... বেলা দ্বিপ্রহরের সময় স্থানীয় অধ্যাপকগণের বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল।... পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাদিগকে পাথেয় ও বিদায় প্রদান করিলেন।... সূর্য অস্তমিত হইল, ক্রমে উপাসনার সময় নিকটে আসিয়া পড়িল। দূরাগত সাধক সজ্জনকে মন্দিরের মধ্যে স্থান দিয়া মন্দিরের দ্বার অবারিত করা হইল। লোকাধিক্যে মন্দিরের বাহিরে তিলমাত্র স্থান অবশিষ্ট রহিল না।... পরে সংগীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। ... এবেলাও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগীতে যোগদান করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন।... এইরূপে দিবসব্যাপী উৎসবের অবসান হইল।"

১৮১৪ শক; মাঘ; ৫৯৪ সংখ্যা [১৮৯২]

"সংকীর্ত্তনসহ বারত্রয় মঠ প্রদক্ষিণ হইবার পর অর্চ্চনা ও সংগীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল।... অনাথ অন্ধ খঞ্জদিগকে দিবার জন্য এ বৎসর পাঁচশত খণ্ড বস্ত্র ও পর্য্যাপ্ত তণ্ডুল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে মন্দিরের চারিদিকে সোপান শ্রেণীর উপর সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উপাসনান্তে তাহা উৎসর্গ করা হইল।... মধ্যাহ্নের পর মঠের ভিতরে রাজকুমারবাবুর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।... সংকীর্ত্তন শেষ হইতে অপরাহ্ন হইয়া আসিল। এদিকে প্রান্তরের চারিদিক হইতে জনস্রোত আসিয়া উদ্যান ছাইয়া ফেলিল। উদ্যানের সম্মুখে, অভ্যাগত স্থানীয় লোকদিগের সন্তোষ বর্দ্ধনার্থ ব্যায়ামপটু কয়েকটি যুবক কলিকাতা হইতে গিয়া বিবিধ কৌশল প্রদর্শনে সকলকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একতান বাদ্য বাদিত হইতেছিল।... সন্ধ্যার পর আগন্তুক লোক সংখ্যার ইয়ত্তা রহিল না। সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে আবার উপাসনার উদ্যোগ হইতে লাগিল। আগন্তুকবর্গ সমস্ত ব্যাপার দেখিবার জন্য মঠ বেষ্টন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।—সন্ধ্যা ৬টার পর উপাসনা আরম্ভ হইল।...

পরিশেষে স্থানীয় লোকদিগের সন্তোষ সাধনার্থে নানারূপ আতসবাজী প্রদর্শিত হইয়াছিল।"

১৮১৫ শক। [১৮৯৩]

৭ পৌষ সুনির্ম্মল প্রাতঃকালে সকলে মিলিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বন্দনাগীত গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে সঙ্গীত আরম্ভ হইল। সঙ্গীতের পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন।...

এই প্রাতের উপাসনায় শ্রীযুক্তবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত করিয়া উৎসবকে আরো মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। সভা ভঙ্গ হইলে অনেকে সপ্তপর্ণ বেদীর নিকট দণ্ডায়মান হইয়া 'কর তাঁর নাম গান' এই গানটি সমস্বরে গাহিয়াছিলেন। পরে মধ্যাহ্নের বিশ্রামের পর রামপুর হাটের রাজকুমার বাবু মধুর গম্ভীর স্বরে কীর্ত্তন করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। এইরূপে দিবসের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। পরে রাত্রিকাল সমাগত। আলোকমালায় ব্রহ্মমন্দির উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মাঘ ১৮১৫ শক ; পৃ. ১৮৪-১৮৫

১৮১৬ শক [১৮৯৪]

শান্তিনিকেতনে চতুর্থ বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব—

বীরভূমের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, নির্মল প্রভাতকাল, নানারূপ তরুরাজি বিরাজিত সুপ্রশস্ত উদ্যান, শীতের মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ু সমস্তই ব্রহ্মে মন সমাহিত করিবার অনুকূল। সর্বপ্রথম ঘণ্টারব হইল। তখন সকলে ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অগ্রবর্তী করিয়া মঙ্গল গীত গাহিতে গাহিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন।...

অনন্তর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। মন্দিরের সোপান পরম্পরায় বহু সংখ্য ভোজ্য সুসজ্জিত ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রবাবু তথায় দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিলেন "অদ্য পৌষ মাসের সপ্তম দিবসে ব্রহ্মপ্রীতিকামনায় এই সমস্ত সবস্ত্র ভোজ্য অনাথ দীন দুঃখী ও আতুরদিগের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইল।"

দিবা দ্বিতীয় প্রহর। চতুর্দ্দিকে দোকান পসার বসিয়াছে এবং স্থানীয়লোকে উৎসব ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঐ সময় সাধারণের হৃদয়ের সুশিক্ষার উদ্দেশে রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান গীত হইয়াছিল।

অনন্তর রক্ত সন্ধ্যায় আকাশ সুরঞ্জিত এবং রক্তাভ সূর্য প্রান্তরের পশ্চিম প্রান্তে অস্তমিত হইল, বিচিত্র বর্ণের কাচ নির্ম্মিত বিশাল ব্রহ্মমন্দির আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব-শ্রীধারণ করিল। সকলে পুনরায় ব্রহ্মোপাসনার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।...

অনন্তর সুমধুর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। পরে সমস্ত নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চটাচট শব্দে বহ্ন্যুৎসব পর্ব্ব আরম্ভ হইল। লোকতরঙ্গ মহা কোলাহলে ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। তৎকালে খধূপোদ্‌গত গোলকের বিচিত্র নির্ম্মল আলোকে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কেবলই মস্তকরাজি দৃষ্ট হইতে লাগিল। কি ভীষণ জনতা। কি বিষম কলরব।

১৮১৮ শক; মাঘ; ৬৪২ সংখ্যা [১৮৯৬]

"...বিশ্রামের পর মন্দিরে খোলকরতাল সহযোগে রাজকুমার বাবুর কীর্ত্তন হইয়াছিল।... বেলা দুই প্রহরের পর হইতেই উদ্যানের ইতঃস্তত অনেকগুলি বাউলের দল গোপীযন্ত্র বাজাইয়া এবং তালে তালে নৃত্য করিয়া নানাতত্ত্ব গান করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিল। দেখিলাম কোন কোন স্থানে বহু সংখ্যক ক্ষুধার্ত্ত দীন দরিদ্র দলে দলে সুপ্রস্তুত অতি উপাদেয় খেচরান্ন উদর পূর্ণ করিয়া খাইতেছে এবং যে যত পারিতেছে বস্ত্রপ্রান্তে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে। কোথাও দোকান পসার খুলিয়া অনেকে নানারূপ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে। কোথাও সরলতার প্রতিমূর্তি সাঁওতাল গৃহিণীরা নূতন জলধরকান্তি গুঞ্জাবতংসশোভিত শিশুগুলিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদেরই নিমিত্ত নানারূপ ক্রীড়নক কিনিতেছে। কোথাও সুশিক্ষিত মধুরকণ্ঠ কলাবৎ তানলয়স্বরসংযোগে হিন্দী ভজন ধরিয়াছেন। ... চতুর্দিকেই আনন্দের মহাকল্লোল।... এবার চক্ষুকর্ণের তৃপ্তিকর অন্য কোনও রূপ বাহ্যাড়ম্বর ছিল না, তথাচ এত লোক।"...

১৮১৯ শক; মাঘ; ৬৫৩ সংখ্যা [১৮৯৭]

"...এক ভিখারিণী বেহালার সুরে কোমল কণ্ঠ মিশ্রিত করিয়া নিম্নোক্ত গানটি গাহিতে লাগিল :

ভেবে মরি কি সম্পর্ক তোমার সনে।
তত্ত্ব তার তত্ত্বাতীত হে, না পাই বেদ পুরাণে।

উদ্যানের বাহিরে নানাবিধ দোকান পসার বসিয়াছে।...যখন বাউলের দল গীতাবসানকালে ভাবে বিভোর হইয়া ঘন ঘন তুরীধ্বনির সহিত নৃত্য করিতে করিতে উদ্যান প্রদক্ষিণ করে তৎকালের দৃশ্য অতি বিস্ময়কর।... বহ্ন্যুৎসবপর্ব আরম্ভ হইল।... সর্বশেষে একটা তোরণে আলোক রচিত 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই কথাটি পরিস্ফুটরূপে দেখাইয়া নির্বিঘ্নে বহ্ন্যুৎসব পর্ব শেষ হইয়া গেল।"

১৮২৬ শক; মাঘ; ৭৩৮ সংখ্যা [১৯০৪]

"...দ্বিপ্রহরে মেলা হইয়াছিল। এই মেলার কোলাহলে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর পূর্ণ হইয়া উঠে এবং স্থানীয় দ্রব্যাদির বিক্রয়ও যথেষ্ট হয়। দীন হীন দরিদ্রেরা অন্ন বস্ত্রাদি

পাইয়া এই উৎসবে পূর্ব্ববৎ যোগ দিয়া আনন্দ ও উল্লাস প্রদর্শন করিয়াছিল এবং রাত্রিতে বিপুল বহ্ন্যুৎসব সর্বসাধারণকে পুলকিত করে। ফলত ৭ই পৌষের এই মেলা স্থানীয় লোকদিগের যে ক্রমশঃ অধিকতর আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কালে যে ইহা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মেলার ন্যায় সর্বসাধারণের একটা আকর্ষণের বস্তু হইবে তাহার পূর্ণ সম্ভাবনা। এই স্থলে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা আছে। অন্যান্য তীর্থের মেলা দোষ সম্পর্কশূন্য নহে। তথায় অনেক আপত্তিজনক বস্তু অবাধে ব্যবহৃত হয়।... কিন্তু... ব্রহ্ম এই মেলার অধিষ্ঠাতা, ইহা সর্বাংশে পবিত্র।"..."...এই উদ্যান-মেলাভূমি শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রদ গুরুর ন্যায় জ্ঞানী ও ভক্তের বিশেষ আদরের ও গৌরবের বস্তু। এই মেলার ইহাই বিশেষত্ব।"

১৮৩৪ শক ; মাঘ ; ৮৩৪ সংখ্যা [১৯১২]

"...গত ৭ই পৌষের উৎসবে নানা স্থান হইতে অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল।...বর্ত্তমান বৎসরে পূর্ব্ববৎ মেলাস্থলে অনেক ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়াছিল। নানা প্রকার দ্রব্যে সজ্জিত বিপণী শ্রেণীর দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল। চারি পাঁচ মাইল দূর হইতে বহুলোক উৎসব ও মেলা দেখিবার জন্য উপস্থিত ছিল। বেলা দুইটার সময় হইতে দর্শকের সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে, জনতা ভেদ করিয়া গমনাগমন অসাধ্য হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও সাধারণের মনোরঞ্জন জন্য মেলাস্থলে যাত্রার গীতাভিনয় হইয়াছিল। তা'ছাড়া দেশীয় সার্কাস, নানা প্রকার ক্রীড়া কৌশল প্রভৃতি 'আমোদ' দেখাইবার জন্য স্থানে স্থানে তাঁবু পড়িয়াছিল।—"